বোকা কাশীরাম কথা

রণবীর পুরকায়স্থ

অক্ষর পাবলিকেশনস্
আগরতলা ত্রিপুরা

Boka Kashiram Katha
a collection of bengali stories by
Ranabir Purakayestha.

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী ২০০১

প্রচ্ছদ
পার্থপ্রতিম গঙ্গোপাধ্যায়

ISBN-81-86802-30-4

টাইপ সেটিং
ক্যাক্সটন প্রিন্টার্স
অক্ষর পাবলিকেশানস্-এর পক্ষে শুভব্রত দেব
কর্তৃক কৃষ্ণনগর আগরতলা থেকে প্রকাশিত
এবং অনিল লিথোগ্রাফিং কোং কলকাতা -১২ থেকে মুদ্রিত

মূল্য : ৯০.০০

আমার কথাযন্ত্রের তিন যন্ত্রীকে
তপন
তৃতীয়জনের স্বপ্নাদি
এবং তৃতীয়জন

আমি এই সব লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদকদের প্রতি কৃতজ্ঞ--

তপোধীর ভট্টাচার্য ও মিথিলেশ ভট্টাচার্য (শতক্রতু) শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী (অনীশ) বিজিতকুমার ভট্টাচার্য (সাহিত্য) সুরজিৎ ঘোষ (প্রমা) অনিল আচার্য (অনুষ্টুপ) বীরেন শাসমল (তীব্র কুঠার) আফিফ্ ফুয়াদ (দিবারাত্রির কাব্য) অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (এবং এই সময়) সুবল সামন্ত (এবং মুশায়েরা) দেবব্রত দেব (মুখাবয়ব) এবং সমীরণ মজুমদার (অমৃতলোক) : রণবীর পুরকায়স্থ

কথাক্রম

যোগাযোগ ঃ
অক্ষর পাবলিকেশনস্‌
কৃষ্ণনগর প্রধান সড়ক। বিজয়কুমার স্কুলের পূর্বদিকে।
ডাকঘর ঃ আগরতলা। ত্রিপুরা। ফোন ঃ (০৩৮১) ৩২-৪৫০০
৩০-৭৫০০ ই-মেইল ঃ raixxxx@.dte.vsnl.net.in

কথাকারের সঙ্গে যোগাযোগ ঃ
রাজ অ্যাপার্টম্যান্ট
৩৯০ দক্ষিনদ্বারী রোড। কলকাতা ৪৮
ফোন ঃ ৫২১-২১২৭

মিনির হাসি

মিনির হাসি

আমার সাগর দেখার কৌতূহলেও মিনি হেসেছিল। ও খুব জোরে হাসে না। মিনির হাসির কোন শব্দ নেই। মিনি সবসময় মুখেও হাসে না,– ওর চোখের মনিদুটো শুধু এপাশ ওপাশ করে। কখনও একটা ঠোঁট ভাঙে, কখনও দুটোতে চাপ দেয় শক্ত করে , কখনও নিচেরটাকে ওপরে উঠিয়ে আলতো চেপে রাখে। এরকম অনেক নীরব ভঙ্গি আছে ওর হাসির । মিনির চশমার চৌকো ফ্রেমটাও ওর চোখ দুটোকে আরো রহস্যময়ী করে তোলে। মিনির রহস্যময়তা আমাকে বিব্রত করে।

আমরা শেষপর্যন্ত সাগর পারেই বেড়াতে এলাম। কেয়ারটেকারের হাত থেকে চাবিটা নিয়ে আমি মিনিকে শুনিয়ে শুনিয়েই নম্বরটা বললাম। দুশো বারো। মিনি শুনল এবং আমার হাতের দিকে তাকিয়ে হাসলো। আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে নম্বরটা আবার ভাল করে দেখলাম। দুশো বারোইতো! চাবির রিংটা অবশ্য খুব মজার। গোল মতো একটা টিনের পাতে ফুটো করে চাবিটা লাগানো। ঠিক গোলও নয় ডিমের আকারের একটু লম্বাটে পাতটায় দুশো বারো সংখ্যাটাই খোদাই করা। ঘরের নম্বরই হবে। তবে কি চাবির রিংএর অভিনবত্বেই মিনি হাসলো? আমি চাবিটাকে শক্ত করে হাতের মুঠোয় ধরে রাখলাম।

মিনি আমাকে কোন ব্যাপারেই তাড়া দেয় না। —আমার উপর নির্ভর করতে চায় মিনি। এখনও, আমার এত ভুলের জন্যে একটুও তাড়া দিল না। ঝড়বৃষ্টি বাঁচিয়ে সিঁড়ির নিচে মালপত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি দুজনে। চৌকিদারকেও একটু সাহায্যের জন্য বলতে ভুলে গেছি। বিপদের সময় এরকম ভুল আমার হয়ই। প্রচন্ড সামুদ্রিক ঝড় চলছে চতুর্দিকে,—শহরে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, --ডি ভি সির পাওয়ার সাপ্লাইও বন্ধ। অন্ধকার আর ঝড়বৃষ্টির শব্দে চলন্ত বাসে বসে মনে হয়েছিল আমাদের দুপাশেই সাগর, —সাগরের বুকের উপর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি ভাবতেও বুকে হৈ চৈ হচ্চিল খুব। দরজা জানালা বন্ধ বাসে করে এলেও নামতে গিয়ে, জিনিষপত্র সামলাতে ভিজতে হয়েছে দুজনকেই। মিনির জন্যেই কষ্ট হচ্চে খুব। নূতন জায়গায় এলে ঠান্ডা গরমের কোন অনুভূতি থাকে না আমার। উল্টো উত্তেজনা, গরমকে ঠান্ডা ও ঠান্ডাকে চাঙ্গা করে তোলে। মিনির কষ্টে আমি নিজেকেই সম্পূর্ণ দায়ী করি। তবে, এরকম ভাবনাকে খুব দীর্ঘায়িত না করে হঠাৎই আমি সব জিনিষপত্র কাঁধে, হাতে ও বগলে নিতে শুরু করি। মিনিকে কোন ভারই দিতে চাই না। কিন্তু বড় স্যুটকেসটা নিয়েই হয় ঝামেলা। মিনিকে বললাম —চলো। —ওটা থাক।

শুনে মিনি হাসলো, --হেসে স্যুটকেসটা তুলে নিলো। দোতলার সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস খুব করে অনুভব করলাম।

এরকমটা কিন্তু হওয়ার কথা ছিল না। আমরা এত ঝামেলা পোয়াতে চাইনি। সেদিন লাক্সারি বাসের টিকিট কাটতেই মেট্রোর বারান্দা দিয়ে হাঁটছিলাম। মিনি আর আমি। মিনিকে বলি--

--এই বারান্দা ঘিরে আমার একটা দারুণ বিশ্বাসের ব্যাপার আছে। কারো সাথে দেখা হয়ই।

--সেদিন তো ফিরেই যাচ্ছিলে! বলেই হাসে মিনি।

--ভাবছি, ফিরে গেলেই ভাল ছিল। কোন কিছু না ভেবেই দুষ্টু গাম্ভীর্যে কথাকটা বলি। শুনে মিনি হাসে। খুব অপরিচিত হাসি।

দু বৎসর আগে মিনির সঙ্গেই দেখা হয়েছিল। মিনিকে দেখাতে যাচ্ছিলাম দুবৎসরের পুরনো তবু খুব টাটকা স্মৃতির জায়গাটা। কিন্তু হঠাৎই মিনি আমার কাঁধ খামচে এক ভদ্রলোককে ডাকতে বলে। 'রমানাথ বাবু' বলে ডাকতে হবে। প্রথমে হতভম্ব পরে খুব সপ্রতিভ ভাবেই ডেকে আনি ভদ্রলোককে। মিনিদের পাড়ার লোক। মিনি বলে তুমি--ওর রমাদা ওকে তুই। মিনি আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়, --'এই রমাদা, রমানাথ চক্রবর্তী, তোমাকে বলি নি ?'' মিনি কখনও বলেনি, তবু বলতে হলো--আপনার কথা খুব শুনেছি মিনির কাছে। আমার উত্তর শুনে মিনি হাসে। আমার কি অন্য কিছু বলা উচিত ছিল?

ভেবেছিলাম নির্ভার থাকব। হোটেলে মোটেলে যেমন খুশি। কিন্তু মিনির ওর রমাদার উপর খুব শ্রদ্ধাভক্তি। উনিই বললেন কম খরচায় ব্যবস্থা করে দেবেন। আমাকে কিছুই করতে হলো না, সব ব্যবস্থাপত্র করে ভদ্রলোক আমাকে বললেন, আসামে যাব একবার, ধুবড়িতে আমার এক বন্ধু থাকে, সমীর সেনগুপ্ত, খুব ভাল তবলা বাজায়, ওর বাড়ীতেই যাব, তখন দেখা হবে নিশ্চয়?' ধুবড়ী, শিলচরের দূরত্ব জেনেও মিনি হাসলো না। আমি ভদ্রলোককে দেখা হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত করলাম। মিনি তখনই হাসল।

মেয়েছেলে সঙ্গে থাকলে কিছু বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায় অনেক সময়। ড্রাইভার লোকটিকে একবার বলতেই আমাদের পৌঁছে দিতে রাজি হয়। এত দুর্যোগের মধ্যেও মানুষ এত দয়ালু হয়! লোকটি শুধু একবারমাত্র একটি অসুবিধা দৃষ্টি দিয়ে মিনির দিকে তাকিয়েছিল। আমি কিছু মনে করিনি। কারণ সমুদ্রের এত কাছে এসেও সমুদ্র দেখতে না পারায় আমি খুব উত্তেজিত হয়ে আছি। দয়ালু লোকটাকে জিজ্ঞেস করি,--আচ্ছা দাদা, --আমরা কি সমুদ্রের পাশ দিয়ে যাচ্ছি? লোকটা একবার আমার দিকে আর একবার মিনির দিকে তাকায়, তারপর জানায়, হ্যাঁ, প্রায় পাশ দিয়ে যাচ্ছি। কিছুই বুঝি না, আবার বলি, --এল. আই.সি. বিল্ডিং থেকে সমুদ্র কতদূর হবে বলতে পারেন?

এবার লোকটি নির্বিকার ভাবে জানায় --এই কিছু দূর হবে।

অস্পষ্ট উত্তরে অসন্তুষ্ট হয়ে আমি মিনির দিকে তাকাই। অন্ধকারেও মিনির চোখের মনি দুটোর স্থানান্তর টের পাই। মিনি হাসে।

রমাদার পরামর্শেই সেদিন লাক্সারী বাসের টিকিট কাটা হলো না। খড়গপুর লোকেল থেকে নেমেই ঝড়বৃষ্টি মাথায় করে উঠতে হলো এই 'নোয়া'র বাসে। হাওড়া ষ্টেশনে যাওয়ার সময় একবার মাত্র মিনিকে বলেছিলাম,-- কোলাঘাটে চা খাওয়া হলো না, শরৎসেতুও দেখা হলো না, তাছাড়া বাসজার্নির মেজাজই আলাদা।

--তা হলে বাসেই চলো। মিনি বলে। আমার মতের বিরুদ্ধতা করা মিনির স্বভাব নয়। তবু ট্রেনে যাওয়াই ঠিক থাকে। আমার এ সিদ্ধান্তেও মিনি হাসে। আমি টিকিটের লাইনে দাঁড়িয়েও দোমনা হই।

থাক, তবু সব ঝমেলা কাটিয়ে আমরা দুশো বারো নম্বর ঘরের মুখোমুখি হলাম। সেখানেও নূতন বিভ্রাট। দুশো বারো নম্বর চাকতি লাগানো চাবি দিয়ে দুশো বারো নম্বর ঘরের তালা কিছুতেই খোলে না। মালপত্র সহ আমি মিনি আর একটা মাত্র টর্চ সম্বল। চৌকিদার লোকটিকে বেরই বা করি কি করে, মিনি আর আমি নিচে নেমে গেলে মালপত্রই বা দেখবে কে? মিনিকে বসিয়েও রাখা যায় না--কি জানি ভয়ও পেতে পারে! শৈশবের সেই অস্বস্তিকর নড়বড়ে সাঁকোর ধাঁধা মনে করেও জট খুলতে পারলাম না। ঘাসের আঁটি, বাঘ ও ছাগল। যে কোন একটা নিয়ে পারাপার করা যায়। কিছুতেই জট খোলে না। হতবুদ্ধি হয়ে মিনির পরামর্শ চাই। মিনি বলে, --তালা ভেঙে ফেল। ও জানে এ কাজ আমি পারব না। তাই বলে ফেলেই হাসে মিনি। আমি মিনিকে নিয়ে নিচে নেমে আসি।

বৃদ্ধ লোকটি প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতেই চায় না। দুশো বারো নম্বরের চাবি দিয়েই তো দুশো বারো নম্বর ঘর খুলবে। এরকম ব্যাপার তো কখনও হয় না। কিছুই বোঝে না। শেষ পর্যন্ত মিনির পরামর্শেই সবকটা চাবি নিয়ে লোকটি আমাদের সঙ্গে আসে। এ চাবি ও চাবি করে দুশো এগারো নম্বর দিয়েই খুললো দুশো বারোর তালা। লোকটি খুব দুঃখিত হয়, আবোল তাবোল ক্ষমাটমা চেয়ে নেয় বলে, --'বলেন তো সকালে আমি চা দিয়ে যেতে পারি, না হলে সামনের হোটেলে গিয়েও খেতে পারেন, সকালে রসও পাবেন প্রচুর, বেলা করে খাবেন না কিন্তু, গেঁজে যায়, নেশা হবে।' রসের ব্যাপার বুঝিনা কিছুই। মিনি বলে দেয়--

--'খেজুরের রস গো! এখানে খুব হয়, বেলা হলে তাড়ি হয়ে যায়।' মিনি জানেও এতসব। আমি বলি, --'খুঁব খাবো কিন্তু, --বেলা করেই খাবো।' আমার কথা শুনে মিনি হাসে।

লোকটি চলে যেতেই মনে পড়লো খাবার কিছু আনা হয়নি। এই দুর্যোগের রাতে কিছু পাওয়াও অসম্ভব। মিনির কথা ভেবেই অস্বস্তি হচ্চিল খুব। সারারাত না খেয়ে থাকবে। আমার ভাবা উচিত ছিল। শেষ পর্যন্ত মিনির ভাঁড়ার থেকেই ফ্লাস্কের চা আর অর্ধেক প্যাকেট বিস্কুট বেরোল। দুজনেই হাত মুখ ধুয়ে টর্চের আলোয় খানকয় বিস্কুট আর প্রায় ঠান্ডা চা দিয়ে আমাদের অভিনব ডিনার শুরু করি। চায়ে চুমুক দিয়েই একটু নড়ে চড়ে বসলাম। বাইরে দারুণ ব্যাপার হচ্চে নিশ্চয়। প্রচন্ড শব্দ হচ্চে বাইরে। যেমন তেমন ঝড়ের এত শব্দ থাকতে পারে না, একটা মিষ্টিমত তালে তালে, সমুদ্রের ঢেউই নিশ্চয়, ভেঙে পড়ছে। অনেকগুলো জেট প্লেনের ক্রমাগত ল্যাণ্ডিং আর টেকঅফের মতো তুমুল ব্যাপার। শব্দগুলো এত কাছের যে মনে হচ্ছে এই বাড়ির দেওয়ালে এসেই ঢেউগুলো ভাঙছে। টগবগে উত্তেজনায় মিনিকে বললাম একটা সিগারেট বের করে দিতে। সিগারেট ধরিয়ে দিল মিনি। দিয়াশলাইর আলোয় মিনির মুখের দিকে তাকালাম, খুব

অসুখী মনে হলো না ওকে । জড়িয়ে ধরে কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললাম,'শুনতে পাচ্ছ?'

মিনি বলল --হুঁ। আমি জানালা খুলে দিলাম। অন্ধকারে সাগরের অস্তিত্ব ঠিক বুঝা যায় না। বললাম-- ব্বাঃ সাগর এত কাছে'!

মিনি বলল--হুঁ। ওর মুখের পাশে মুখ রেখে আমি বললাম, -- ভয় করছে?'

--হুঁ! এবার স্পষ্ট দেখলাম মিনি হাসছে।

বললাম, --এল. আই. সি. এম্‌প্লয়ীরা খুব পয়সাওলা, সাগর পারে এত বড় বড় বাড়ি বানিয়েছে।'

--'এ বাড়ী কিন্তু এল. আই. সির নয়, সরকারি বাড়ি এল. আই. জি লোয়ার ইনকাম গ্রুপ।' আমার কাঁধে ওর থুতনির একটু চাপ দিয়ে কথাগুলি বলেই হাসে মিনি। মিনি যদি একটু শব্দ করে হাসত! মিনি তো জানে ওকে নিয়ে বড় হোটেলে উঠার মতো সামর্থ্য আমার ছিল!

ভোর হলো ঠিক চারটায়। আমার ভোর। মিনি জাগিয়ে দিল,--'ওঠো, সমুদ্রে চান করতে যাবে না?' মিনিকে বলে রেখেছিলাম সাগরপারে যতদিন থাকব সাগরে চান করতে করতে সূর্যোদয় দেখব। 'হুঁ' বলে ঘুমঘুম চোখে ঘরের দিকে তাকালাম। মিনি অনেকক্ষণ হলো উঠেছে । ঝড়ও থেমে গেছে কখন । হয়তো রাতেই। মিনি ঘরটাকে গুছিয়ে নিয়েছে। ছড়ানো ছিটানো শালপাতা, ছেঁড়া কাগজ, কিছুই নেই ঘরে। মিনিকে বেশ বউ বউ লাগছিল। চশমা ছাড়া মিনিকে অন্য মিনি লাগছিল। দেবীর মতো। ভাবলাম বলেই ফেলি কবিতায়,--'প্রাতে কখন দেবীর বেশে তুমি সমুখে উদিলে হেসে।' কেন জানি লাইনটাকে পছন্দ করেও বলতে পারলাম না। কাছে ডাকলাম ওকে। কাছে আসতে বললাম।কানের কাছে মুখ নিয়ে এলো, বললো, --'সমুদ্র কিন্তু খুব কাছে নয়।' বিশ্বাস করি কি করে, কানের কাছে এখনও টেকঅফের শব্দ পাচ্ছি। জানালা থেকেই সাগর দেখা যাবে ভেবে দু কনুই এ ভর দিয়ে উঠে জানালা খুলে দিই। চোখ দুটো বন্ধ করেই রাখি। কানামাছি খোলার মতো ডাক দিই সাগরকে,

--'আয় রে আমার সাগর' চোখ খুলি,

--কোথায়, কই সাগর? কোথাও তো সমুদ্র নেই। কিছু উঁচু নিচু টিলা আর ছড়ানো ছিটোনো বাড়িঘর রয়েছে সামনে।কাল রাতের অন্ধকারে এসবকেই সাগর ভেবেছিলাম। মিনির দিকে ফিরে দেখালাম, --খুব মিহিন হাসি মুখে নিয়ে মিনি আমার সাগর দেখা উপভোগ করছে। চোখে চোখ পড়তেই বলল, --চলো --রিক্সা করে যেতে হবে, অনেক রিক্সা রয়েছে নিচে।'

--'হ্যাঁ চলো, কখন আবার সূর্য উঠে যাবে' বলে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আড়মোড়া ভাঙলাম।

শতক্রতু, ১৯৭৬

রঞ্জন আসছে

শনিবার তো দেড়টায় ছুটি। দেড়টাকে বাবু প্রায়ই একটায় এগিয়ে দেয়। স্বাতী বলল একসঙ্গে বেরোবে তাই দেড়টাকে দেড়টাই করল আজ। রেঁস্তোরার ঘেরাঘরে গপ্প আর কথার নেশায় বুঁদ হয়ে যাচ্ছিল দুজনেই। স্বাতীর কথার উত্তরে যেন সত্যিই বদলে যাচ্ছিল বাবু। যদিও বদলে যাওয়ার ব্যাপারটা বাবু বোঝে না কিছুই। সবাই বলে। আজ স্বাতীও যখন বলল বাবু একটু দোমনা হয়ই। কিছু মানুষ আছে যাদের অনুমোদন থাকলে নির্জলা মিথ্যাকেও সত্যি বলে ভাবা যায়। স্বাতী ওরকম, ওর কথায় একটা প্রত্যয়ী ভাব আছে। তাই, 'মোটেই না' বলে স্বাতীকে এড়াতে পারবে না জেনেই বাবু ওকে পুরনো বাবু হয়ে দেখাতে চাইল। উল্টোপাল্টা কথা বলতে বলতে কখন যে দুজনে সত্যি সত্যি পুরনো দিনে চলে যায় খেয়ালও থাকে না। কথা বলে আর কথা শুনে যে এত আনন্দ অনেক দিন পর আবার জানল বাবু। সেসব দিন ফিরেও আসবে না। স্বাতীকেও মনে হচ্ছিল ব্যাবিলনের রাণীর মতো। পুরনো দিনের কত সব টুকরো এটা সেটা। বাবু জিজ্ঞেস করল,--

--তোমার লাইফ পার্টনারের খবর কি গো? মহাফাজিল ছেলে মন্টু, মজার মজার কথা বলত, নাটকটাটকও করত, স্বাতীকে বলত ওর লাইফ পার্টনার। স্বাতী হয়তো এখন ওর খবরই রাখে না। স্বাতী হাসতে হাসতে বলল,-আর পারি না বাবু, তোমার ঐ গো বলাটা এখনও চালিয়ে যাচ্ছ! 'আর পারি না' কথাটা মন্টু এত মজা করে বুক চেপে বলতো, মনে হতো, যেন বুকটা চেপে না রাখলে তক্ষুনি বেরিয়ে পড়বে। স্বাতীও পাল্টা বললো, --তোমার ফনোরামার খবর কি? ফোনে প্রেম করত অনুরাধা, একসঙ্গে পড়ত, খুব লাজুক মেয়ে, কিন্তু ফোনে এমন সব কথা বলত, এখন ওসব ভাবতেও বেশ লাগে। স্বাতীর কথার উত্তরে বাবু শুধু 'উ-ম ম' করে একটা দীর্ঘ শব্দ করল, ফোন ছেড়ে দেওয়ার আগে ওরকম শব্দ করত অনুরাধা। ব্যাপারটা যে কী তা স্বাতী জানত তাই কথাটা ঘুরিয়ে দেয়, বলে--আজ যে তোমার একটা মাত্র চিঠি এলো।

--তাইতো! হঠাৎ খেয়াল করে ঘড়ির দিকে তাকায়, তারপরে করুণভাবে স্বাতীর চোখে তাকায়, --চারটে! অফিসে রয়ে গেছে চিঠিটা!' বলেই ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ায় বাবু।

--কি ব্যাপার, আবার অফিসে যাবে নাকি? স্বাতীর প্রশ্নের উত্তরে নির্লজ্জের মতো বলে বাবু,

—হ্যাঁ। স্বাতী খুব অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায় বাবুর চোখে, যার একটাই অর্থ, সত্যি তুমি বদলে গেছ।

বাড়ী ফিরতে ফিরতে পাঁচটা বেজে গেল। মিনির সাজগোজ দেখেই বাবু ফিরে পেল তার পূর্বস্মৃতি যা সে ঘন্টা তিনেকের জন্যে হারিয়ে ফেলেছিল। বেচারি মিনি, বলে গিয়েছিল তৈরি হয়ে থাকতে, একসঙ্গে সিনেমায় যাবে, ম্যাটিনিতে। সব ভুল হয়ে গেছে ওর। তবে মিনি যে সত্যি সত্যি তৈরি হয়ে থাকবে, এতটা ভাবে নি। মিনি তো এখন ওর সঙ্গে বেরতেই চায় না। ঘরে ঢুকতেই মিনি বলল, —সিনেমা দেখে এলে? মিনির প্রশ্নে সব অনুতাপ ভুলে যায় বাবু, নির্বিকার ভাবে মিথ্যেটাই বলে ফেলে, —হ্যাঁ। শুধু হ্যাঁকে রাগের না ভাবতে পারে তাই বিশ্বাসযোগ্য করে বলল, অফিস থেকে সবাই যেতে বলল, তাই। মিথ্যাই যখন বলবে সত্যি কথাটা বললেই তো নাটক জমত ভাল করে। বাবু তা করে না। উত্তর পেয়ে মিনি বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল ভাবলেশহীন ভাবে। অবিশ্বাসী স্ত্রীকে ওর সহ্য হয় না। ভুলে গেল মিনি খুশি হবে বলে বন্ধ অফিস খুলিয়ে চিঠিটা নিয়ে এসেছে। সেই মিনি, মিনিকে এখন ওর এক করুণ ভিখিরির মতো মনে হল। ওর মিনি, প্রেম করা বউ মিনিকে ওরকম ভাবতে মন চায় না। তাই পকেট থেকে চিঠিটা টেবিলেরেখে ভিতরের ঘরে চলে যায় নিঃশব্দে। মিনির দিকে ফিরেও তাকাতে ইচ্ছে হল না।

কিন্তু ভিতরের ঘরে গিয়েই বা কোথায় নিশ্চিন্তি। দুটো তো মাত্র ঘর। বাইরের ঘরে চেয়ার টেয়ার কয়েকটা এবং লোক দেখানো এটা সেটা সাজিয়েছে মিনি। ভিতরের ঘরই বেডরুম খাবার ঘর ভাঁড়ার সব কিছু, শুধু এক চিলতে রান্নাঘর আছে লাগোয়া। অন্য সময় রাগটাগ হলে বাইরের ঘরে এসে বসে থাকে বাবু। আজ মিনি বাইরের ঘরে রয়েছে। ভাল্লাগে না এসব। এমন তো প্রায়ই ঘটছে। এর নাম কি নির্ভর করা! বাবু তো একে নির্ভর করা ভাবতে পারছে না, এ কেমনতরো হয়ে গেল মিনি। শুধু সন্দেহ করে। বাবুকে একা একা কোথাও যেতে দেবে না, নিজেও যাবে না, ভয়ে নয় একটা অশান্তির ভাবনায়ই বাবু মিনিকে মানিয়ে চলে। সেদিন, তাও ছুটির পর নয়, অফিস পালিয়ে কয়েক বন্ধু সিনেমা দেখল একটা, মিনিকে বলেনি। গোবিন্দ একদিন কথায় কথায় ব্যাপারটা জানিয়ে দিল ওকে। ব্যাস, আত্মপক্ষ সমর্থনের চান্স না দিয়েই তিনদিনের ফাঁসি হয়ে গেল ওর। কথাবার্তা বন্ধ একেবারে। আর একদিন, থাক আর একদিন, এরকম অনেক আর একদিন আছে মিনির।

মিনিকে বলতে ইচ্ছে করে তুমি এরকম হয়ে যাচ্ছ কেন? সেই দিনগুলি ফিরিয়ে দাও মিনি। আসামের গাঁইয়া কলকাতা গেছি। এই গাঁইয়া লোকটাকে শহুরে করার কত চেষ্টা করেছ তুমি। তোমার বন্ধুবাহিনী নিয়ে কত জায়গা ঘুরে দেখিয়েছ। বেলুড় মঠে বাদাম খেতে দাওনি, ব্যারাকপুর গান্ধীঘাটে নৌকো চড়তে দাও নি। আর এক দিন, শুধু তুমি আর আমি জয়গাছিতে গিয়েছিলাম তোমার এক বান্ধবীর বাড়িতে। হাবড়া ষ্টেশন থেকে সন্দেশ কিনে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম, তুমি দাওনি, বলেছিলে, ওসব এদিকে চলে না। তোমার শাসন তখন এত মধুর ছিল। এরকম প্রাক্তন সুখগুলির সঙ্গে এখনকার মিনিকে মেলাতে বড় কষ্ট হয় ওর। না, মিনি এরকম হতে পারে না, মিনিকেও বুঝতে পারছে না, কোথাও একটা গণ্ডগোল হচ্ছে, বাবু ভেবে দেখল, আজ এমন হঠাৎ করে চটে যাওয়ার মানে ছিল না। এমন সময়ই, বাবু যখন মিনির জন্যে মমতায় আকুল হচ্ছিল তখনই একেবারে বাচ্চা মেয়ের মতো এঘরে দৌড়ে আসে মিনি। বাবুর হাতে চিঠিটা বাড়িয়ে দেয়।

কোমরে দুহাত দিয়ে মুখে ফেটে বেরুনো খুশীকে ঠোঁটচাপা দিয়ে দাঁড়ায়। চিঠির দিকে তাকানোর আগে মিনির দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা দেখল বাবু। শনিবারের ভাগ্যিটা এত সুন্দর! একটু আগে স্বাতী ছিল, এত সুন্দর দুপুর, ঘরে মিনি, হয়ে গেল পুরনো মিনি। বাবু মিনির চোখে তাকায় বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে। মিনি বলে,—কি দেখছ। বাবু বলে,—ভাবছি! মিনি ওর হাতের অর্ধেক খাওয়া সিগারেটটা টেনে নিয়ে বলে— কি ভাবছ? বাবু বলে—ভাবছিলাম সন্দেশের কথা।

—কোন সন্দেশ?

—সেই যে সন্দেশ আর আসে না।

মিনি খিলখিলিয়ে হাসে।

এই সন্দেশ নিয়ে একটা মজার ব্যাপার আছে। মিনি দোকানিকে সন্দেশ আর রাধাবল্লভী দিতে বলেছিল। কলকাতায় কোনটাকে কি বলে জানে না বাবু। সন্দেশকে রাধাবল্লভী ভেবে খেয়ে নিল। তারপর দোকানিকে সন্দেশের কথা বলতেই মিনির খিল-খিল হাসি। বাবু তো জানত সন্দেশ মানে, 'সুখে থাক' বা' প্রাণসখা'র সাজে ক্ষীরের সন্দেশ।

সুখী মিনির চোখ থেকে দৃষ্টিটা এবার চিঠিতে সরিয়ে আনে বাবু। চিঠি কই, চিরকুট একটা একলাইনের, 'রবিবার সকালে প্লেনে আসছি' 'রঞ্জন্'। কোমরে হাত নিয়েই বাবুর আরো কাছে এসে মিনি বলল, —'ফাজিলটা আসছে, জ্বালাতে।' বাবু বুঝেও কনফার্ম—করার জন্যে মিনিকে বলল, —কোন রঞ্জন্, এক পচপান্ন?'

বাব্বা! তোমার এত মনেও থাকে।

—ব্বা, এক পচপান্ন মনে থাকবে না?

—ব্যাটা সিলেটি জন্ম থেকে কলকাতায়, পঞ্চান্ন বলতে পারে না। মিনি হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ে। মিনির বন্ধু রঞ্জনকে বাবুর খুব পছন্দ। বড় প্রাণোচ্ছল ছেলে। মিনি পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল 'আমার ফেউ, রঞ্জন'। রঞ্জনও মোটেই নার্ভাস না হয়ে বলেছিল, মাই টাইগ্রেস, আমার বডিগার্ড, এডিকঁ। তারপর বাবুকে শুনিয়েই মিনির কানে কানে বলে, তোর বাঘকে জাহাজটাহাজ দেখাবিনা, বলেই একটা ট্যাক্সি ডেকে সোজা আউটরাম ঘাট। ভাড়াটা ওই দেয়, মিনি ওকে জিজ্ঞেস করে —কত দিলিরে? রঞ্জন বলে —এক পচপান্ন'। আর সঙ্গে সঙ্গে মিনি বাবুকে চিম্‌টি কেটে নিজেই হেসে লুটোপুটি খায়। সেই রঞ্জন আসছে।

রঞ্জন আসছে। রোদের উমপাওয়া আদুরে বিড়ালের মতো মিনি বাবুর গায়ে গায়েই লেপ্টে আছে রঞ্জন আসার এই চিঠিটা পাওয়ার পর থেকেই। মিনি এত খুশি হয়েছে। আসল কথা কলকাতার মেয়ে নূতন পরিবেশে মানিয়ে নিতে পারছে না। ভরপূর্ণিমার পরের রাতই তো ঘুরঘুট্টি অমাবস্যা হতে পারে না। তাই রঞ্জন আসবে বলে একটু সাহসের উম দিচ্ছে। বাবুও এমন কিছু একটা চাইছিল। বাবুর সঙ্গে ঝগড়াটগড়া করেও মিনি তেমন আনন্দ পায় না। শেষ পর্য্যন্ত বাবুকেও হারিয়ে দেয়। রঞ্জন বা মিনি কেউই কখনও হারে না। ওরা কখনও সোজা ভাষায় কথাও বলে না। মুখপুড়ি উল্লুক শুঁটকি হোঁৎকা এসবই ওদের সম্বোধন। বাবুরও রঞ্জনকে খুব পছন্দ। তার উপর এখন ওকে দেবদূত মনে হচ্ছে। এমন একটা সময়ে ও আসছে। খুশি খুশি মিনির চোখে তাকিয়ে বাবুর গলায় খুশির শিহরণময় একটা সুর গুনগুনিয়ে

উঠে। 'আজি মোর শূন্য ঘরে আসিল সুন্দর'। ভাবনাহীন ইচ্ছে চেপে সুরগুলি এসেও যায় বিনা নিমন্ত্রণে!

রঞ্জন আসার খবরটা অনেক সময় নিয়ে উপভোগ করে দুজনে। কোন কথা না বলে। শুধু সুখী সংলগ্ন সময় কাটিয়ে। মিনি বাবুকে কিছু বলতে যায়— কলিংবেলের আওয়াজে বাবু সুন্দরের আগমনী থামিয়ে বাইরের ঘরে আসে । মিনি ওকে সাবধান করে দেয়, আজ কোথাও বেরবে না কিন্তু! দরজা খুলেই দেখে গোবিন্দ, ব্যাটা তুমি! তোমার না এ বাড়িতে আসা বারণ, আমার বউ না মিশুকে না, আমাদের কলকাতা ছাড়া কথা বলে না, তবে কেন? এসব কথা বাবু গোবিন্দকে মনে মনে বলে, প্রকাশ্যে বলে, —কি ব্যাপার রে? গোবিন্দ বলে, সোমবার অফিস যাবে না, বাবু যেন জানিয়ে দেয়। 'আচ্ছা' বলতে গিয়ে বাবুর মনে পড়ল সোমবারে ওরও যাওয়া হবে না হয়তো। রঞ্জন আসছে, কি প্ল্যানট্যান আছে ফাজিলচন্দ্রের কে জানে? তাই গোবিন্দকে বলে, —আমিও যাব না রে!

ব্যর্থমনোরথ গোবিন্দ যখন উঠবে উঠবে করছে তখনই মিনি চায়ের কাপ নিয়ে ঢুকল ঘরে। একি! স্বপ্ন নু মায়ণ নু........ একি আমার বউ? আমার বন্ধুর জন্য না বলতেই চা নিয়ে এসেছে, আবার গল্পও জুড়ে দিয়েছে। দ্যাখ, দ্যাখ! গোবিন্দ, দেখে নে আমার ডাঁটিয়াল বউকে! দাঁড়াও বউ! তোমারও খুশির বেলুনটাকে একটু পাংচার করে দিই এবার।

মিনিকে চটিয়ে দেওয়ার লোভটা হঠাৎই হয় বাবুর। গোবিন্দ চলে যেতেই বলে,--

--গোবিন্দ কেন এসেছিল, বলেছে?

--বলল তো কি একটা খবর ছিল।

--খবর নয়, বল দুঃসংবাদ। রঞ্জন আসছে না।

--ধ্যাৎ। মিনির আনন্দিত মুখটা বড় করুণ হয়ে যায়। বলে, —'ফাজিল, ঘটা করে ফাজলামো করার মানে ছিল না, রবিবার সকালে প্লেনে আসছি।' মিনি খুব সিরিয়াস হয়ে যেতেই, বাবু, নিজের মুখটাকেও যথাসম্ভব দুঃখী সাজিয়ে নেয়। মিনি বাবুর আরো কাছে এগিয়ে আসে, বলে—'আর কলকাতা যাব না কখনও।' মিনির চোখে অভিমানী মুক্তোবিন্দুগুলি টলটল করছিল। বাবু ওর ভুল বুঝতে পারে, দুঃখী মিনির মুখের দিকে তাকিয়ে ওর অনুতাপ হয়, এরকম নিষ্ঠুরতা ওর উচিত হয় নি। এত সুন্দর মুহূর্তটাকে নষ্ট করে দিল সে । খেলা ভেঙে দেয় বাবু। মিনি অভিমানী পাখির দৃষ্টি নিয়ে তাকায় বাবুর চোখে। বলে, —'তুমিও।'

হতবুদ্ধি বাবু মিনির বাঁ হাতটা ওর হাতে নিয়ে বারবার বলতে থাকে—'আমার ভুল হয়ে গেছে মিনি।'

মিনি ওর ডান হাতটাও বাবুর হাতে রাখে। বলে, —'হ্যাঁ, হয়েছে তো.আর এরকম করবে না।' বাবুর সব দুর্দিনের সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে মিনি আবার ঝলমলিয়ে ওঠে।

ইচ্ছে করে মিনিকে দুঃখী করেছিল বলে ওকে সুখী করার জন্য কিছু একটা করতে চেয়ে বাবু আলটপকা মিনিকে বলে-- কলকাতা যাবে?

--হঠাৎ যে ? মিনি সন্দেহের চোখে তাকায়।

—না, বলছিলাম আমার তো ছুটি নেই, রঞ্জন আসছে। ওর সঙ্গেই কেন চলে যাও না?

প্লেনে উঠিয়ে দেব, দুঘন্টার তো মামলা। মিনি এবার বাবুর আস্তিন সজোরে খামচে ধরে বলে, --'কেন যাব? রঞ্জনের সঙ্গে কেন যাব?' সত্যিই তো, মিনি কেন রঞ্জনের সাথে যাবে? মিনির জবাবে বাবুর সারা শরীরে এক দারুণ আনন্দের শিহরণ খেলে যায়। মিনির জবাবি মুখটায় তাকিয়ে নূতন করে দেখল মিনিকে। কেন যাবে মিনি, কেন যাবে রঞ্জনের সঙ্গে, আমার মিনি?

একি সেই মিনি, যে মিনি বলত, --তোমার তো কত চেনা জানা লোক কলকাতা যায়, বলে দিও, আমি একাই যেতে পারব।

তবু, আসছে রঞ্জন। কাল আসছে। ছেলেটা যেন একটা ঝড়। কি জানি কেন আসছে। মিনিকে লেখেনি। আর মিনি লিখে মাথা কুটলেও আসবে না, যদি ওর মাথায় খ্যাপা পোকাটা পারমিশান না দেয়, বাবু মিনিকে বলে,--

--এরকম অপ্রস্তুত করার মানে হয়, একদিনের নোটিশে!

--তোমার ভাগ্য ভাল নোটিশ দিয়েছে। তবু বাবু মিনিকে বলে,

--কি করা যায় বলতো? আমাদের ঘর দোরের যা ছিরি!

মিনি নির্বিকার ভাবে বলে, --ও একটা গাধা এবং গন্ডার, ওর জন্যে ভাবতে হবে না, ও মাটিতে পাটি পেতে শোবে।

--ধ্যাৎ, আমার বউ-এর বন্ধু, শালা বলে কথা, বলে বাবু ঘরের এটা সেটা টানতে থাকে। মিনি কাজের ছেলেটাকে ডাকে। একটা ছোট্ট খাট বাঁধা ছিল, তাই পেতে নেওয়া হয় বাইরের ঘরে।

প্রবলেম হলো বাথরুম নিয়ে। বড়ঘর দিয়ে যেতে হবে। বড়ঘরের লাগোয়া। ওঘরে তো মিনি আর বাবু। বাবু মিনিকে অসহায় ভাবে বলে-- কি হবে বলতো? --কিছুই হবে না, বড়ঘর দিয়েই যাবে। মিনির উত্তরে সাহস পায় বাবু, -- ঠিক আছে ঘর আমাদের যেমন আছে তেমনই থাকবে, রঞ্জন তো আর বাইরের লোক নয়।

মিনিই বাবুকে তাড়া দিল আজ। --নাও তৈরি হয়ে নাও, কিছু বাজার টাজার করতে হবে। --তাইতো বাবুরও যেন মনে পড়ে যায়। এখানে এসে অব্দি বাজার টাজার করেনি, কাজের লোকটা যা এনে দেয় তাই। মিনিও তো বেরুতে চায় না। কোথাও যেতে চাইলে বলে, --ভাল্লাগে না। সিনেমা দেখতে চাইলে বলে, --কোন ছবি? নাম শুনে বলে, --ওটা আমার দেখা, বাজে ছবি।

কেনাকাটা সেরে রাত সাতটায় বাড়ি ফিরল দুজনে। মিনি বলে, --আজ রান্নাবান্না করতে ভালো লাগছে না। বাবু কথাটা লুফে নেয়, বলে, --চলো হোটেলে খেয়ে নিই, অনেক দিন খাই না।

শুধু হোটেলে খাওয়া হয় না। মিনির আগ্রহেই নাইট শো সিনেমা দেখতে যায় ওরা। বাবু বলেছিল, --আজ গিয়ে কি করবে, কাল তো রঞ্জন আসছে, একসাথেই। মিনি বলে, --'না আমরা দুজনে দেখব।' এরকম ইচ্ছে তো বাবুর অনেক দিনের। শুধু মিনিই এরকম ছিল না।

সিনেমা শেষের পরও বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না মিনির। ভাবছিল, --রাতটা শেষ হলেই ও আবার সেই একা মিনি হয়ে যাবে না তো? তাই বাবুকে বলে, --আজ সারারাত যদি আমরা বাইরেই কাটিয়ে দিই?

—দারুণ হবে। পুলিশ ধরবে। জেল হবে।

—ধরুক। মিনি কিছুই মানবে না।

—কাল সকালেই রঞ্জন আসছে, এয়ারপোর্ট যেতে হবে না, রাতজাগা চেহারা দেখলে ভাববে ওর টাইগ্রেস খেতে পায় না বিয়ে হয়ে।

—ঈশ! ভাবলেই হল। বাবুর কাঁধে মাথা রেখে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফেরে দুজনে। বাবু আর মিনি।

বাড়ি ফিরেও ঘুম হয় না। দারুণ কথার নেশায় পেয়েছে মিনিকে। অনবরত বলেই চলেছে এটা সেটা। বাবু ভাবে, —এইতো আমার মিনি। পুরনো মিনি।

মিনি বলে, —আমাকে নিয়ে তোমার খুব অশান্তি না গো? একথার কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না বাবু। খুব আদরে সোহাগে জড়িয়ে ধরে বলে, —না গো না, তুমি খুব ভাল বউ যে আমার।

বাবু এবার মিনিকে সত্যি কথাটা বলতে একটুও ভয় পায় না

—জান, আজ দুপুরে সিনেমা যাইনি।

—জানতাম। এও জানতো মিনি?

—মোটেই জানতে না, বলতো কোথায় গিয়েছিলাম?

—অফিসের কোন বন্ধুর সাথে আড্ডা দিচ্ছিলে।

—মিলেছে, তবে বন্ধু নয়, বান্ধব।

—স্বাতী নিশ্চয়? হাসি মুখেই স্পষ্ট উচ্চারণ করে মিনি। এত সহজে স্বাতীর নাম এই প্রথম মুখে আনল মিনি। কোন সন্দেহ বা ঈর্ষার লেশমাত্র আভাসও নেই কণ্ঠস্বরে। বাবু এত হালকা বোধ করছিল। বাবু ভাবছিল, আরো যেন কি মিনিকে বলা হলো না। এক মজার প্রগলভতায় পেয়ে বসে ওকে। আর একটা সত্যি কথা বলতে যায়, —জানো মিনি, আজ যখন সকালে আমাকে সন্দেহ করেছিলে, তখন তোমাকে একটা ভিখিরির মতো ভেবেছিলাম। ওকথা বলা যায় না, তাই, বলে,—

স্বাতী বলছিল, আমি নাকি বদলে গেছি।

বিয়ে করে তো?

ওরা তাই বলে। কিন্তু ওটাও সত্যি নয় মিনি।

মিনি বাবুর মুখে হাত দিয়ে খুব আদুরে গলায় বলে,

—না গো, আমি তোমায় সুখ দিই নি একটুও, কেমন পাগলাটে হয়ে গিয়েছিলাম।

মিনি আমার মিনি। মিনিকে আবেগে আশ্লেষে জড়িয়ে ধরে বাবু।

আর কথা নয় এখন, শুয়ে পড়, ভোরে উঠতে হবে, রঞ্জন আসছে। বাবু মিনিকে বলে, কিন্তু ওরও শুয়ে পড়তে ইচ্ছে নেই একটুও। অনেক রাতই তো পাশাপাশি শুয়ে ঘুমিয়েছে দুজনে।

শতক্রতু, ১৯৭৮

ফুলমালার সংসার

দুন্দুবুড়ি কথা

চাঁপার চাঁপার কলির মতো আঙুলগুলি ময়ূরের মুদ্রায় নাচছে ঘিরি ঘিরি ঘিরিয়ে। ময়ূরের মুখ গুঁড়োমাটি খুঁড়ে ঘুরছে ক্রমাগত। দক্ষিণের বাড়িদুটোর মাঝখানের শূন্য ভেঙে আলো এসে পড়েছে চাঁপার শ্যামল সুন্দর মুখে। তেলতেলে মুখের উপর মাছির উৎপাতে অনবরত মাথা দুলিয়ে যাচ্ছে। উর্ণাময় বিনুনির বলদুটো চাঁপার পিঠকে টেবিল করে নিঃশব্দে টুংটাং খেলে বেড়াচ্ছে। ছড়ার ছন্দ ছয় বছরের বালিকার কণ্ঠ থেকে মন্ত্রের মতো ছড়িয়ে পড়ছে পিঁপড়ের ঢিবির চারপাশে, দুন্দুবুড়ি নাচ করে, সাহেব দেখে সেলাম করে। ছড়ার উদ্ভট কথা দিয়ে শহুরে সকালকে নতুন মাত্রায় সঞ্চারিত করে যাচ্ছে অমলকান্তির ছোট্ট মেয়ে চাঁপা।

অভ্যস্ত এক হাতে টুথপেস্ট লাগাতে গিয়ে ফসকায় অমল। ব্রাশটা নিচে পড়ে যায়। নিচু হয়ে ওঠাতে গিয়ে চন্দ্রার সঙ্গে চোখাচোখি হয়। বছর চারেক আগে আঠারো পেরনো, সুদর্শনা যুবতি চন্দ্রাবলী দত্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ে শঙ্খ ঘোষের ক্লাস করা ছাত্রী এখনো। চন্দ্রা চাঁপার খেলা দেখছে। একা খেলার উদ্ভুট্টি কথাকে সুন্দর তালে লয়ে গুছিয়ে নিয়েছে পাকাবুড়ি। কর্ণমধু গ্রামে মেয়েকে শৈশব দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল অমলকান্তি। পিঁপড়ের ঢিবি দেখিয়ে বলেছিল, চারপাশে আলতো আঙুল ঘুরিয়ে ঐ কথাকটি সুর করে বললে সুঠাম সুন্দরী এক পিপীলিকা এসে মাথায় হাত তুলে দাঁড়াবে। মেয়ে প্রশ্ন করেছিল, --সত্যি দাঁড়াবে? --হ্যাঁ, আমরা কত করেছি, দাঁড়িয়েছে। মেয়েকে তার শৈশবের সত্য ফাঁকিতে রেখে বলেছিল। শীতের শুরুতে গ্রামভাসি জীবনে শিকড়ের জীয়নকাঠি ছোঁয়াতেই কর্ণমধু গ্রামে মেয়ে বৌকে নিয়ে যায় অমল। বাবার ছেলেবেলার গল্প যখন গ্রামের অম্মাদাদুর কাছে পুরাণকথার সত্যে মিলিয়ে নেয়, তখন কি আনন্দ চাঁপার। কথার সত্যকে তার বাল্যে গুছিয়ে নিতে তাই, ভোরে উঠেই মেয়ে দুন্দুবুড়ির খেলায় মেতে ওঠে।

[illegible]তায় আবার ব্রাশ মাটিতে ফেলে অমলকান্তি। দ্বিতীয়বারের শব্দে পর্ণা রান্নাঘর থেকে এসে উঠিয়ে দেয়, মাজনও লাগিয়ে দেয় একদলা। নিচে ঝুঁকে মেয়েকে দেখে। প্রতিবেশিনীর সাঁজোয়া কন্যার মুখটাও একঝলক দেখে। অমলকান্তির দিকে অপাঙ্গে তাকায়, তার মাইনাস সাতের চশমা আর প্রশান্ত হাসির ঘেরাটোপ দাগাতে প্রথমে স্বগত এক দীর্ঘস্বর 'ও' ব্যবহার করে। পর্দা টেনে দেয় জানালার --এবার মেজে নাও, একটু তাড়াতাড়ি ফেরো আজ, সুখনীড়ের রমলা বৌদির সাথে হাতিবাগান যাবো, কিছু টাকা রেখে যেয়ো। এ কে ফর্টিসেভেন রাইফেল থেকে

নিরীহ তুবড়ি বেরোলো চারটে। প্রথমে সার্বভৌমত্বের প্রতিষ্ঠা, দ্বিতীয় ও তৃতীয়ে নিপুণ দিবসবিন্যাস, চতুর্থে ব্যাপক জিজিয়া।

পর্ণা জানে মিষ্টি কথায় অমলকান্তিকে নিশ্চিন্ত করা যায় না। তাই, সকাল থেকেই ডাইরেক্ট অ্যাকশনে নেমেছে। ক্ষেপিয়ে দাও, লড়িয়ে দাও। তুমি সেফ, সব আদায় হবে। অভ্রান্ত নিদান। অমলকান্তিও জানে তার চরিত্রের দোষ বা গুণ যাই হোক, এরকমই। কিন্তু মাসের শেষে এখন টাকা পায় কোথায়। প্যালা শুনতে তো ছদিন বাকি। মেয়ের জন্মদিন আরো দশদিন পর, ছয়ই ফেব্রুয়ারী। চাঁপার ড্রেস কিনবে রমলাবৌদিকে সঙ্গে নিয়ে। মহিলার চয়েস নাকি খুব ভাল। দোকানপাটও জানাশোনা। সুভাষদার স্ত্রী বলে পরিচিতি নয় বরং বৌদির দাপটেই সুভাষ চৌধুরীর রাজ্যপাট। আপাতত জননেতা। উচ্চাশা তো রয়েছেই। অমলকান্তি জানে, কেনাকাটা মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। চান্স পেয়ে গায়ে একটু মিনি-মাগনায় বাতাস লাগিয়ে আসা। রাধাতে ভিক্টর ব্যানার্জীর ছবি দেখেই আসবে হয়তো। রমলা বৌদি বাংলা ছবি দেখে না, সাতটাকার টিকিট পনেরোতে 'খুদা গাওয়া' দেখবে আজ। খাওয়া দাওয়াও হবে গোলঘরে, কিমাকারি পরটা। অমলকান্তির অপত্যের দুর্বলতা ভাঙিয়ে ফুর্তিফার্তা হবে।

রত্নাকর অমলকান্তি স্ত্রীকে শুধু এক অর্থকরী মহাবিদ্যা বলেই ভাবছে আপাতত। মামাজিকে তার প্রয়োজনের আভাস একবার জানিয়ে যাবে। অফিসে যাওয়ার আগে টেলিফোনেই বলবে। এস ও এস। যা চাই পরতে খাইতে পারি। মামাজি ইলেক্ট্রনিক্সকেই ডীলারশিপটা পাইয়ে দেবে। যেখানে খুশি যাইতে পারি। চাইকি মেয়ের জন্মদিনে ডায়মন্ডহারবার ঘুরে আসার প্ল্যানও করা যায়। ডিলারশিপটা এমনিতেই পেয়ে যেতো ওরা।

অমলকান্তির বউয়ের খুশিতে দুটো পয়সা বেশি মুনাফা করবে মামাজি। সবাই নেয় কমিশন, এ তার প্রাপ্যই। জেনুইন। যাক্, টাকা যোগানোর চিন্তামণি একজন তো পাওয়া গেল। তা বলে পর্ণার কাছে এত সহজে হেরে যাওয়া যায় না, সামান্য প্রতিরোধ তাকে দিতেই হবে। রাগ যে তারও আছে তারই প্রলোগ হিসেবে মুখ ধুয়ে ঢকঢকিয়ে এক গ্লাস জল খেয়ে চায়ের টুংটাং উপেক্ষা করে নিচে চলে যায়। যেখানে চাঁপা দুন্দুবুড়ি খেলছে রোদ্দুরে। আঙুল বিহীন তার বাঁহাতে রুমাল বদল করে ফর্সা একখানা জড়িয়ে নেয়। নামার আগে বাঁ হাতের ঠেকা দিয়ে চুলে চিরুনি চালাতেও ভোলে না অমলকান্তি।

নিচে ততক্ষণে খেলা শেষ করে দিয়েছে চাঁপা। —দুন্দুবুড়ি আর নাচবে না? ঐ দেখ চন্দ্রাদিও নাচছে। অমলকান্তি উপরে চন্দ্রার জানালার দিকে আঙুল তুলে দেখায় মেয়েকে। নাথবতী দয়িতা, পরের ঝিয়ারি ও আপন দুহিতা এই তিন শক্তিতে বিব্রত আনমনা অমলকান্তি 'চন্দ্রাদিও দেখছে' বলতে গিয়ে ভুল করে। চাঁপা অমলকান্তির কথার ভুল ধরল না বরং রাগ করে বলে বসে —ওই তো দুন্দুবুড়ি। বালিকার কোপের কারণ জানার চেষ্টা করে না, মেয়েকে নিয়ে উপরে উঠে আসে অমল। অফিস যাওয়ার আগে মামাজিকে টেলিফোন করতে হবে।

অমলকান্তিকে তাড়া দিয়ে কিছু করানো যায় না, পর্ণা জানে। তাড়াতাড়ি ফিরতে বলেছিল কথা টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সে ফিরল তার সময়েই, তিনটেয়। এক অসুন্দরকে প্রতিরোধ করতেই শরীরের বাকিঅংশগুলোকে সতেজ স্বাভাবিক রাখে সে। অকারণ চাপ নেয় না। আঙুলবিহীন হাতের পাতা এখন আর শারীরিকভাবে তাকে বিব্রত করে না। মনের ভাব মনে থাকুক, শরীরকে

কোন ধকল দেয় না। সহজ সপ্রতিভতাকে তার স্বভাবে বসিয়ে নিয়েছে। এক বৎসরের চাঁপা যেদিন খাট থেকে পড়ে গেল, পর্ণার তড়াক তৎপর চিৎকার এবং দৌড়ে আসাকে র্ভৎসনা করেছিল অমলকান্তি। পড়ে যাওয়ার পরের ক্রিয়া কখনই আর্তনাদ বা দৌড়ানো যে নয়, তা বোঝাতে পেরেছিল পর্ণাকে । এখন টেলিফোন, কলিং বেলের শব্দেও অকারণ তৎপরতা দেখায় না অমলকান্তিরা।

বাঁ হাত নিয়ে তার সব দুর্বলতা । হাতটাকে তাই ফর্সা রুমালে ঢেকে রাখে সর্বক্ষণ। কেউ বলে একজিমা, পুরোনো ঘা, ছোঁয়াচে, কেউ বলে পকেটে হাত ঢুকিয়ে চলাফেরা করাও স্টাইল। তার বিকল হাত নিয়ে অনেকেরই প্রশ্ন। জবাব জানে কমজনেই। তাই কৌতূহলীদের সঙ্গ কঠিন নির্মোকে ঢেকে কাটায় অমলকান্তি। গাম্ভীর্যকে তার স্বভাবের নির্মাণ করে নিয়েছে। গেরেমভারী যেমন অপবাদ, স্মার্টনেসও তো তার স্বচ্ছন্দ সুবাদ ।

ঠকাতে বা বিভ্রান্ত করতে তার মুখোশের ব্যবহার করে না অমলকান্তি। নিজেকে সপ্রাণ রাখতেই তার বিকলতা লুকিয়ে রাখে। ঠকায় না কাউকে। একবারই মাত্র তেমন হয়েছিল। যখন চাকরিতে জয়েন করল। ইন্টারভিউয়ার তাকে দেখে কিছুই বুঝতে পারেনি। সেও সচেতনভাবে ঠকিয়ে গেছে। ওর পরিণামদর্শী ভাবনায় তখন চাকরি পাওয়াটাই মুখ্য। কোম্পানিও তো আখেরে ঠকেনি। সফল সেলস ম্যানেজারই বলা যায় তাকে । যে মামাজিকে ওদের নতুন ডিলারশিপের জন্য বেছে নিল, তা শুধু তার কমিশনের জন্য? কোম্পানি তো কনভিন্সড, মামাজিরা মার্কেটিং বোঝে ভাল।

পর্ণাকেও অমলকান্তিরা ঠকায়নি । পাতানো বিয়ের শর্ত মেনে ওর বাবা ভদ্রলোকের ভাষায় ওদের জানিয়েছিলেন সব। পর্ণা মানে না। পাতানো বিয়ের শর্তই রাখা ঢাকা। চাপাচুপি। দেখাদেখি হওয়ার পর তিনমাসের শূন্য ভরাট করতে অমলকান্তি কলকাতা থেকে চিঠি লিখেছিল শিলচরের পর্ণা চৌধুরীকে ! —একহাত কাটা খন্ড মানুষ আমি। স্বপ্ন বুনে লিখেছিল অমল —কি করে যে পছন্দ হলো আমাকে! সততা, না মোহ বিস্তৃত ছিল তার পত্রভাষায়? অগ্রহায়ণেই পাকা দেখা, বিয়ে, সব ঠিক ছিল। নানা অজুহাতে পর্ণারাই তিনমাস পিছিয়ে দেয়। পর্ণাও লিখেছিল। চিঠির মেজাজ আর শুদ্ধ বাংলা অমলকান্তিকে মুগ্ধ করেছিল। —আমিও এক খাঁদা পাত্রী, নাক নেই, দাঁত নেই, চুল নেই। স্বচক্ষে সে দেখেছে সুন্দরী পর্ণাকে। দাঁতে, চুলে, নখে এখনও সে সুন্দরী। ধাঁধা, এসব কথার ফাঁক ভরাট করবে কে? পর্ণার পরিবারের লোকজন তো তার বিপক্ষ দলে, আর জানে সে। কাউকে বলতেও তো পারে না, আমার বউয়ের সামনের পাটির দাঁত কটা ফলস। পরপর্বে পর্ণার এই চাতুরিও বারবার বির্তকে এসেছে তাদের জীবনে।

কলিংবেল, প্রথমবারের শব্দে গা করল না অমলকান্তি। পাঁচটার কাছাকাছি তো। সীতা এসেছে। কাজের মেয়ে। রুমাল তুলে চাঁপাকে বললো দরজা খুলে দিতে । খেয়ালি একবগ্গা মেয়ে, কিছুতেই দরজা খুলবে না। বাপের স্বভাব যেমন, এককাজে থাকলে অন্যদিকে ফেরানো যাবে না সহজে। এখন সে অনেকবার শোনা রূপকথার গল্পে মশগুল । দ্বিতীয়বার দরজা খোলার কথা বলায় অনিচ্ছুক ল্যাচলকে হাত লাগাতে লাগাতে টেপাইয়ের গল্পে বিভোর চাঁপা অমলকান্তিকে বলে—টিয়াপাখি কি বলল বাবা ? বেডরুম থেকে অমলকান্তি বলে—দরজা খোল বলছি। তারপর টিয়াপাখি বলল, গা তোল গা তোল টেপাই, ভাত বাড়, এলো সাতভাই।

টেপাইয়ের গল্প তারও মুখস্থ, চাঁপারও । মুখ্য এবং মজার চরিত্রে পাখি না থাকলে নতুন গল্প শুনবে না চাঁপা। তাই, অমলকান্তি তার পুরোনো প্রিয় গল্পই রিপিট করে যায় নিরাপদে।

পাখিদের সঙ্গেই বন্ধুত্ব চাঁপার। বাড়ির জঙ্গলের কাক, শালিক,চুড়ুই ছাড়া চিড়িয়াখানার পাখি, বইয়ের পাখিরাই তার সব প্রিয় সখা। বাবার সঙ্গ তো সকাল সন্ধ্যার মাপা সময়ে। মা সারাদিনের কাজে ব্যস্ত। কাকা শ্যামলকান্তি বারবি পুতুলের সংসার কিনে দিয়েছিল। সাজিয়ে রেখেছে শোকেসে। কাকা বলেছে পাখিরালয়ে নিয়ে যাবে। কাজে সুন্দর, নামে সুন্দর পাখিদের অনেক গল্প জানে কাকা। দুষ্টুমিষ্টু অনেক বাঙালি পাখিদের চেনে সে । হলদেগোল, কালোকপাল, ফটিকজল, নীলকটকটিয়া, লালগাল মৌটুসি, মুনিয়া, টুনটুনি, চন্দনা, বেনেবউরা নামে প্রিয়, আর কাজে প্রিয় রূপকথার পাখিরা, ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমি শুক শারিরা খুব মজার কাজ করে। ঘোড়া হয়েও পাখির মতো উড়ে যায় পক্ষিরাজ। লক্কা, ফাকতা, লোটন, গেরোবাজরা খেলা দেখায়, চিঠি পৌঁছে দেয়। হাঁসের মুখেও চিঠি পাঠানো যায়। কাকা তো বলে, মেঘও নাকি পাখির মতো অনেক খবর নিয়ে যায় উড়ে উড়ে । পাখিদের যেমন, ছোট ছোট পিঁপড়েরাও চাঁপার খেলার সাথি। রবিবার দুপুরে অমলকান্তি দরজা-বন্ধ শোবার ঘরে নীলদিগন্তে ম্যাজিক-এর শেষ কিস্তিতে চোখ রেখে ঘুম আর মেয়ের খেলা চুরি করছিল। চন্দ্রাদের ছাদে বসা জোড় ভাঙা দুঃখী শালিকের সঙ্গে মিতালিতে তার মেয়ের একটানা প্রচেষ্টা থেকে চোখ কান কিছুতেই সরছিল না। পাখির সাথে কথোপকথনে ভীমপলশ্রীর রাগরূপ ছড়াচ্ছিল অমলকান্তির এইটুকুনি মেয়ে, শালিকপাখি, শালিকপাখি, তুই আকাশের মালিক নাকি।

কলিংবেল আবার বাজতে চাঁপা বিরক্ত অমলকান্তির দিকে তাকিয়ে বলল,—তারপর টেপাই কি বলল জান বাবা? দরজাও খুলে দিল,--অভাগা, অভাগা টিয়া, ঘন ঘন ডাকিস কিয়া । ওমা তুমি? দরজা খোলা রেখে দৌড়ে এলো চাঁপা। অমলকান্তির কানে কানে বলল,--দুন্দুবুড়ি । কাজের মেয়ে নয় বুঝে গেছে মেয়ের অপ্রতিভতায়। পকেটে হাত ঢুকিয়ে দরজায় এলে সেও অবাক। একটু সময় নিয়ে বলল, --আরে তুমি? ছবির মেয়েরা যেমন, পরনে ঝুলঝুলে স্কার্ট, গায়ে সাদার উপর গোলাপী চারপাপড়ির ছোট ফুলেল জামা, একেবারে গায়ে লাগাও নয়, তেমন মানানসই । ঠোঁটের রঙে, কানের ঝুমকোয়, জমকালো। সন্ধেয় ভোরের দুন্দুবুড়ি অমলকান্তির ঘুষঘুষে জ্বর হয়ে এলো। ভয় ভয় ভাললাগায় বিব্রত হয় সে। 'এসো, এসো' বলবে কিনা ঠিক করতে পারে না। এসো বলতে না পারলেও একটা জায়গা থেকে কথা শুরু করে দরজায় দাঁড়িয়েই। চন্দ্রা বাইরে। —দক্ষিণাপন যাবে বলে তো বেরিয়েছে, কলামন্দিরে ওর এক বান্ধবীর নাচের শো আছে আজ, আমি আপাতত চাঁপার পাহারায়। দরজা আগলে মিথ্যা কথাগুলি বলে অবলীলায়। বলতে বলতে ভাবে, অকারণ মিথ্যেরও কোন কারণ থাকেই। দীর্ঘ কথা বলার প্রস্তুতি এরকমই হয় । অগতিক চন্দ্রা, নাচের কথায় চাঁপার তুলতুলে গালে হাত দেয়। এইটুকুনি তো মেয়ে, কেউ গালে হাত দিলে আর রক্ষে নেই। চন্দ্রা বলে, —কী গো, তোমার দুন্দুবুড়ি বেরল? চাঁপা রাগের আঙুল চন্দ্রার দিকে ছুঁড়ে বলল--তুমিই তো দুন্দুবুড়ি। কথার ভঙ্গিতে অপ্রতিভতা এনে অমলকান্তি বলে-পর্ণাকে কিছু বলতে হবে? —না, না আমিই আসব আবার,......। চন্দ্রাকে কথা শেষ করতে দেয় না, দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দেয় চাঁপা। —একি অসভ্যতা। আবার দরজা খোলে অমলকান্তি। চন্দ্রা তখনও দাঁড়িয়ে—পাগলি কোন কারণে তোমার উপর খেপেছে, রাগ করো না, প্লিজ। অমু

ঘরে এসে বসতে বলার সাহস করে না অমলকান্তি। চন্দ্রা রাগ করে না, মুখে হাসি নিয়েই চলে যায়। চন্দ্রা অনিচ্ছায় গেল? ঘরে ডেকে একটু কথা বললে কি হত। অমলকান্তি তো তাই চেয়েছিল। অকারণ অশান্তি, পর্ণার ভয়ে, সোনার মেয়ের সঙ্গ পরিহার করল। সকালে চন্দ্রাকে জানালা দিয়ে দেখেছিল, তাই কেমন নাটকীয় তির্যকে 'ও' বলল। এরপর ঘরে ঢুকিয়েছে শুনলে তো বাড়ি মাথায় তুলবে। পর্ণার কাছে যত মহিলা, মেয়ে আসে তার থেকে একেবারে আলাদা এই বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া মেয়েটি। পাশের বাড়ির মেয়ে হিসেবেই আসে চন্দ্রা, ওর সমিতি করে না। একেবারে আলাদা, অলোকসুন্দরী নয়, দীপ্ত ঔজ্জ্বল্য আছে, কথায় চলনে। লাবণ্য পুঞ্জিত সৌন্দর্যের ভার নেই। আবার ডাকসুন্দরী পর্ণার কাছেও নিষ্প্রভ হয়ে থাকে না। কথা বলার সম্পর্কে এমন বিদ্যুল্লতা সান্নিধ্যও তো অভাবনীয় অমলকান্তির কাছে। মিহি ফিনফিনে সব যুবতী মহিলারাই পর্ণার সমিতির জড়ো। কিন্তু ধী, বুদ্ধিতে সবাই এনটিসির শাড়ি। অমলকান্তি কারো সঙ্গে কথা বলে খুব সুবিধা করতে পারেনি। পর্ণা এতে খুব নিশ্চিন্ত। আর রমলা বৌদি, মহিলা সমিতির সভ্যানেত্রী, যার সহ-সম্পাদিকা পর্ণা। বয়সে যথেষ্ট বড়, এখন আর সুন্দরীও নন। তাই পর্ণার নির্দেশেই, রমলা বৌদিকে এন্টারটেন করতে হয়, যখন পর্ণা থাকে না, তখনও। পাড়ার একচ্ছত্র গসিপ সম্রাজ্ঞী, রাজনীতির সুভাষ চৌধুরীর ধর্মপত্নী যার সহায়, সে নাগরিক সুরক্ষায় জেড ক্যাটাগরির। সে বোধ তার আছে। শুধু চন্দ্রার বেলায় অমলকান্তিকে আগলে রাখে পর্ণা। চন্দ্রার নাম নিলেও প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় দশবার।

· —বেটার লেট দ্যান নেভার কথাটার অর্থই যে তাই তোমার আজকের বইদান অনুষ্ঠানেই জানতে পারলাম।

—কি ব্যাপার বলতো, খুব যে সেন্টু খাচ্ছো আজকাল। একেবারেই ফর্মাল মানুষ নও তুমি। আর একে অনুষ্ঠানই বা বলছ কেন?

—বাঃ বলব না! এক মেলায় বই বেরোলো, আর মেলার প্রস্তুতিও শেষ। কবির তৃতীয় কাব্যগ্রন্থটিও হয়তো প্রকাশের অপেক্ষায়।

—না, প্রিয় নিন্দুকের আশায় ছাই দিয়ে পুরোনো বই দুটোই ছাতার নিচে থাকবে এবার।

—যাক, আশ্বস্ত হওয়া গেল, তবু তো কেউ নতুন মদের বোতলে পুরোনো কবিতা শোনাতে এলো। কবিতা শোনাবে তো, না নতুন সাধন-সঙ্গিনী কথা দিয়ে কথা রাখেনি বলে, টাইমপাস।

—কি অবিশ্বাসী নাস্তিক রে বাবা। তোমার কাছেই আসছিল। তোমার পরিবারের সবার নাম লিখে সইকরা বইটা সহ পাকড়াও করেছি আমরা।

—আমরা মানে? তোমার রস তো? তা, বোতলটাও কি তার সামনেই কেনা হলো?

—কেনা হয়নি তবে উনি দেখেছেন। তোমার সাথে একটু আড্ডা দেওয়ার জন্য, কবিতা শুনিয়ে রিয়্যাল আনন্দ পাওয়ার জন্য মাসদুয়েক আগে কিনে রেখেছিলাম। ভাবলাম, শীত জাঁকিয়ে বসুক। তাই, আর যোগাযোগ করিনি।

—কেন, আমি কি খুব ছোঁকছোঁক করি?

—তাই তো বলল।

--ও, তাই বলল। তুমি তো সতীরানী। হাবুডুবু খাও তবু জল ছোঁও না। বাক্সটায় একটা গিফ্‌ট আছে, ওটা আমার।

--ওটা সুভাষদার বুকপকেটে। ইলেক্ট্রনিক ঘড়ি লাগানো কলম। তোমার প্রিয় বন্ধু বৌদিকে দান করেছে।

--বাঃ, বেশ করেছে কবি। দিদৃক্ষু পৃথুলার ঈক্ষণ দিয়ে একটা কবিতায় শুরু হলে মন্দ না। যদি আসে মালও খাবে মাতলামিও করবে, আবাগি আমার নামে তোমার বউকে জুড়ে খাস্তা ফিস্‌ফিসও ছড়াবে ভোরের পর্যাবরণে। দাও।

--পরিয়াবরণ, টিভিতে শুনেছি কথাটা। তোমাকে এখন পরিবেশ নিয়ে ভাবতে হবে না। সে আসবে না, শনিবার তো, এসেই পুজো দিতে ছুটেছে।

এসব কথোপকথন রাত ন'টায়। অমলকান্তির পেটে এক পেগ কুইক এবং আরো অর্ধেক। পতির পুণ্যে পর্ণাসতীও খানিক। চাঁপার ফটিককাকু কবি পরমেশ মজুমদার তখনও ভদ্রস্থ। চাঁপা ঘুমিয়েছে। ভদ্রস্থ হলে কি হবে প্রথম পেগটা সে কারখানা শ্রমিকের মতো চোঁচা নেয়। যাকে সে বলে 'কুইক সিঙ্গল'। টম্বোলার ভাষা। তাই তার পিকআপও খুব দুরন্ত।

--এত ডিফেন্সিভ খেলার কি অর্থ অমলদা। তুমি তো একটি ফ্লপ মানুষ আগাপাস্তালা। তোমার নামে যা রটে তাই তোমার হিট সংযোজন। একটু রটলই বা। পুরুষমানুষ, মদ খাবে ফষ্টি নষ্টি করবে, রাতের বেলা নষ্ট হওয়ার ভান করবে। রাতটাই তো থাকে অমলদা। অতন্দ্রিলা, হঠাৎ কখন শুভ্র বিছানায় পড়ে জ্যোৎস্না, দেখি তুমি নাই। অমিয় চক্রবর্তী, না?

--ঠিক বলেছিস ছোকরা। এই কিছুক্ষণ আগেই, তোর ফ্লপ মানুষের জীবনে হিট ছবির একাংশ টেক হয়ে গেল। পাশের বাড়ির বালিকা, --আচ্ছা তোমার বউদি কেন তোমাকে আমার বন্ধু বলে? বন্ধু তো সমবয়সী, ইজেরের বন্ধু, তুমি কি বুড়ো? ভাম অফ ফর্টিসিক্স? একটি বালিকা বুঝলে--আহারে--

তুই, তুমিতে মাতলামি করে ইচ্ছে করেই। ধরা পড়ে যাওয়া মাতালের ভঙ্গিতে পর্ণার দিকে তাকিয়ে বলে অমলকান্তি--না, না, না, তুমি ভুল বুঝবে না। আমার কেস নয়। পরমের জন্য, কুমারী কন্যাটি ওকেই দিয়ে দিলাম। কি দারুণ ম্যাটার মাইরি। স্মল পাইকার চৌদ্দ লাইনে আঁটোসাঁটো তেড়ে ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা, আহারে আমি নাকি তোর দুঃখ বুঝি না!

টেবিলের কোণে রাখা খালি সোডার বোতল কার্পেটে পড়ে। ভাঙে না, শব্দ হয়। পর্ণার আঙুল লেগেই পড়ে। অমলকান্তির মদ খেয়েও মাতাল হওয়া সহজ নয়। পর্ণার চোখে চোখ পড়লেই সব ফর্সা। শূন্য বোতলপতনের ইঙ্গিত তাকে মেনে নিতে হয়। কোন কথা নয় আর, মনের সব ভার ঠোঁটদুটোতে জমিয়ে কিছু রাত অব্দি মদ গিলে যেতে হবে।

চন্দ্রা এসেছিল এই কথাটাই পর্ণাকে জানাতে চেয়েছিল। একটু মজা করে বলতে গিয়েই। এতদিন পর পরমেশ এসেছে, পর্ণা তো জানেই পরম এলে সে কত খুশি হয়। এত অসংগতি পরমেশের, তবু তাকে পছন্দ করে অমলকান্তি, পর্ণা, চাঁপাও। চাঁপাকে ফটিকজল পাখির নামের মানে বুঝিয়েছিল পরমেশ। ফটিক মানে স্বচ্ছ, নির্মল। পর্ণা বলেছিল, --তোর পরমেশ কাকুর মতো। ব্যাস্, ফটিক হয়ে গেল ওর নাম। বিবাহবিচ্ছিন্ন পরমেশকে তারা মেনে নিতে পারেনি।

পরমেশ-সীমা স্বামীস্ত্রী নয় এ কল্পনা করতে তাদের কষ্ট হয়। এখনও তাদের মরুভূমির সংসার স্বপ্নের গেরস্থালি হয়ে আছে। মরুশহর জামনগরের সুখী পরমেশ সীমার সুখের গার্হস্থ্য মরুঝড়ে কেন যে ওলটপালট হয়ে গেল। এখন তো এই শহরেই আছে দুজনে, আলাদাভাবে জীবনযাপন করছে। অনেকদিন ভেবেছে অমলকান্তি ঢুকেই যাবে সীমার অফিসে, ডালহৌসির লালবাড়িটায়। পারল কই? পরমেশ যে দৃঢ়ভাবে বলে দিয়েছে, আর ফেরা নয়। সীমা আর তার জীবনের সঞ্জয় নয়, অমলকান্তি পরমেশকে সুখী করতে চায়। উদ্দাম জীবনের আপাত সুখে নিমজ্জিত আছে সে। এই কাব্যগ্রন্থটিও দিয়েছে তার নবতমা সঙ্গিনী দিয়াকে।

কার্পেট থেকে পড়ে যাওয়া সোডার বোতলটা তুলতে তুলতে দুঃখী মানুষের মতো নিরুত্তেজ স্বাভাবিকভাবে পর্ণাকে দেখে অমলকান্তি। জবাবদিহি করে বলে—চন্দ্রা এসেছিল বিকেলে, তোমাকে কিছু বলতে এসেছিল। তোমার মেয়ে তো রেগেমেগে ওকে বলে দিল দুন্দুবুড়ি।

—অমলদা, আমি যদি কবিতা লিখতে পারি, তো পরের বইটা তোমাদের মেয়েকে দেব। এরকম আর চলছে না বৌদি। আমি খুব বেশি দিন কবিতাও লিখতে পারব না। নারী আর প্রকৃতি ছাড়া কবিতা হয় না আমার। এ কেমন কবি? নারীরা তো ফুরিয়েই যাচ্ছে, শৈশবস্মৃতি যত অস্পষ্ট হচ্ছে, প্রকৃতিও দূরে সরে যাচ্ছে। আমিই পিছোচ্চি। কতবার ভেবেছি তোমাদের আনব কবিতায়। হৃদয়াবেগ আর কাতরতা দিয়ে কবিতা হয় না। তবে এও তো সত্যি, তোমাদের আমি খুব বুঝি। তোমরা খুব ভাল গো, সুখী দম্পতি।

শেষ কথাটা ও অর্ধেক গ্লাস পানীয় এক ঢোঁকে গিলে ফেলে পরমেশ।

—সুখী দম্পতি! ইয়েস, আমরা তো সুখীই, তোমার ব্যাগপাইপারের লেবেল না লাগালেও আমরা তাই। কি বলো গো? পর্ণার মুখমন্ডলে ভাব অভাব কিছুই নেই, হাতে ধরা গ্লাসটা শুধু অসহায় লট্‌কে থাকে। উৎরাই পেরিয়ে অমলকান্তির নেশা আবার চড়াইয়ে। পরমেশকে বলে—একটা চিনা প্রবাদের গল্প বলছি তোমাকে। পর্ণার গ্লাসটা টেবিলে বসে ঠক করে। অমলকান্তি পর্ণার চোখে চোখ রাখে। —না চলবে না, তোমাকে বলা চলবে না গাছের কোটরে বলতে হবে। মাতাল কবিকে প্রবাদের ইশারা করতে নেই।

রবিবারেও চন্দ্রা এলো। অমলকান্তিকে অবাক করে মোহময়ী সেজে এলো। কমলা ও সবুজ পাড় তাঁতের শাড়িতে কাঁধ ফোলানো জামা ও প্রসাধনহীন মুখশ্রীর এক অসাধারণ সন্নিবেশ। পরমেশের কাছ থেকে অনেকক্ষণ অগ্নিবলাকা আগলে রাখার চেষ্টা করেছে অমলকান্তি।

চাঁপাই খাঁচার পাখি বনের পাখির সান্নিধ্য তৈরি করে দেয়। বিকেল গড়ানোর আগেই তো পমমেশ বাদাম তুলে দিয়েছে। যাই যাই করেও অনুরোধের আসর শেষ হচ্ছে না চাঁপার। গান আর কবিতা, একটার পর একটা। চন্দ্রা আসায় ক্ষণিক বিরতি। পর্ণা অমলকান্তি, চন্দ্রার সৌজন্যে অন্যপক্ষে চাঁপা পরমেশের।

—ও ফটিককাকু, বনের পাখি ছিল বনেতে, গাও না। বিপক্ষে ভিড়বার ঔৎসুক্যে পরমেশকে বলে বলে যখন কাজ হলো না, চাঁপা তার মনোযোগের কেন্দ্রেই আঘাত করে। পরমেশও ফাৎনায় টান পড়ার অপেক্ষায়। চন্দ্রার কাছেই বিহিত চাইল চাঁপা। —ও চন্দ্রাদিদি, ফটিককাকু গাইছে না,

গাইতে বলো না। অপ্রস্তুত চন্দ্রা, অচেনা পরমেশের দিকে তাকায়, পর্ণা অমলকান্তিকেও দেখে। এগারো নম্বরে ব্যাট করতে আসা ব্যাটসম্যান অসহায়ভাবে মাঠের চারদিকে দেখে নেয়। খেলতে তো হবেই, চাঁপাকে শরীরে টানে, পরমেশকে বলে--চাঁপা যখন চাইছে, আপনাকে গাইতেই হবে ফটিকবাবু। চন্দ্রা ছাড়া সবাই একযোগে হাসিতে ফেটে পড়ে। স্টাম্প উড়ে গেল নাকি, অমলকান্তিকে আম্পায়ার মানে চন্দ্রা।

--আর ইউ শিওর, ওর নাম ফটিক ?

--তাই তো বলল চাঁপা।

--স্যরি, তোমার সাথে পরিচয়ই করিয়ে দেওয়া হয়নি। ও পরমেশ, পরমেশ মজুমদার। লেখক সমরেশ মজুমদারের ভাই। চাঁপা ফটিকজল পাখি থেকে ওকে ফটিক বলে ডাকে।

--ফটিক মানে তো স্বচ্ছ, নির্মল। বৌদি বলেছিল আমার মতো। হয়ে গেলাম ফটিককাকু। ফটিক ডাকতে পারেন। আপনি যেমন দুন্দুবুড়ি। নমস্কার। পরমেশের কথায় আর একদফা সম্মিলিত হাসি।

--দাদার মতো বড় লেখক না হলেও কবিখ্যাতি আছে। নাটকে অভিনয় করে ভাল। আংটি পরে লেনিন করে। দাদার বন্ধুর টিভি সিরিয়ালেও কাজ করছে। এত যে দুরন্ত ছেলে পরমেশ, সেও অমলকান্তির চতুরালিতে অবাক হয়। প্রতিবাদ করার সুযোগই পায় না। বোকা সোকা জোড়হাতে বসে থাকতে দেখে আবার তৎপর হয় অমলকান্তি। --ফাজলামি হচ্ছে, না। ওর একটা ভাল নাম আছে, তুমি শুনেছ। ওরা দত্ত। চাঁপা ডাকে দিদি, চন্দ্রার বৌদি পর্ণা। বাকিটুকু জানে পর্ণা, ওভার টু পর্ণা, তুমিই বলো--

দুই বুদ্ধিমান পুরুষকে সামাল দিতে পর্ণাও চাতুরির আশ্রয় নেয়, কুশলী ধারাবাষ্যকারের ভঙ্গিতে শুরু করে--ধন্যবাদ অমলকান্তি, বিখ্যাত নট, যাত্রা জগতের দিকপাল ভৈরব দত্তর একমাত্র কন্যা চন্দ্রাবলী। বাংলায় এম.এ। চন্দ্রার অর্ধোচ্চারিত 'বৌদি' পর্ণাকে সংযত করে। --কয়েক মাস পরে ফাইনাল। গান গায় ভাল, নাটকে ইন্টারেস্ট, যাত্রা দেখে না। খান্না মোটর ট্রেনিং স্কুলে যায়, মারুতি শেখে। সুনীল দাস ফটোগ্রাফার বাড়িতে এসে ছবি উঠিয়ে গেছেন, এক এক খানা ছবির দাম তিনশো টাকা। রূপালি মানুষের দেশে চলেও গেছে কখানা।

--বাঃ বইয়ের গোয়েন্দারা জসিডি বেড়াতে গেলেও একটা খুনখারাপি পেয়ে যায়। আমার ভাগ্যে তো জোরবরাত, জোড়া টিকিটের বরাত। দালালি আমার পেশা। মনে রাখবেন দয়া করে।

সঠিক সংগতে অমলকান্তি মীড় ও তারানায় নিখুঁত হয়। দালালিকে বিশদ করে-- রয়্যাল জর্ডনিয়ান এয়ারলাইন্সে কাজ করে পরমেশ। শুধু যাইতে চাওয়াই তোমাদের কাজ, নিমেষেই শুভ্রিদেশের রাজপ্রাসাদ।

--পাকা কথা যখন হয়েই গেল তখন আপনার অনুরোধটাই কেন বাকি থাকে। কি গো চাঁপার কলি ?

পর্ণা পরমেশের কৌতূহলে শান্তিবারি ছিটোতে চাইলেও দমল না দুরন্ত গায়ক। উৎসাহের আতিশয্যে শান্তিদেবকেও টপকে যেতে চাইল গানে। প্রহরশেষের আলোয় চন্দ্রাও গাইল অতুলপ্রসাদের গান। চাঁপা একবারও চন্দ্রাকে দুন্দুবুড়ি বলল না।

সোমবার বুধবার দেরি করে ফিরবে ভেবে বেরোয় অমলকান্তি। ফেরার সময় মনে থাকে না। ঐ দিন দুটোতেই ক্ষিপ্র হয় ফেরা। বুধবার লেকটাউনে মেয়ের নাচের স্কুল। সত্যভামা বসুর কাছে নাচ শেখে চাঁপা। একশো বর্গ- ফুটের ঘরে পাঁচ থেকে আট বৎসরের ছানাপোনাদের নিয়ে একঘন্টার ধেইধেই। আজ মিসের বাড়ি দুঘন্টা, পাঁচটা থেকে সাতটা, থাউজেন্ড শব্দের ইয়েলো বুক ব্লু বুকে ইংরেজি শিখতে যায়। পর্ণা এখন বাড়িতে একটা বাচ্চা পড়ানোর স্কুল খোলার কথা ভাবছে। খুব সহজ, তিনমাসের চুক্তিতে একহাজার টাকা পার হেড। এক সেসনে দশজন কেন আরো বেশি নেবে সে। তার ড্রইং ডাইনিং তো আরো বড়। অমলকান্তি বলেছে-বেশ তো, শিশুসমিতি নাম দিও। মহিলা সমিতি নিয়ে ঠারাঠুরিতে দমেনি পর্ণা। আপাতত ফাইল চাপা আছে। চাঁপাকে মনমতো স্কুলে ভর্তি করিয়ে তারপর তো! দুবৎসর কমিয়ে বার্থ সার্টিফিকেট বের করেছে অতি কষ্টে। পর্ণার কাঠ এবং খড় পুড়িয়ে রমলা বৌদি করে দিয়েছেন। হাতে পায়নি এখনও।

ডুপ্লিকেট চাবি থাকে রমলা বৌদির বাড়ি। তিনি থাকলে মন্দ না। পাড়ার গসিপ এত আন্তরিকতায় শোনাতে পারেন। অনিচ্ছুক শ্রোতাকেও আবিষ্ট করে রাখেন মহিলা। সুভাষদা থাকলে মুখগোমড়া কিছুক্ষণের সামাজিক উপদেশ শুনে আসতে হবে। ছোট মেয়ে রেবতী একা বাড়িতে। মাম্মি পাপ্পা সিনেমায়, বড়বোন অশ্বিনী ইউনির্ভাসিটি থেকে ফেরেনি। আলিপুর ক্যাম্পাসে ফিজিওলজি নিয়ে এম এ পড়েছে। আসুন কাকুর জবাবে ঘরের ভিতর তাকায় অমলকান্তি। রবি বিল্ডার্সের ছেলেটি বসে আছে ঘরে। বড় প্রয়োজনীয় ছেলে এই রবি। অমলকান্তিকে খুব মান্য করে। ওরা যখন প্রথম এলো, এই ছেলেটাই অভয় দিয়েছিল--এ পাড়ার কোন অশান্তি হুজ্জোতি নেই কাকু। কিছু ইট বালি কেনা ছাড়া রবিকে অন্য কোন সাহায্য করেনি অমলকান্তি। 'কেমন আছো রবি' বলতেই হলো। ওরা কিছু একটা খাচ্ছে।

রেবতীর কাছ থেকে চাবি নিয়ে ফিরতেই জোর খিদে পেল অমলকান্তির। খাবারদাবার কিছু নেই বাইরে। যা আছে সব ফ্রিজে। মাঘমাসেও কেন ফ্রিজ চালু রাখে! কশের দাঁতটায় কন্‌কনে ব্যথা উঠল একবার। ড্রাইভারকে ছেড়ে দিল, এককাপ চা আনানো যেতো। এদিক ওদিক ঘুরে দক্ষিণের জানালা খুলল। শীতের সন্ধ্যা, সব বন্ধ। মনটা ভাল, না মন্দ কিছুই ভাবতে পারছে না। এন, রাজমের ক্যাসেটটা বাজাবে বলেও রেখে দিল অমলকান্তি।

প্রয়োজনীয় স্বাদু গন্ধ নিয়েই ফেরে পর্ণা। অমলকান্তিকে এড়িয়ে বেডরুমে চলে যায়। মেয়েকেও টেনে নেয়। পিকচার রিডিং বুক ধরিয়ে আসে। হাউস কোটের উপর সুতির চাদর চাপিয়ে অমলকান্তির সামনে সোফায় বসে। পরটা পিস করে কেটে, সস লাগিয়ে দেয়। মেয়েকে দোকানের খাবার দেবে না। ডান হাতে খাবার তোলে অমলকান্তি।

--মেয়েকে কান মললে কেন?

--আমাদের কথা শুনতে এঘরে আসত বলে।

--মনটাকে বিগড়ে দিও না কাইন্ডলি। একটা অকারণ তুরীয় অবস্থায় আছি আজ। না ভালো, না মন্দ লাগার বুক টিপটিপানো কন্ডিশান।

--বুক টিপটিপানো, না দুন্দুবুড়ির নাচ? মেয়েটা যে তোমার চাঁপাও হতে পারত। নেহাত দেরি করে বউ জুটলো।

--প্লিজ পর্ণা, তুমি মজাও বোঝ না। এতদিন তো দেখছ, তোমার সমিতির কত মেয়ে মহিলা এসেছে। মুখ তুলে দেখেছি কাউকে?

--দেখেছ, দেখেছ। তোমার বেলেল্লাপনা আমি ছাড়া কেউ ধরতে পারে না।

--ছি--

--এখন ছি, না? ঘন্টার পর ঘন্টা একটা বাচ্চা মেয়ের সাথে রসালাপ করতে রুচিতেও তো বাধবে তোমার!

--ঘন্টার পর ঘন্টা, কবে, কখন? ও, তোমার গেজেটের খবর । তিল থেকে তাল হয়েছে। তোমাদের খুঁজতে এসেছিল। তোমার ভয়ে তোমার মুখের ভয়ে, দরজার বাইরে থেকে চলে যেতে বলেছি। চাঁপাকে জিজ্ঞেস করো।

--চাঁপাকে এর মধ্যে জড়িও না। শুনে খুশিই হবে, জাল ফেলার আগেই মাছ তোমার কোলে লাফিয়ে উঠছে। কি কম্পলিমেন্ট! এই বয়সেও কি দারুণ পার্সোন্যালিটি দাদার ! পকেটে হাত ঢুকিয়ে হাঁটা চলা কি দারুণ! হাটে হাঁড়ি তো ভাঙিনি । ওরা নতুন এসেছে। এমনি জানবে।

--প্লিজ, প্লিজ পর্ণা।

--থামতে বলছো? শনিবার তুমি থেমেছিলে, পরমেশের কাছে যখন প্রবাদের গল্প বলছিলে? খাঁদা পাত্রীর পাকা দেখা, নাকের সামনে ফুল রেখে?

--তখন নেশা করেছিলাম । আই ওয়াজ ড্রাংক ।

- মিথ্যে কথা, তুমি নেশা করো না, ভান করো । ভেবেছিলে আমি বুঝি না। খাঁদা নাক, না বাঁধানো দাঁত। জেনেশুনেই তো বিয়ে করেছিলে। বিয়ের পর প্রাণের বন্ধুকে বলেছিলে তোমার অপূর্ণ সাধের কথা। চুম্বনের অসাধ! কী ভাষা ! আমি জানি আমি কী, যা নই তা জানাতে চাই না।

--আর নয়, প্লিজ

--থামবো কেন। অসাধ শুধু তোমার ? একটা মেয়ের জীবনে পুরুষের দুটো হাতের ও যে প্রয়োজন আছে , প্রেম করতেও যে একটা সমর্থ পুরুষের প্রয়োজন আছে, সে তুমি বোঝো? তুমি মানুষ?

অনলকান্তি ড্রইংরুম ছেড়ে চলে যায়। অবরুদ্ধ মানসিক অবস্থা সামাল দিতে তার কি করা উচিত ভেবে পায় না। যাই করুক --এই বদ্ধঘরের ভিতরই তার জীবন কাটাতে হবে। কাটানোর মতো জীবনই বটে! মেয়েটা পড়ছে। অনেক আগে ফোঁপানোর রেশ টেনে পড়ছে 'আই হ্যাভ টেন ফিঙ্গারস ইন মাই হ্যান্ড'। কচি চাঁপার কলির মতো আঙুলগুলোকে একটা একটা করে দেখে অমলকান্তি। এত নিখুঁত সুন্দর, মুখে চোখে চেপে ধরে তার অপত্যের বন্ধন।

মেয়ে আদরে বাপের শরীব জুড়ে থাকে। অমলকান্তি মেয়েকে জড়িয়ে রূপান্তরের সময় নেয় । পর্ণা এত অকথ্য কি করে বলে! টিপটিপ লাবণি দুটিপ পিঠে ঝরতেই মুখ তুলে তাকায় অমলকান্তি। করুণাময়ী বউয়ের মায়াবদ্ধ হাত তাকে স্পর্শ করে আছে । কেঁপে ওঠে অমল। অনতি অতীত বিস্মরণে প্রয়াসী হয়। পর্ণাও সমর্পণে সম্পূর্ণা।

--আমাকে ওসব বলতে দাও কেন?

--কিসব কথা?

এমন দুটো প্রশ্নের সংলাপ তো তৈরি হয়েই ছিল। যেমন থাকে। অমলকান্তিরও বোধে মনস্তাপ, অনেক চোরাগোপ্তা আঘাত সেও দিয়েছে পর্ণাকে। একবার নয় শোধ হলো। মেয়েরা অনেক কিছু পারে, অমলকান্তি পারে না। পর্ণা জানে, এ ঘর এ সংসার তার। যেমন ইচ্ছে মেজাজের অধীশ্বরীও সেই। অমলকান্তিকে কাঁদিয়ে, নিজে কেঁদে, চোখের জল মুছে স্বাভাবিকও হয়। দৌড়ে গিয়ে টিভি চালিয়ে মেয়েকে ডাকে। ঠান্ডা হয়ে যাওয়া খাবারের প্লেটটা নিয়ে এসে বলে 'এসো'। টিভির মুখ দেখে চাঁপা চিৎকার দিয়ে ওঠে --'মা দুন্দু মা গো চন্দ্রাদিদি!' টিভির পর্দায় চন্দ্রার মুখ। দুটো গানের একটা শনিবার এই ঘরেই গেয়েছিল--'মনোপথে এল বনহরিণী'। দারুণ সপ্রতিভ গেয়েছিল। ক্যামেরার সামনে গলা শুকিয়ে কাঠ। দ্বিতীয় গানটার আকৃতি কিন্তু বেশ কণ্ঠে নিয়ে এসেছিল 'আমি তোমার ধরব না হাত, নাথ, তুমি আমায় ধরো।' আলোর সামনে গাইতে হবে বলে এত প্রসাধন করতে হবে? আর সবুজ শাড়ি! চন্দ্রাকে আনইম্প্রেসিভ দেখল অমলকান্তি।

--সত্যি, কাকাতুয়ার রংটা যে কেন পছন্দ করল মেয়েটা। ওর একটা গর্ব আছে যে কোন রঙেই ওকে মানায় ভাল। প্রথম অনুষ্ঠানের উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে রয়েছে চোখেমুখে। আচ্ছা,এমন বেরসিক লোক কেন তুমি বলতো। টগবগে খুশি নিয়ে মেয়েটা এসেছিল। খবরটা দিতেই এসেছিল। একটু ডেকে বসতে পর্যন্ত বললে না। তবে তোমাকে বলত না। আমাকেই বলতে এসেছিল। ঐ মোটি এর মধ্যে মুড খারাপ করে দিল। বলল, তোমরা অনেকক্ষণ দরজায় দাঁড়িয়ে হাসিফুর্তি করেছ। কেন বলবে? তুমিও আজকাল খুব দুর্বোধ্য হয়ে গেছ, সত্যি মিথ্যের এত রগড় আছে তোমার!

--আছে একটু। একটু মজা বই তো নয়। পর্ণাকে রাতভোর বৃষ্টির পর খুশির দম ফেলার অবকাশ দেয় অমলকান্তি।

--একটু মজা, না? তুমি তোঁ করলে লম্বা চৌড়ি। হাতিবাগান গেছি। বললে দক্ষিণাপণ, কলামন্দিরে কোন বন্ধুর নাচ ছিল না, বললে। পরমেশটাও মাসতুতো ভাই। সমরেশ মজুমদারের ভাই বললে, মেনে নিল। আরো কত কি বললে, কেন বলো?

--ওই হলো আর কি। কতটুকুর আর জীবন বলো তো, হাসি খেলায় কাটিয়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। যা নয় তার একটু দর্শন-সম্ভব সাঁতার কাটতে তোমার এত আপত্তি কেন?

--আপত্তি কেন থাকবে। সাঁতার তুমি যত খুশি কাটো, আমাকে খড়-কুটো সমেত ডোবাও কেন।

--কোথায়? আমি তো এখনও ডুবে যাইনি?

--ইয়ার্কি রাখো। তোমরা এত ঘ্যাম লোক, ইন্টেলেকচুয়াল, বড় লেখকের ভাইয়ের বন্ধু। তোমরা তো অনেক কিছু পার। শ্রীমতী চন্দ্রাবলী দত্তকে একটা ভাল নাটক, গ্রুপ থিয়েটারের নাটক দেখাতে পারো না? যাও, এখন ব্যবস্থা একটা করো, দুটো টিকিট।

--দুটো? কে কে? তুমি আর চন্দ্রা? আমি নয় কেন?

--তবে তুমিই নিয়ে যাও, চাঁপাকে দেখবে কে, ওকে তো আর ঢুকতে দেবে না।

--দেবে, দেবে। যারা লেখে 'আট বৎসরের অনূর্ধ্ব শিশুর প্রবেশ নিষেধ' তাদের টা দেখব না। কেউ কেউ লেখে 'শিশুদের সঙ্গে আনিবেন'।

পরমেশের টেলিফোন পেয়ে পর্ণাকে জানিয়েছে অমলকান্তি। পর্ণা মেয়েকে নিয়ে হোটেলে ড্রিংকস করবে না। পরমেশের মূল প্রস্তাবটা ছিল খুব সাদাসিধে। অমলদা, বৌদি, চাঁপার কলি ওর খুব প্রিয়জন, সবাইকে নিয়ে একটা বড় হোটেলে আড্ডা দেওয়া, খাওয়া, কিঞ্চিৎ মদ্যপান। যেহেতু চন্দ্রার সঙ্গেও সেদিন পরিচয় হলো, নিয়ে এলে সুখী হবে। পর্ণা শেষ প্রস্তাবটা পত্রপাঠ নাকচ করে দেয়। অমলকান্তির পারমিশানটা হয়ে যায়।

মদ খাওয়ার একটা কারণ খুঁজছিল অমলকান্তি। সন্ধ্যা ছটায় অসম দুই বন্ধু গিয়ে বসে অম্বরে। পরমেশ যা যা প্রশ্ন করবে তার একটা হোমওয়ার্কও করে গিয়েছে অমলকান্তি। পরমেশের চোখে সে নতুন সর্বনাশ দেখেছে সেদিন। তাই জানত, সব প্রশ্ন তার নবীনানন্দ মহারাজকে ঘিরেই হবে। চন্দ্রাবলী কি সত্যিই ভৈরব দত্তর একমাত্র কন্যা? ভদ্রলোকের তো দুই বিয়ে? বাপের সঙ্গে থাকে না কেন? ওদের অগাধ সম্পত্তি? অমলকান্তির সতর্কতায় কোন জবাবই পরমেশকে চরিতার্থ করতে পারে না। আর, সত্যও তাই, অমলকান্তি তো শুধু চন্দ্রাকে দেখে, দেখা হলে প্রাণ ভরে কথা বলার ইচ্ছে হয়, এইটুকুই তাদের সম্পর্ক। বাকিটা, চন্দ্রার সামাজিক অবস্থান নিয়ে তার কোন ভাবনাই নেই। --বুঝলে হে, আমার সব জানা পর্ণা মারফত। চন্দ্রা সমিতি করে না। চাঁপা ওকে গান গেয়ে ডাকে, বুলবুল পাখি ময়না টিয়ে, আয় না যা না গান শুনিয়ে। চন্দ্রা আসে, গান গায়, চাঁপা নাচে চন্দ্রাও নাচে। শুনেছি, জাপান না জার্মানি থেকে পাত্র আসবে দেখতে। লাইনে দাঁড়াবে নাকি? সুন্দরী বৌদির ডাক পড়ে সব কাজেই। চান্স একটা করে দিতে পারবে। অবশ্য, আমিও পারি, সতীর পুণ্যে দাদাও খুব পপুলার। পকেটে হাত দাদাকে দেখতে খুব ম্যানলি!

অ্যামেরিকান চপস্যুয়ে অম্বরে তার খুব প্রিয় ফুড। নুডলসগুলি মিইয়ে গেলেই ফক্কা। আজ শুধু ড্রিংকসই করে যাচ্ছে অমলকান্তি। অন্যদিন, পরমেশের সঙ্গে আড্ডায় সীমার উল্লেখ ঘুরেফিরেই আসত। মরুভূমির সংসারে তাদের সুখদুঃখের স্মৃতি উস্কে দিত অমলকান্তি। নারী, প্রকৃতি নিয়ে রোমান্টিক মানুষমন খুঁজে বের করতো পরমেশের মধ্যে। আজ অমলকান্তি তার ক্ষত ঢাকতে ঢকঢক করে গিলেই চলেছে। এক তীব্র আকর্ষণে ডান হাতে ধরা শূন্য গ্লাসে তাকিয়ে 'ম্যানলি' কথাটা দাঁতে দাঁত চেপে দুবার উচ্চারণ করে। রুমালে ঢাকা বাঁ হাতটা টেবিলে চাপড়ায়। পরমেশকে তার দৃষ্টিতে আনে। --পকেটে হাত নিয়ে এরকম আপাত সরল কৌতূহল তোমার বৌদি রেলিশ করে। কেন করে কে জানে। তুমি তো জান পরমেশ, গাড়ি এফোর্ড করার মতো চাকরি আমি করি না তাও গাড়িটা রেখেছি, খরচও যোগাই। সৎপথে সম্ভব নয়, সবাইকে বলি ইনকাম ট্যাক্সে স্পেশাল রিবেট পাই। সে আর কত? বাসে ট্রামে চড়ে ঐ সিটটায় বসতে চাই না। তাই, বাসট্রামে এত ঘেন্না আমার। আই হেট ইট। সবার এত কৌতূহল কেন! চন্দ্রা মেয়েটা ওরকম না। ওর কথা আমি বলতে চাইনি। বড় ভাল মেয়ে। সত্যি সরল, নাটুকে নয় একেবারে। বিভাস চক্রবর্তীর নাটক দেখবে? একটা টিকিট আছে। আজ বুধবার, কাল পরশু শুক্রবার একাডেমিতে। সাড়ে ছটায়। টিকিটটা তোমায় দেব। আমারটা।

বেহেড না হলে বেহিসেবী কথা বলে না অমলকান্তি। পর্ণা ওকে চেনে, বলে ও নেশা করে

না, ভান করে । সতর্ক থেকেও পরমেশে চন্দ্রাকে ভিড়িয়ে দেওয়ার ইচ্ছা হঠাৎ কেন যে হয়েছিল। পরমেশকে ভালবেসে নয় একেবারে। পর্ণারি উপর, চন্দ্রার উপর রাগ করে কি? কেমন সে রাগ, কেন রাগ? একটি মেয়েকে মেয়ে বলে পছন্দ হওয়ায় এত বাছবিচার থাকবে কেন? সে বিবাহিত, মনে মনে কম মেয়েকে সে কামনা করেনি। কামনার মেয়েদের কি কোন বয়স থাকে? পর্ণারি কাছে সে বয়েসী বুড়ো, বলে ভীমরতি! মেয়ের বয়সী মেয়েকেও তো মানুষ বিয়ে করে, অল্পবয়সী মেয়েকে পছন্দের দুটো কথা বলাতেই সব মানা। সেও তো মানতে পারছে না, এ কেমন পছন্দ তার, এ কেমন ভাললাগা, এর পরিণতি কী? পরিণতিহীন কোন কারণে কেন সে জড়াবে? জটিলতা মানেই অনুদ্ধারণীয় অবস্থা। কলেজের বান্ধবীর সঙ্গে যেমন কথা বলেছে কফির কাপে, ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে কফিহাউসের বিল মিটিয়েছে, তেমন কি পারছে চন্দ্রার সঙ্গে? বয়স পেরিয়ে আসার কথাটা কি ওর ভিতর থেকে উঠে এসেছে? না কেউ ধমকে দিল? পরমেশের বয়স আছে, লুটেপুটে খা না গিয়ে। এই হয়তো ভেবেছিল বেহেড অমলকান্তি। এখন সে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়বে কেন? পর্ণা ঠিকই বলেছে, একটা নুলো লোক এক ভরজোয়ারী নারীশরীরকে কতটুকু দিতে পারে? তাই সে শুধু সাহস, সাধ আর সৌন্দর্যের ভান করে মোহবিস্তার করে। যার যেমন অস্ত্র। পরমেশ টেলিফোন করেছিল, থিয়েটারের টিকিটের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল। পরমেশকে না করে দিয়েছে।

সাড়ে পাঁচটার মধ্যেই একাডেমিতে পৌঁছে যায় অমলকান্তি। একাডেমি চত্বরে এটাই রূপান্তরের সময় । কাঁধে ঝোলা, ঝোলায় বাঁ হাতে ধরা আর্ট পেপারের চোঙ নিয়ে চিত্রাঙ্কণের ছাত্রছাত্রীদের হৈ হৈ জটলা এবং দল বেঁধে বাসে ওঠা। তারপর থেকেই জিনস, জ্যাকেট, কোট, স্টোল, কার্ডিগানে লাল নীল হল্‌দে সব্‌জে সাজের নারী পুরুষ জমতে থাকবে। একা অমলকান্তি মুভি ক্যামেরায় চোখ রেখে একজন লোককেই দেখে । কাঁচা পাকা দাড়ি, জীনস প্যান্টের উপর খদ্দরের পাঞ্জাবি, জহর কোট, কাঁধে ঝোলা, ভদ্রলোক একটার পর একটা নাটকের বোর্ড দেখছেন অভিনিবেশে । চশমা একটু সরিয়ে আবার নাকে রাখা কুঞ্চিত দৃষ্টিতে নাট্যদল ও নাটকের নাম লেখা কাউন্টার। ফোকরে বাড়ানো চোখ থেকে চশমা আসে হাতে-নিচের তলার শেষলাইনে পাঁচ টাকার টিকিট দিন তো দুটো। কাট করে ক্যামেরা ঘুরে যায় অমলকান্তির, অফিস ফেরতা একজন হাঁপিয়ে বাস থেকে নেমে অপেক্ষারত স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়। ভাঁড়ের চা ও নানখাটাইয়ে গলা ভেজাতেই খুশির আলোকে দীপ্ত হয় স্বামীর মুখ-দ্যাখো, লেডি রাণু নামছেন গাড়ি থেকে, নার্স ধরে নামাচ্ছে, উত্তেজিত স্বামী ভাঁড় হাতে স্ত্রীর কাছাকাছি হতে, অমলকান্তির গা ছুঁয়ে চা ছলকাল। গায়ে যখন পড়েনি, সে বিরক্ত হয় না। কৌতুক বোধ করে । চায়ে চুমুক দিয়ে, থেমে যাওয়া মিনিবাস থেকে চন্দ্রাকে নামতে দেখে। বাসের জানালা থেকে এক যুবকের হাত বিদায়ও জানালো। প্যাকআপ করে অমলকান্তি গাছের আড়ালে সরে যায়। খুশির ঠমক সামলানোর আড়াল। কম তো নয় মেয়ে, ডুবে ডুবে অনেকদূর! অমলকান্তি ভেবেছিল অন্য, ভাবতে পারেনি তার সহজ সুন্দরীতেও নো ভেকেন্সি থাকতে পারে। এদিক ওদিক দেখে চন্দ্রাই ওকে খুঁজে বের করে। গেটের ভিতর পদ্মপুকুরের পাড়ে এসে বসে অমলকান্তি। চন্দ্রার জন্যও জায়গা করে দেয়। কি কথা বলা যায়। ছেলেটির কথা জিজ্ঞেস করবে? শালুক পাতার নিচে ছোট ছোট মাছগুলিকে দেখে, চন্দ্রাকে দেখায়।

--দ্যাখো, এইটুকুনি জলেও কেমন মাছ আছে ছোট ছোট।

--আপনি তো দেখেননি, নন্দনের পিছনের পুকুরটা। বস্তির বাচ্চারা সুতোর বঁড়শি গেঁথে জলে ছুঁড়ে দেয়, টপাটপ তেলাপিয়ার বাচ্চা ওঠায়।

--যাঃ মাছ কি এত বোকা? খাবার কিছু দেয় নিশ্চয়।

--তাই তো। মজার অবাক হওয়া চন্দ্রার চোখে, সারা শরীরে। অমলকান্তি ভাবে, এই সময়ে নন্দনের পিছনে কেন যায় চন্দ্রা? কে নিয়ে যায়? মিনিবাসের ছেলেটাই বিনা চারে মাছ ধরা দেখায়? অমলকান্তি আজ চন্দ্রার শরীর দেখে না রেশমের মতো ফোলানো কোমল চুলে ঘেরা মুখখানিকে দেখে বারবার। সরাসরি তো দেখে না, চুরি করে দেখা। আজকাল মেয়েরা কি চোখে কাজল পরে, চন্দ্রার চোখে কিন্তু ঘন কাজলের রেখা। ঠোঁটের কোণে উদাসী মিষ্টি হাসির সঙ্গে মঅভরঙে রঙিন অধর ওষ্ঠের দুর্বোধ্যতা যেকোন সর্বনাশকে সঙ্গী করতে পারে। অনবরত লড়াই শেষে অমলকান্তি মনকে তার স্বাভাবিক ক্রিয়ায় ফিরিয়ে আনে। দুর্লভ সঙ্গ হেলায় হারানো যায় না। চন্দ্রারই ঠোঁটের কোণ নড়ে ওঠে-চলুন না, ওদিকে যাই, অনেক সময় তো আছে। বৌদিরা এসে না পেয়ে অবাক হবে। ধন্দের ভিতর হারায় অমলকান্তি। কোথায় নিয়ে যেতে চাইছে তাকে? সাময়িক যুদ্ধবিরতিতে আছে তারা। চন্দ্রা কি জেনেশুনেই ওকে সর্বনাশের পথে নিয়ে যেতে চাইছে। অমলকান্তিকে অবাক করে চন্দ্রা সরাসরি তার চোখে তাকায়। মধ্যবয়সী এক পুরুষকে বিবশ করে মোহিনী বিভ্রম বিস্তার করে বাইশ বৎসরের যুবতি। চন্দ্রার পাশে পথ হাঁটে অমলকান্তি। হাত ধরে নেই তবু হাত ধরে হাঁটছে, শরীর ছুঁয়ে নেই তবু অঙ্গের সুবাস,পরশে ঘাসফুল দাঁতে কাটছে অমলকান্তি।

--বৌদিদের সাথে কেন আসিনি বলুন তো? সুখী নির্ভরতার ওম তুলে অমলকান্তির শরীর না ছুঁয়ে চাপ দেয় চন্দ্রা।

--আমি কি করে জানব?

--বাঃ আপনি না তো কে জানবে? অসমসাহসী অমলকান্তি ভুলে যায় তার যে কোন দুঃসাহসের মূল্য হতে পারে অপরিসীম। তার উৎসুক মুগ্ধতায় তখন পূরবী রাগের নীরব বন্দিশ। আজ যে তার জয়ের দিন। বীরাঙ্গনা চন্দ্রা তার নিশ্চিত জয়কে আটকে রাখে।

--দরজা থেকে চলে যেতে দিলেন কেন আমাকে? অভদ্রতা নিশ্চয় নয়, ভয় পেয়েছিলেন আপনি। কাকে? আমাকে, বৌদিকে না রমলা চৌধুরীর গেজেটকে?

--সবাইকে। তবে তোমাকে পছন্দ করি বলে, তোমার মতো ভাল মেয়ের ভাল চেয়েই-

--মিথ্যে। বাস থেকে নামতে নামতেই বুঝতে পেরেছি আপনি চন্দ্রাকেই ভয় করেন সবচেয়ে বেশি। সেদিন কিন্তু ভেবেছিলাম, চন্দ্রাকে অবজ্ঞা করলেন। কেন করলেন জানতেই আপনাদের সঙ্গে নাটকে আসা। বাস থেকে নামছি দেখলেন, লুকিয়ে পড়লেন কেন?

--তুমি কি নিশ্চিত, তোমার এনালাইসিস নির্ভুল। এই বয়সেই জীবনকে এত জটিলভাবে নিতে শেখালো কে? ওরে দুষ্টু মেয়ে, কোন অসমবয়সী পুরুষের মুগ্ধতা যদি পেয়েই থাকো, বুঝেই থাকো, লুকিয়ে রাখলে না কেন?

—আমিও আপনার সাথে কথা বলতে চাই। আপনার চোখ সবসময় আমার সঙ্গে কথা বলবে, কাছে এলে অপরিচিতের ব্যবহার করবে? কেন দাদা, আমি খুব ভাল মেয়ে নই, না?

—নওই তো, তোমার মতো দুষ্টু মেয়ে দুটো হয় না।

—দুষ্টু তো ভাল কথা। কমপ্লিমেন্ট।

—কমপ্লিমেন্টই এই বয়সের আসল পাওয়া। তবে দুষ্টুর সাথে মিষ্টি কথাটাও তোমার এনাদার কমপ্লিমেন্ট। মিষ্টি না হলে তো অন্য দুর্বুদ্ধিও হতো। এখন আর বিনা চারে মাছ দেখা হবে না। ফিরে চলো। নন্দনের সামনে থেকে চন্দ্রাকে নিয়ে ফেরে অমলকান্তি।

ছটার মাথায় পর্ণারা আসে। চাঁপা আসে এক মজার অভিযোগ নিয়ে। অমলকান্তির দিকে তর্জনি তুলে বলে —বাবা তোমার কিন্তু চুরিবিদ্যা আছে, দুন্দুবুড়ি কখনও বেরোয় না, নাচেও না। মিথ্যেবাদির চাঁপা নামই চুরিবিদ্যা। ধরা পড়ে যাওয়া আসামীর মতো শেষ প্রতিরোধ দেয় অমলকান্তি —তাই নাকি? তোমাকে কে বলল?- কে আবার, মা না না চন্দ্রাদিদি। —তোমার চন্দ্রাদিদিও একটি চুরিবিদ্যা, আসলে ওই তো দুন্দুবুড়ি, তোমার গান শুনে নাচে। বাপঝির চাপান উতোর পর্ণা চন্দ্রা দুজনেই এনজয় করে।

শনিবার ঘুরে এলো আবার। অমলকান্তি ফেরে তার সময়েই, তিনটেয়। জাপান না জার্মানি থেকে পাত্র এসেছে চন্দ্রাকে দেখতে। চন্দ্রার মা জরুরি ডাক পাঠিয়ে নিয়ে গেছেন পর্ণাকে। কনে সাজানো, ছেলে, ছেলের বাড়ির লোকজনের সঙ্গে কথা বলা আপ্যায়ন পর্ণার দায়িত্বে দিয়ে নিশ্চিন্ত চন্দ্রার মা। অমলকান্তি চাঁপাকে ধর্মমতি শুকপাখি ও কাজলরেখার গল্প শোনায়। —কাজলরেখা তার মৃত স্বামীর শরীর থেকে সব সূঁচ খুলিয়া ফেলিল। দাসীকে গাছের পাতার রস করিতে বলিয়া স্নানে গেল। অতিলোভে দাসী রাজপুত্রের চোখে রস ঢালিয়া জীয়াইয়া তুলিল। রাজপুত্র কাজলরেখাকে দেখিয়া বলিল,—এ কে? দাসী জবাব দিল—আমার দাসী, কঙ্কণদাসী, সোনার কাঁকন দিয়ে কিনেছি। তো হলো কি? সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়িল কাজলরেখার। নিজের পরিচয় দিলেই বিধবা হইবে। তাই কাজল দাসীর মতো থাকিয়া রাজপুত্রের সেবা করিতে লাগিল। বার বৎসর কাটিয়া গেল। একদিন এলো সেই শুকপাখি। কাজলরেখাকে ডাক দিল— ওঠ, ওঠ কাঞ্চনমালা দুধ দাও তোমার নারায়ণ কমলা। —না, না হবে না, হবে না। কাজল রেখাকে কাঞ্চনমালা করায় চাঁপার প্রতিরোধে অমলকান্তি হো হো করে হাসে শুধু। হাসির তোড়ে প্রথমবারের কলিংবেলের শব্দ ভেসে যায়। শুকপাখি কি বলল, বল না বাবা, মা। বলেই দৌড়ে গিয়ে দরজা খোলে। পর্ণাই, সঙ্গে চন্দ্রা। চন্দ্রা যখন আসে পোষাকের চমক থাকেই। আজকের সাজ আটপৌরে পাটভাঙা মুগা রঙের তাঁতের শাড়ির উপর কটকি সিল্কের চাদর। প্রসাধনহীন মুখে ধুয়ে আসা অঙ্গরাগের ছায়া স্পষ্ট। চন্দ্রার দিকে তাকিয়ে পর্ণাকে প্রশ্ন করে অমলকান্তি।

—কি হলো? ইন্টারভিউ শেষ, এত তাড়াতাড়ি?

—হলো,সবই হলো বলা যায়। ওর বাবা এখন সব সিদ্ধান্ত চন্দ্রার উপরই ছেড়ে দিয়েছেন। আর চন্দ্রা সবাইকে খেলিয়ে বেড়াচ্ছে। নিয়ে এলাম, দেখ মন বুঝতে পার কিনা।

—তুমি পারনি, সেখানে আমি কোথায়?

—পারবে বলেই তো এই শীতে পেপসি খাওয়াতে নিয়ে এলাম। ছেলেটি ভালই দেখলাম।

খুবই ভাল, তুমি একটু মন্ত্রণা দাও। নাটক দেখাতে গিয়ে যা করেছিলে ওরকম কোরো না আবার।

--কি করেছিলাম?

--মাছধরা নিয়ে নাকি আটকে দিয়েছিলে। বেচারি বন্ধুদের কাছ থেকে শোনা কথা বলে ফেলেছিল, এত ভাবেনি। বাব্‌বা মেয়েরা পারেও বটে, শুধু মাছধরার কথাই বলেছে। অন্যকিছুই না। পর্ণাও কেমন নিশ্চিন্ত!

--আমি এক্ষুণি আসছি। চাঁপার বার্থ সার্টিফিকেট নিয়ে আসার কথা রমলা বৌদির। পেপসির বোতল দুটো খুলে দিয়ে যায় পর্ণা। অগ্নয়ে স্বাহা বলে পর্ণার নির্বিকার চলে যাওয়া দেখে অবাক অমলকান্তি।

--চন্দ্রাকে দেখে কি সত্যি তার ভীমরতি হয়? বাইরের কেউ এলে তো সে সরাসরি বেরোয় না, একবার অন্তত আয়নার সামনে যাবে। ব্যতিক্রম হলো, স্মার্ট, ম্যানলি লাগছে কিনা একবার দেখে এলে হতো। পকেটের ভিতর হাতের পজিশনটা একটু নেড়েচেড়ে ঠিক করে নেয়।

--তো বল, কেমন দেখলে নাটক? বিভাস চক্রবর্তী কিন্তু আমাদের দেশের লোক। সিলেটি।

--সংলাপ অনেকটাই বুঝিনি। ওটাও কি সিলেটি? ময়মনসিংহ গীতিকা থেকে নেওয়া শুনেছি।

--আমার বন্ধুটিকে কেমন লাগল? দারুণ ছেলে কিন্তু। তোমাকে খুব পুল করছিল। শনিবার অনেকরাত অব্দি আড্ডা দিয়েছি আমরা। তাই তো রবিবার থেকে গেল। আমরা মদটদ খাই, জান তো? অমলকান্তি কিছুতেই সঠিক কথার শুরু করতে পারে না। জাপানের না জার্মানির ছেলেকে নিয়ে কথা বলার দায়িত্ব গেছে পর্ণা।

--সেদিন শুনলাম। আপনার বন্ধু নাকি ওসব কিনে এনেছিলেন। বৌদিও খান। সারারাত আপনাদের খানাপিনা হয়। হুক, পুল, কাট সবকরম মারেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে চন্দ্রা। তবে বেশিক্ষণ লুজ বল খেলতে দেবে না অমলকান্তি।

--ঐ যে দেখ, জানালার কাঁচ ভাঙা, ওটাও কিন্তু মাতাল হয়ে, শোননি?

--আপনাদের নিয়ে তো অনেক গল্প পাড়ায়। তবে, আমাকে ওসব বলে কিছু হবে না। আমি ওসব বুঝি না। আপনাদের পরিবারকে খুব পছন্দ করি, তাই আসি। আপনাকেও যে এত পছন্দ করি সে কথাটা মুখ ফুটে বলার বড় দরকার ছিল। তাই কাল আপনার অবাধ্য হয়েছি।

--চন্দ্রা, দেখেছ, কথার মধ্যে একটুখানি মিশেল দিলে কত সহজ উচ্চারণ হয়ে যায়। বারবার পছন্দের কথা বলছ, ভালবাসা বলতে পারলে না? তোমার রমলা বৌদি কি বলে বেড়াচ্ছে জান তো?

--শুনেছি, শুনেছি বলেই এসেছি। আমি ওসব কেয়ার করি না। যাত্রাওলার মেয়ে আমি। কেউই ভাল চোখে দেখে না। আমার দুজন মা জানেন তো? আমার মা গাঁয়ের মানুষ অভিনেত্রী মা-ই বাবার সঙ্গিনী। আপনাকে পছন্দ করি, আপনার কথা শুনতে ভালবাসি বলেই রাত দশটা পর্যন্ত কাটিয়ে যাই। আবার আপনাদের দেখলে লোভও হয় খুব।

--তোমাকে লোভে ফেলার কোন কাজ তো করিনি ভাই। সুতোয় বঁড়শি গেঁথে তুমিই তো টানছ।

--না, না ওকথা বলিনি। আপনাদের পরিবার, আপনাদের মতো সুখী স্বামীস্ত্রী দেখে লোভ হয়। বিয়েটা করে ফেলতে ইচ্ছে হয়। একটু বেঁটেই হবে, আপনার মতো এত দীর্ঘ নয় ছেলে।

করে ফেল, করে ফেল। দীর্ঘ না হলেও চলবে, শুভকাজ শীঘ্রই করে ফেলা উচিত। আর সুখ, সুখী হতে চাইলেই হয়ে যাবে! গাইতে হবে গান, সুখ নেইকো মনে, সুখ নেইকো মনে, নাকছাবিটা হারিয়ে গেছে হলুদ বনে বনে। অনেক কষ্টে রে মেয়ে, আমাদের এই রাই কুড়িয়ে সুখের সংসার হয়েছে।

বেশ তো ক্রিকেটের বই থেকে তুলে তুলে সবকরম বল করে যাচ্ছিল অমলকান্তি। ভাল বল করে যে ব্যাট হাতে ততই খারাপ সে। 'সুখে'র কথায় সে মদ না খেয়েও মাতাল হয়। বলে--ওরে ভাল মেয়ে, তোমাকে একটা প্রবাদের গল্প বলছি শোন। এক চিনা প্রবাদের গল্প।

স্বভাবের বিরুদ্ধে অনেকক্ষণ চুপচাপ ছিল চাঁপা। অমলকান্তি গল্পের কথা বলায় সে ফিরে যায় কাজলরেখার কথায়।

ধর্মমতি শুকপাখি কি বলল বাবা? কাঞ্চনমালার তো অন্য গল্প, সে তো থাকে সাত সমুদ্র তের নদীর পারে, সোনার দেশে।

--তাই তো, কাজলরেখার গল্প তো শেষ করিনি।

--দাদা, প্রবাদের গল্প?

একদিকে রাজকন্যা কাজলরেখা, আর একদিকে ঘোড়ায় চড়া খোঁড়া রাজপুত্র। অমলকান্তি সামনে তাকায়, লং অনে মেয়ের কচি মুখ, ফাইন লেগে চন্দ্রাবলীর মুখে জীবনের জটিলতা, সিলি পয়েন্টে পর্ণার নির্ভরতা। আধখাওয়া পেপসির বোতলটা পড়ে কার্পেটের উপর। বোতল ভাঙে না, অবশিষ্ট পানীয়ের কিছুটা ঢক্ঢকিয়ে পড়ে। পর্ণার প্রত্যয়ে ভর করে অমলকান্তির ডান হাত সেন্টার টেবিলে পৌঁছয় সঠিক টাইমিংস-এ। অর্জিত নতুন বিশ্বাসে অমলকান্তি চন্দ্রাকে বলে--আমার কথাটি ফুরোল।

প্রমা, ১৯৯৪

ত্র্যহস্পর্শ

ত্র্যহস্পর্শ দিন দেশ ছেড়ে বেরোনোর ফল তো পেলে ! মানবে না কিছুই । বাবার কথাও শুনলে না।

পুঙ্গির পুত মাটির একছোঁয়ায় ঢিল তুলল, টাচ্ মি প্লিজ নিখুঁত দ্বিতীয় স্পর্শে ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ। ত্র্যহস্পর্শ পেলে কোথায় প্রিয়তমে?

তিনদিনের মাথায় রাত সাড়ে এগারোটায় কমলকুমার বউএর সঙ্গে কথা বলে। অট্টালিকা উড়াইল শব্দে পটকা ফাটে সিঁড়ির নিচে। পটকার শব্দ নিউট্রালাইজ করে অনুরাধার গালে ডাইভ দেওয়া সশব্দ চুমু খায় কমলকুমার । অনুরাধা বিরক্ত হয়।

শুরু হলো ভানুসিংহের উৎপাত।

কমলকুমারেরও বিরক্তি অবিচল। বলে,

রিল্যাক্স মাই ডিয়ার, ঐ শূয়োরের বাচ্চাকে নিয়ে এত ভাবছ কেন? টেক ইট ইজি, নাও। পকেট থেকে একমুঠো টাকা বের করে অনুরাধার ব্লাউজে গুঁজে দেয়।

ছিঃ এসব কী হচ্চে, তিনদিনেও টেনশন কাটে নি। খাওয়া দাওয়া বন্ধ, বাড়ির লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ, এখন কথা বলছ তো ভালগার শব্দ শুধু, আর এসব কী?

টাকা ম্যাড়াম; টাকা। বাহাদুরকে পাঠিয়ে নতুন কাঁচ লাগিয়ে নিও-কালই। অ্যান্ড ফরগেট। বুকের খাঁজ থেকে বিভিন্ন মাপের কাঁচের টুকরো ক'খানা ঝন্ঝন্ নিঃশব্দে বের করে অনুরাধা। একশ পঞ্চাশ অনেকগুলোর মধ্যে দু'তিনটে কুড়ি দশেরও নোট। অনুরাধার চোখে প্রশ্ন।

--জিতেছি গো, জিতেছি। শালা শেঠ হারছে আর বৌকে পাঠাচ্ছে আলমারি খুলে টাকা আনতে। কি খলবলিয়ে যাচ্ছিল আসছিল। কত হবে? শুনলে? মাল খাইয়েছে ভাল, ম্যাক এর ভাই খ্যাঁক ডবল মল্টা শালার কত টাকা! আমার মতো বৃহন্নলার বাচ্চা তো নয়, বউটাও কেমন রঙিন, নামটাও গ্ল্যামারাস, রাধা শেঠ। আমার শালা ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট বউটা নামে ও ছোট । অনুরাধা,ধ্যাৎ ধ্যাৎ।

অনুরাধা প্রস্তুত ছিল। কমলকুমারকে সে চেনে, মাল খেয়ে এমন ঢ্যামনামো করার চান্স নেবে তার প্রিয়ভাষী সাদাসিধে পুরুষটি। স্বাভাবিক অবস্থায় যা পারে না, তাই করবে। অনুরাধা

জানে এখন যদি ওকে তাতিয়ে দেয়, তবে আবার যাবে সিংহভবনে, ভানুকে এবার হয়তো ঘর থেকেই টেনে বের করে আনবে। কুলোপানা চক্কর দেখিয়ে সিংহবাহিনীর উপরও ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। যা স্বাভাবিক কমলকুমার কল্পনায়ও আনতে পারে না, মাতাল কমলকুমারের আঁতে জানালা ভাঙা কাঁচের ঝনঝন ঝনাৎ আর প্রতিবেশীর বাঁজা বৌএর ছলছলাৎ রাজহাঁস তাঁবুর আঁচে দুর্দমনীয় হয়ে উঠতে পারে। অনুরাধা মদ্যপ স্বামীকে সামলে রাখে । আরো ঘন্টাখানেকের মস্তানি চলবে তার উপর। এর পরের পর্বে, অনুরাধাকে গালাগালি খিস্তির মুখখারাপি শরীর খারাপি শেষে নিস্তেজ ঘুমোবে। আর সারারাত বাজিপটকার শব্দে জেগে কাটাবে অনুরাধা।

ধুমসো লোকটার গালে চটাস থাপ্পড় একটা মেরে হাতটা তুলে দেখে অনুরাধা। লাল, অনেক রক্তের কাদায় ডুবে মশা একটা। ঘুমন্ত মানুষের গালে মারতে পেরে ফিক করে হাসল। হেসেই বলল—পুঙ্গির পুত। কোত্থেকে যে এসব গালাগাল সংগ্রহ করে। লোকটা আজ ডিউটি করল না, মশারি টাঙালো না। অনুরাধা ভেবেছিল, দেওয়ালির রাত, মশা থাকবে না। এই একটা কাজে তার সব আলস্য। ড্রিংকস করেও কমলকুমার ভোলে না তার বখড়ি বিলাস। অনুরাধা ধাক্কা দেয় কমলকুমারের বিশাল দেহে,-চল চল, হাতি মেরা সাথি। কোথায় কার হাতি, সে এখন গর্‌র গর্‌ ঘুমন্ত মহারাজ। অনুরাধা জানালার পাশে এসে শোয়। তিনদিন পর কমলকুমারের পাশে শুয়ে জানালার পর্দা খুলে দেয়। ভাঙা কাঁচের ফুটো দিয়ে একটা কৌণিক পারস্পেকটিভ তৈরি করে। রকেট হাউই উড়ল একটা । অনেক দূরে। ভ্যামতালা লাগা শব্দের ভিতর পথে করে কেমন সাঁই করে বেরিয়ে গেল! আলোর ফুলকি ঝাড় হয়ে ছড়ালো আকাশে। বেঘোরে ঘুমন্ত মদ্যপ লোকটাকে ডেকে দেখানো যাবে না আকাশকুসুম। —এ্যাই মশাই, দেখো না, তোমার থেকে ভাল হাউইও আকাশে ওড়ে।

এবার কিছুই করল না মানুষটা। সারারাত জেগে ছেলে বৌকে নিয়ে বাজি বানানোর কী ধুম! হাড়কিপ্টে লোকটার বৌকে একটা শাড়ি কিনে দিতে প্রাণ বেরোয়, ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে যায়, ছাঁটাই, ভলান্টারি রিটায়ারম্যান্ট, সব। সেই মানুষ আকাশকুসুম গড়তে সাত আটশ টাকা খরচ করে প্রতিবৎসর । কলকাতার শখ, কলকাতা না এলে হতো না। তুবড়ি, রংমশাল, হাউইএর বিরাট ভান্ডার তৈরি হয় তিন রাত্তিরে। প্রস্তুতি শুরু লক্ষ্মীপুজোর পর থেকেই, ক্যাস্টর অয়েল, রংমালের খোল, কাঠকয়লা, বালি, গন্ধক ভেতরের বাথরুমে বোঝাই লফ্‌টের উপর । পেতলের নিক্তি মেজে ঘষে গোদরেজ আলমিরায়। লোহচুর, সোরা, এ্যালুমিনিয়াম চুর আসে দিন চারেক আগে। অনুরাধাকে তুষ্ট করতে এবার ড্রইংরুমের মাপের প্ল্যাস্টিক শিটও একখানা কেনা হয়েছে। গুঁড়ো গুঁড়ো বারুদউড়ে সারাঘর জতুগৃহ । নইলে দশ বৎসরের চিংড়িপুঁটি দুটোও দুমদাম· খোলে বালি পোরে, বারুদ ঠাসতে থাকে বাপের সঙ্গে । অনুরাধার রাতজাগা তিন নাবালকের অভিভাবক হয়ে, ভয়ে । কখন কোন অনর্থ ঘটিয়ে ফেলে। আজকাল এমন আকছার হচ্চে। কমলকুমারের সহকর্মী বিমানের ছেলের হাতের চেটো ফুটো হয়ে গেল রংমশাল ঠাসতে গিয়ে ।

অনুরাধার যমজ দুটোও হনুমান জাম্বুবান সহোদর। বেডরুমের একটা কাঁচ যদি ভানুসিংহের নিখুঁত ঢিল খেয়ে ভাঙল, তো ড্রইংরুমের একই মাপের আর একখানা ভাঙল মাধব। যদিও অনুরাধার হাতে মার খেলো তার জড়োয়া ভাই সায়ন। পরদিন আর একখানা কাঁচেও চিড় দেখা গেল ছ'সাতটা । শুধু সন্দেহ দিয়ে আসামি ধরার বিপক্ষে কমলকুমার, তাই সব ডাউট কাঁচ এবং

লোহার ফ্রেমের সংকোচন আদি জটিল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উপরই বর্তাল। শেষ কবে কার কথা । মাস চারেক আগে। কুঁড়ে এবং কিপ্টে লোকটা উত্তরের বাতাস খেতে খেতে গা করল না। বরং গর্ববোধ করল, ভাঙুক, ছেলেরাই ভেঙেছে, তাদের বাড়ি, সবকটা ভাঙুক তারপর দেখা যাবে। এত গর্ব তার ছেলে নিয়ে। অনুরাধা আদর করে চিংড়ি একটাকে পুঁটি অন্যটাকে ডাকে,এতেও মানুষের মনখারাপ। শাস্ত্র ঘেঁটে জোড়া নাম বের করেছে। নিজের ছেলে বলে, সাত খুন মাপ । কোন এক বলাই সিঙ্গির পুত সত্তর টাকা দামের কাঁচ একটা ভাঙল বলে কাঁচ ভাঙার এক ঝন্‌ঝন্‌ ঝনাৎ শব্দ লোকটার জীবনের সব সুখ আনন্দ ভুলিয়ে দিল! পুরুষ মানুষের মন এত ঠুন্‌কো কেন হবে? এমনিতে লোকটার পুষে রাখার মতো কোন দুঃখও তো নেই।

দেশে থাকতে এরকম উট্‌কো আতান্তরে পড়তে হয় নি তাদের। অনুরাধা তার পুরুষটি নিয়ে বড় গর্বে ছিল, ছফুট লম্বা ডাকাবুকো চেহারার দীর্ঘতম মানুষটিকে পাড়ার লোকে সমীহ করত, মানত। পরিচিতিহীন মহানগরে কমলকুমার কেউ নয়, তবু ভানুসিংহ এবং তার বাপের কাছে এখন কমলগুণ্ডার ছায়াতেও যে বজ্রভ্রম হয়, সে ওদের হাঁটা চলার সন্ত্রস্ততায় মালুম পায় অনুরাধা । ব্যাটা ভীতুর ডিম, বোঝে না কিছুই, বোঝে না শেঠ-এর খলবলান বউএর লোভী টোপও তার বিশাল দেহটার উপরই। অনুরাধা চেনে তার স্বামীকে, পুরুষমানুষ, একটুআধটু ফস্টিনস্টির ভান না থাকলে চলে! এরকমটাই পছন্দ অনুরাধার, ম্যাদামারা পুরুষমানুষ তার অপছন্দ বরাবর। মানুষটা এরকম হলে ক্ষতি কি ছিল! এই যেমন, লক্‌লকিয়ে পরের বৌ দেখে, জুয়ো জিতে, মাল খেয়ে, খুব মস্তানি দেখিয়ে বউএর উপর অত্যাচার করে গরর্‌ গর্‌ ঘুমোল। এরকম মন্দ না! একটা জিত মানুষটাকে আবার চন্দনিতে নিয়ে এলো। জুয়াই হোক, অপমানই হোক, হারবে না কিছুতেই। হারের রোক, শোধ না তুলে মানবে না। অনুরাধার এসব নেই, সেও হার মানতে পারে না, তবু ভেঙে পড়ে না, তার শোধ তোলার ব্লুপ্রিন্ট সে নিখুঁত তৈরি করে নেয়, কাউকে দেখায় না। এমনকি এই অসহ্য সুন্দর পুরুষটিকেও না।

তিনদিনের মাথায় রাত এগারোটা থেকে কমলকুমার বৌএর সঙ্গে বিস্তর কথা, কথার উপর কথা দিয়ে,কথার শেষে ক্রিয়া , প্রক্রিয়া সেরে রাত সাড়ে বারোটায় নিদালির ঘোরে ঘুমোল। মধ্যরাতের সময়টা ধরলে তিনদিনের মাথায় কথাটা একেবারেই কথার কথা। সঠিক হিসেবে সাড়ে তিনদিন আগের.দুপুর থেকে কাগজ ঘেঁটে কমলকুমার জমিবাড়ির খোঁজ পেয়েছে অনেক। কল্যাণীর পালটাপালটি জমিবাড়ি-ফ্ল্যাট এ তার মন ধরেছে । একদিন দেখে আসবে । মোটামুটি ঠিক করে নিয়েছে ফ্ল্যাট সে বেচবেই।

ফ্ল্যাটও অনেক সুবিধা ম্যান। কেনার সময় অনুরাধাকে বলেছিল। দোতলার ফ্ল্যাটএ আরো সুবিধা। বেশি সিঁড়ি ভাঙলে মেয়েদের জরায়ু নেমে যায়। অনুরাধা, ছোট্ট রাধা,সুখের রাধাকে অসুখের ডিপো করার অনিচ্ছা থেকেই তার দোতলার ফ্ল্যাট কেনার সিদ্ধান্ত । আরো কারণ, বিদ্যুত নেই, জলকল বন্ধ, নো প্রবলেম দুই পা ফেলিয়া নিচেই মিউনিসিপ্যালিটির কল। ব্যালকনি থেকেই, পুরনো কাগজ বে, চাই ফুলঝাড়ু, ক্যাঁকড়া, শিলপাটা, শিশিবোতল বে, সারাদিনের আত্মীয় ফিরিওয়ালারা চোখের ডাকে। ছোটমামার বুকে পেসমেকার, কাকামণির হাঁপানি, বয়স্ক আত্মীয়রা সবই কিছু না কিছু মাত্রায় অসুস্থ। তাই,অসুস্থতার তালিকা কমলকুমার কে আশান্বিত করায় অনুরাধাকে কনভিন্স করাতে অসুবিধা হয় নি । হুজুগে সওয়ার কমলকুমার রায়বর্দ্ধনের উৎসাহ

আর সুখনীড়ের লোভের আঠায় প্রমোটারের হাউই পঞ্চাশ হাজার টাকা এডভান্স নিয়ে যখন বেরিয়ে গেল, কি আর করা, অনুরাধা কনভিন্সড। আদর্শবাদী স্বামী ওকে বুঝিয়েছে, বরাকপারের গ্রাম থেকে ছেলে মানুষ করা যাবে না, আর ছেলেদের জন্যই যখন বাকি জীবন, --চলো কলকাতা। চার বৎসরের সায়ন মাধবকে নিয়ে যখন কলকাতা এলো, ভালই তো লেগেছিল। দৌড় আর দৌড়, শনি, রবি আর ছুটির দিনের দৌড়, দেখো কলকাতা। বিনয় ঘোষ, রাধারমণ মিত্র, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত গুলে খাওয়া কলকাতা দেখাতে পঁচিশে বৈশাখের ভোরে, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির রোদে তিন ঘন্টা, বোর্ন এন্ড শেফার্ডের তিন তলায় ফটো তোলা, হেদুয়া, গোলদীঘির পারে বিকেলে বেড়ানো সারা হলো প্রথম বৎসরে। একদিন অনুরাধাকে চুপিচুপি বলল, শুধু দুজনে বেরোবে, হেঁটে হেঁটে দেখাবে একটা রাস্তা, লাল আলোর এলাকা, ঠিক সন্ধ্যেবেলা হেঁটে পেরিয়ে যাবে দুজনে। হাঁটার কথায় জ্বর আসে অনুরাধার, এরকম অনেক উৎসাহ কমলকুমারের মাঠে মারা গেছে। মাঝে মাঝে কলকাতার বাইরেও ঘুরে এসেছে, পুরী কোনারক, ঘাটশিলা, গালুডি় বকখালি, দীঘা, জুনপুট কোথায় নয়, দুদিন পরপরই, --চলো ভ্রমণে। ফুলডুংরি দেখে খুব হতাশ হয়েছিল কমলকুমার। এমন কত টিলা রয়েছে বরাক পারে, বড়াইল পাহাড়শ্রেণী যে কেন বনশ্রী লেখক বিভূতিভূষণের অধিগম্য হলো না! প্রকৃতি, সাহিত্য নিয়ে অনেক বিতর্কে কমলকুমার অনুরাধাকে টানতে চায়। অনুরাধা জড়ায় না, মানুষটাকে হতাশও করে না, চিংড়িপুঁটিকে এগিয়ে দেয়--বাপির কথা শোন, দেশের কথা শুনে রাখ। আট বৎসরের ছেলেদুটোর উৎসাহ অনুৎসাহ কিছুই নেই, তবু বাপকে তাতিয়ে দেয়, --চলো বাপি, দেশে যাই।

টানা তিনবৎসর চলল চলাচল। নব্বুইএর এপ্রিল মাস দেশে কাটিয়ে ফিরল কমলকুমার। ছেলেদের জলচল করার নেশায় মেতে থাকল শিলচরে। নছিবালি হাকিমের পুকুরে এখন আর কেউ নামেই না। বিশালত্বে পদ্মবিল, মন্দিরদীঘি থেকে অনেক বড় ছিল এই দীর্ঘিকা, বর্ষার বরাক অন্নপূর্ণাঘাটে যত বড় তার থেকে দীর্ঘ নছিবালির পুকুর। এখন মজানো হচ্চে, পানা শ্যাওলা আর আবর্জনায় ভরে আছে। পুকুরই হারিয়ে যাবে একদিন, বড় বড় দালান উঠবে। সাঁতার শেখার শৈশব বুজিয়ে জীবনের দালানকোঠা হবে। মনে এক দার্শনিক হাহাকার বয়ে যেত, কাউকে বুঝাতে পারত না কমলকুমার, --অনুরাধাকে বলত। ছেলেদুটোও এত ছোট! ওদের নিয়ে বরাক নদীতে চলে যেত ইটখোলা ঘাটে চালিগুলো এখনও তেমন আছে। বাঁশের আড়ৎ, গরুগাড়ির থিথি হৈহৈ সবই যেন, এক আছে। বাবা যেমন শিখিয়েছেন, কমলকুমারও দুইছেলেকে বাঁশের চালি ধরে ভাসতে শেখায়। চালির উপর মাঝিদের গান শুনে শুনে অনেক দুর অব্দি চলে যেত, অন্নপূর্ণা ঘাট ছাড়িয়ে। --মাঝিদের গানে গলা মেলাতে কি মজা ছিল রে! সুজন মাঝি বাইয়া যাও/ একখান কথা কইয়া যাও/ ঘাটে লাগাইয়া ডিঙা/ মাঝি পান খাইয়া যাও। তোরা কিছুই দেখলি না! ভোরের বাতাসে, দমবন্ধ মহানগরের দূষিত বাতাসে নয়, পরিচিত নদীর পারে গলা ছেড়ে গান গাইতে গাইতে ছেলেদের বলতো, --কলকাতায় একরকম, এখানে একরকম, ওখানে ছমছুমাঝির কোলে সাঁতার শেখা হবে না, এখানে অম্বর রায়ের কাছে ক্রিকেট শিখতে পারবি না।

কলকাতা ফিরে দুটোই হলো, অনুরাধা লেকটাউন সুইমিং পুলে ভর্তি করিয়ে দিল দুটোকে। এ সিদ্ধান্ত একা অনুরাধার উৎসাহে নয়, যৌথ উৎসাহই এর মূলে। শিখা, পায়েলের মা, মুখার্জি বৌদি, ডোডোর মা, তিতিরের মা সুতপা আর সায়ন মাধবের মা অনুরাধার সমবেত নারীমঙ্গলসমিতি

হলো একটা, একসঙ্গে যাওয়া আসা। আড্ডার ক্লাব হলো একটা । নেত্রী তো একজনই, অনুরাধা রায়বৰ্দ্ধন।

বড় সুখের সময় ছিল। অনুরাধাদের হৈচৈ হুজুগের নাচুনি সুখনীড়ের বারোটি আবাসিক শরিক নির্বিরোধী সঙ্গ দিত। কমলকুমার অনুরাধাও ওদের সঙ্গে আত্মীয়তাবোধে আটকে ছিল টানা পাঁচ বৎসর। সুখনীড় আবাসন সমবায়ের সম্পাদক চন্দন মুখার্জির স্ত্রী মুখার্জি বৌদির প্রতি অনুরাধার অতিরিক্ত পক্ষপাত। আট বৎসরের দাঁড়কিনা ডোডো মুখার্জি, বারো বৎসরের চিংড়িপুঁটির অনুগত এখনও । ছোটমাছ দাঁড়কিনা, দাঁড়ের উপর দিয়ে বয়ে যায় এতো ছোট। ডোডোমশাই দেখতে ছোট হলে কি হবে, দুরন্তপনার সব নতুন প্রক্রিয়ার উদ্ভাবক । অবশ্য সুনুদা মুনুদার অনুমোদন না নিয়ে কোন আবিষ্ক্রিয়াই সার্থকতায় পৌঁছবে না। চিংড়িপুঁটির সায় সাবাসি না থাকলে মন খারাপ থাকবে বা পরিত্যক্ত হবে দস্যিপনা। অনুরাধা জানে, এরা তার নিজের মানুষ নয়, শিলচরে যেমন, এরা তেমন নয় । যতক্ষণ সুখ আছে, এরা আছে। হাঁকডাক করে, চাঁদা তুলে ষাটজনের মাংসভাত রেঁধে খাওয়াতে পারল দোলের সন্ধ্যায়, তো অনুরাধা রায়বৰ্দ্ধন ইজ এ গ্রেট লেডি। তোমার বিপদের মানুষ নয় এরা। সুখের সাথি। অনুরাধা কমলকুমারের উৎসাহে রাশ টানতে অনেকবার সাবধান করেছে। করলে কি হবে, যা হওয়ার তার থেকে কম কিছুই হলো না। কাঁচবাঁধা সুখের ঘর ঝন্‌ঝন্ ঝনাৎ শব্দে ভাঙিয়া গেল!

তিন বৎসর পর দেশে যাওয়া। এপ্রিলের শেষে ফিরে অনুরাধার সুইমিং পুল এবং টাইমপাস ক্লাবের সূচনাই নয় শুধু, অন্য এক বিপত্তিরও শুরু হলো। অনুরাধারা সৌভাগ্যই মেনেছিল নিচের তলার আবাসিক মনোমতো হলো জেনে। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে সুখনীড় আবাসনের নতুন সভ্য হয়ে এলো সিংহ পরিবার। ভূমিতলে এক নম্বর ফ্ল্যাটের নাম হলো 'সিংহভবন'। অবাক মানুষ এই নতুন স্বজন, ফ্ল্যাট কেনার আগে এলো কমলকুমারের কাছে। কমলকুমার সুপ্রতিবেশীর সম্ভাব্য টিপস দিয়েছিল।

বাম্বুভিলার ইন্সপেক্টর বলাই সিংহকে সাদাসিধে মানুষ বলেই মনে হয়েছিল । মহিলা খুব ডমিনেন্ট। এক ছেলে এক মেয়ে । ছেলেটি, ভানুর বয়স তখন তের কি চৌদ্দ। মেয়ে তারা সায়ন মাধবের বয়সী। মন্দ কি, ছেলেদের সঙ্গী হলো ছেলেমেয়ে দুটো। বেশি বয়সী ছেলেটা গার্জেনিও করতে পারবে, প্রয়োজনে খেলার সঙ্গিও হবে। মহিলা প্রতাপী হলে কী, সে তার ঘরে। সারাদিন পুজোপাঠ নিয়েই থাকেন। ঘন্টাধ্বনি, পুজো আর প্রসাদ। দিনে দুবেলা কিছু সময়ের ঘন্টাধ্বনির উৎপাত সইলেই, পিঠে পায়েস নারকেলতক্তি কাটাফল। কমলকুমারের প্রিয় খিচুড়ি লাবড়ার উপর দোপাটির কটা পাঁপড়ি আর তুলসীপাতা ফেলে দিলেই-আঃ ফাইন! যুগ যুগ জিও ঘন্টাধ্বনি।

এবার ছাদে জমল না দীপাবলীর আনন্দঝরণা। রাত বারটায় কলিংবেলের শব্দে সচকিত 'এ্যাই' করে অভ্যাসের ধাক্কা দিয়ে বুঝল ভারি পাশবালিশকে নড়ানো যাবে না। আলো জ্বালল না অনুরাধা। দরজার চোরা চোখে দেখল এক অভিনব শোভাযাত্রা। পুরোভাগে সুখনীড় সুন্দরী শ্রীমতী রাধা, রাধার কটিতে হাত রেখে ঝুলন্ত শেঠপুঙ্গব, না দীর্ঘ না খর্ব বাঙালি পুরুষ চন্দন মুখার্জির গর্বিত অধিকার তার শ্যামলা বউ, সুখনীড় আবাসনের একমাত্র বয়সী ব্যাচেলর ঘনশ্যাম রায়ের হাতে ধরা তার আড়াইমণি কনিষ্ঠা তাপসী চৌধুরীর হাত। রায়দার কেমন আত্মীয়া বিড়াল দিদি কেউ জানে না। দিদিকে দেখেই অনুরাধার হাত চলে গেল দরজার ছিটকিনিতে, ঝলমল হাসির

ঘেরাটোপে নিজেকে সাজিয়ে নিয়ে দরজা খুলে দাঁড়াল গার্ড অব অনার নেওয়ার জন্য। বেড়াল দিদি ভাই এর হাত ছাড়িয়ে অনুরাধার গায়ে এসে উড়ে পড়ল, গায়ে লেপ্টে গন্ধ শুঁকল। অনুরাধা দেখল উপর থেকে নামছে একে একে বেঁটে বউ শিখা, শিখার বর কপিল জানা, সুতপারাও। চন্দন মুখার্জির বৌএর লালপেড়ে তাঁতের শাড়ি ছাপিয়ে কপালের মস্তো টিপ আর ছড়ানো চুলের সৌন্দর্য তাকে মনে করিয়ে দিল দীপাবলির রাত কালিপূজারও রাত। অনুরাধাকে বিপাক থেকে উদ্ধার করলেন দিদিই। সবাইকে শুনিয়ে গোপন প্রশ্নটি করলেন অনুরাধাকে —কই রে, আমার ভাইটি কই, এবার কি হলো, আনন্দবাতিও জ্বালল না ছাদে, দীপান্বিতার রাত বারোটায় শাঁখে ফুঁ দিয়ে শুয়ে আছে কেন? অনুরাধা প্রায় না শোনার ভান করে রাধার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলে, —আপনে ক্যায়া জাদু চালায়া, আপলোগোকা ঘর সে আকর হি সো গয়া। সুতপা একবার বলেছিল—দিদি তুমিও চল না। অনুরাধা হাসিমুখে সবাইকে বিদায় দিল। তাপসীদিদিকে ছাড়ল না,—এ্যাই খুকি, খুব তো সতী সেজে ঘুরে বেড়াও, প্রদীপ দুটোয়ও সলতে জ্বালানোর দাগ পড়ল না, শাঁখ বাজানোও শেখালে না কাউকে, শেষ বয়সে এই ছোট ভাইটার উপর দৃষ্টি দিয়েছ কেন? —মর্ মর্ পোড়ারমুখি। হাসতে হাসতে আলতো চিমটি কেটে চলে গেল হোঁদল কুতকুত।

এইবাড়ির একটিমাত্র মহিলাকে অনুরাধা অপছন্দ করে, দারুণ সেলফিস, উপবাসী শরীরে, মনে। ওকে প্রাধান্য দাও, খুব খেতে দাও, লুকনো শরীরের কথা বলো, বলো, —দিদি তুমি আছো বলে মেঘে জল, এই আবাসনের একতা,এর প্রাণভোমরা তোমার হাতে। ব্যাস, অনুরাধা কমলকুমার তুল্য জুটি হয় না। তেষট্টি বছরের বুড়ি, স্বল্প সঞ্চয়ের বড়বাবু হয়ে রিটায়ার করেছে ক'বছর আগে। বেড়াল পোষে দুটো, বেড়ালের আছে দোতলা ঘর পার্টিশন দেওয়াল ভেঙে। রায়দার শখ অ্যাক্যুয়ারিয়ামের। লালমাছ, নীলমাছ, তরোয়াল মাছ, কালো রূপোলি মাছের সংসার সাজিয়ে রেখেছেন। —অ্যাই দিদি। সিঁড়িতে উকি দিয়ে আবার তাপসী চৌধুরীকে ডাকে। অপছন্দের মানুষের সঙ্গে ফের মিনিট খানেকের কানাকানি কথা বলে অনুরাধা। কথা শেষ করে তার জায়গায় ফিরে আসে। ভাঙা কাচের ফাঁক দিয়ে কালিপ্যান্ডেলগামী সুখনীড়ের সুখী দম্পতিদের দেখে। ক্ষীণকণ্ঠী পৃথুলা তাপসী চৌধুরীকে এখন তার বড় প্রয়োজন।

বিছানায় ফিরে কমলকুমারের ঝাঁকড়া চুলে হাত বুলায় অনুরাধা। —এসব তোমার কম্ম নয় হে ভালমানুষ! সরলতা দিয়ে এখানে কিছু হয় না, মহানাগরিক প্যাঁচ পয়জার না জানলে সবাই তোমাকে তুলে আছাড় মারতে চাইবে, সে তোমাকে দেখতে যতই মারকুট্টে দেখাক না। ওই বেড়ালবুড়ি কি কম হেসেছিল তোমার বৌএর পাড়কাটা শাড়িটা দেখে! বুড়িকেই প্রথম দেখিয়েছিল, তার প্রায় নতুন শাড়িটা, দুতিন কাচার ঘরে পরার শাড়িটা। ফ্ল্যাটবাড়িতে যে এরকম উৎপাতের বিষ থাকতে পারে কল্পনাতেও ছিল না। ব্যালকনিতে ভেজা কাপড় মেললেই মহিলার চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুরু হয়। প্রথম প্রথম আমল দিত না অনুরাধা। পরপর পাঁচখানা ব্বারান্দা ওপরে, একতলার অনুরাধাকে কী গালাগালি করে মহিলা, যাকে প্রতিদিন পুজোর প্রসাদ খাওয়ায় এত যত্নে। কী করে যে কাপড়ের কোণা কাটতে পারল! বেড়ালদিদি তো শাড়ি হাতে নিয়ে হেসেই কুটিকুটি, —এরকম ঘটনা তো রে কাগজে ছেপে বেরোয়, সিনেমায় দেখায়, রিয়্যাল লাইফে একেবারে প্রথম। মজার কান্ড! —দিদি, এতে মজার কিছু নেই, রায়দা তো প্রেসিডেন্ট সমিতির, একটা বিহিত ব্যবস্থা কর। বুড়ির সিরিয়াস হওয়ার কোন লক্ষণই নেই। —তোর ছেলেদুটো তো

যোয়ান ধাক্কা মন্দ না, বলাইএর মেয়েটাও ডাগর ডোগর বেশ। আর কথা বাড়ায় কি অনুরাধা।

শান্তিপ্রিয় কমলকুমার বিশ্বাসই করতে পারে নি। সায়ন মাধবকে আসামি করে কোর্ট বসিয়েছিল, --তোরা কেটেছিস? ছেলেদুটো এমন কাজ করবে বা জেনেও বিশ্বাসের ভিত পোক্ত করেছিল। এমন কাজের বিচার চাওয়া যায় না তবু অনুরাধা চন্দন মুখার্জিকেও ডেকে দেখিয়েছে

তিন এর পিঠে তিন। আরো তিন বৎসর যে কী করে সিংহ পরিবারকে নিচে রেখে কাটিয়ে দিল অনুরাধা। একই রকম ডবলখাটে কার্ল-অন এর ম্যাট্রেসে শুয়ে আকাশ দেখে দেখে, একই জানালার ফাঁক দিয়ে চাঁদকে বড় থেকে ছোট, ছোট থেকে বড় হতে দেখার শখকে অভ্যাসের একঘেয়েমিতে নিয়ে এলো সে। খোলা জানালার বদলে আজ তার চোখে ভাঙা কাঁচ, ভাঙা আকাশ। আকাশের গায়ে এখনও ভুসভুসিয়ে আকাশমণি ফুটছে। আতসবাজির শখ থেকে হাউইদের যে কত নামে ডাকত কমলকুমার। সুনু মুনুকে শেখাতো আকাশকুসুম, আকাশমণি, ক্ষিতিমোহন, কোনটার নাম গগনঠাকুর। কাপড় কাটার পর থেকে সায়ন মাধবও যেন কেমন হয়ে গেল। মনটা আর নির্মল থাকছে না ওদের। নিজেদের মনটা তো শুদ্ধ নেই, তাই খেলা থেকে ফেরার পরই অনুরাধার কৌতূহলী প্রশ্নের জবাবে রিপোর্ট দিতে হতো দুভাইকে। সিংহতনয়া তারা চিংড়িপুঁটির বন্ধু যেমন ছিল থেকেছে। সুনু মুনুই প্রতিবেদনে জানাতো, কাপড় কাটায় নায়ক দাদাভাই, ঘরের ছাঁদ থেকে হাতুড়ির ঠকঠকও দাদাভাই, নোংরা থলে ওদের দুয়ারে রেখে যায় দাদাভাই, লেটারবক্স থেকে চিঠি চুরি করে পড়ে দাদাভাই। দাদাভাইকে নিয়ে দশবৎসরের তারার খুব গর্ব। তার মা বাবারও। দ্বিতীয়বারও যখন কাপড় কাটল, অনুরাধা কিছুই করল না। কমলকুমার অনুরাধার প্রাথমিক ভুলটাই করল। রায়দা, মুখার্জি, এদিক ওদিক পাড়ার অনেক ইনফ্লুয়েন্সিয়াল মানুষজনকে বলল। কেউ কেউ বলল--ওরে বাবা, কি সাংঘাতিক মহিলা, লড়তে গেছেন, এর আগের পাড়ায়, বাড়িউলির চুল কেটে দিয়েছিল। অটোওয়ালা পার্টির শঙ্কর বলল-- কিছু ভাবতে হবে না দাদা, ওদের সময় হয়ে এসেছে, আমাদের ক্যাডার আজিবুরকে নিয়ে ক্যাচাল করেছে পাড়ায়, আমরা ছাড়ব না। পশ্চিমবঙ্গে আমরা সাম্প্রদায়িকতা থাকতে দেব না, এ আমাদের পার্টি লাইন। তবে বুঝেনই তো দাদা, স্ট্র্যাটেজিক্যালি এগোতে হবে। প্রতিবেশী ডঃ কর, ইংরেজির অধ্যাপক বললেন--বুঝলেন না, ছিল রুমাল, আরে মশাই ধার চক্চকে কাস্তে ছিল হয়ে গেল মায়ের গোলাপ গাছের কমল। এরা সব পারে, চেপেই যান। হতাশ কমলকুমার অনুরাধাকে সব বলে। অনুরাধার আরম্ভিক ব্লুপ্রিন্টটা তত নিখুঁত ছিল না বলে তার সহজসুন্দর মানুষটা এত কষ্ট পেলো দীপান্বিতার রাতে এবং তারও আগের সাড়ে তিনটে দিন।

সাড়ে তিনদিন আগে, যেদিন শেষ শো ডাউনটা হলো, রবিবার দুপুর বারোটায় অনুরাধার রান্না-বান্না ঘরকন্নার সাময়িক বিরতি। পতিসঙ্গকামী রেস্ট। চিংড়িপুঁটি ওদের ঘরে দরজা বন্ধ করে হারমোনিয়াম তবলায় 'ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে'র রিহার্সালে ব্যস্ত। পাঁচমাস পর রুদ্রকাকুর বাড়িতে হোলি উৎসবে যমজ ভাইএর সঙ্গত সহ বিরল উপস্থাপনার প্রস্তুতি। কমলকুমারও খোলা জানালার পাশে খালি গা, লুঙ্গির ঢিলে কোমরে এক হাত, অন্যহাতে অভ্র রায়ের ঘন হয়ে ওঠা ধারাবাহিকের রহস্য। রহস্য বাইফোকেল থেকে সরে সরে যাচ্ছিল দ্বিপ্রাহরিক বিশেষ চাএর অপেক্ষায়। অনুরাধা দুকাপ চা নিয়ে কমল কুমারের পাশে বসতে-বসতে স্বগতোক্তি করে--কিছু কিছু মানুষের জন্মই হয় সুখের লাগিয়া। কমলকুমার বুঝলো ক্লান্ত বউএর কটাক্ষের উদ্দিষ্ট তার

ছুটির দিনে গড়ানোর অভ্যাস। সেও মেলে রাখা কাগজের পৃষ্ঠা থেকে পড়ে শোনায়-ঈর্ষারি সবুজ চোখ। পিরিচ সহ কাপটা কমলকুমারকে ধরিয়ে ডাটি ভাঙা কাপে আয়েসের চুমুক দিয়ে প্রত্যুত্তর কিছু একটা ভাবছিল যখন, নিচের তলায় শুরু হয়ে গেল খণ্ডাখণ্ডি, জ্বালিয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও। তাতিয়ে দেওয়ার সদম্ভ ঘোষণা সব। শেষ শো-ডাউনের শুরু। কমলকুমার এর মাত্রা বুঝেনি, রসিকতা করে বলেছিল--শুরু হলো ভেজাকাপড়সংহার কাব্য। অনুরাধা ডাটিভাঙা কাপটা কমলকুমারের পাশে বিছানায় রেখে ব্যালকনিতে উঠে যায়। নিজের বাড়িতে কত আর চোরের মতো থাকা যায়! চেঁচিয়ে ধমক দেয়--অ্যাই, চোপ। একদম চোপ, অনুরাধার দাবড়ানিতে গোটা সিংহ পরিবার একককাট্টা নিজেদের বারান্দা টপকে ধর্মক্ষেত্রে সমবেত উর্দ্ধমুখী হয়। ছর্‌রার মতো চতুর্মুখ স্কাড নিক্ষিপ্ত হতে থাকে ছোট ব্যালকনিতে বাকযোদ্ধা অনুরাধার উদ্দেশ্যে। অনুরাধাও কেশর ফুলিয়ে বিবশ কমলকুমারকে দেখে আর অশ্রাব্য কথ্য ভাষার প্রায়োগিক নৈপুণ্যে চমকায়। তার সঞ্চয়ের অপ্রতুলতায় ভঙ্গ দেওয়ার কথা ভেবেই দেশি ভাষা ব্যবহারের শেষ চেষ্টা করে। কোমরে আঁচল জড়িয়ে একঠাঁই তেড়ে যাওয়ার বিক্রমে বলে--তবে রে ডগি, তবে রে ছুঁচি, বের করছি তোর ডগামি তোর ছোচামি। অর্থহীন শব্দ কটা কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল কে জানে। নিমেষেই পুঙ্গির পুত ! টাচ্ মি প্লিজ নিখুঁত স্পর্শে, যেমন বলল কমলকুমার, ঝন্‌ঝন্ ঝনাৎ। দুএকটা কাঁচের টুকরো পাথরকুচি হতভম্ব কমলকুমারের ঢিলে লুঙ্গি বেয়ে উদোম গায়ের উপরও এসে পড়ে। ঘটনার পরিবর্তিত গতির কাছে হেরে যায় কমলকুমার। কাঁচ পাথরের বিচিত্র শয্যায় শুয়েই থাকে অনেকক্ষণ।

সেই সাড়ে তিনদিনের দুপুর থেকে বৌবাচ্চার সঙ্গে মুখের কথাও বন্ধ হয়ে গেল কমলকুমারের। অদৃশ্য যুদ্ধ শুরু করল নিজের সঙ্গে। যখনই খালি গা হচ্চে, শুধু বুক ঝাড়ছে, তলপেট থেকে খুঁটে-খুঁটে তুলছে কাঁচ আর পাথরের টুকরো। অনুরাধা ঘুমন্ত কমলকুমারের বুকখোলা পাঞ্জাবির ভিতর হাত ঢুকিয়ে রোমশ বুকটাকে আদর করে। আলো জ্বেলে দেখতে থাকে সত্যি কিছু আছে কি না বুকে। থরথর বুকটায় যে তাদের তিনটে প্রাণীর সব নির্ভরতা। কাঁচ কিনে জানালা সারিয়ে কিল খেয়ে কিল হজম করতে দেবে না তাকে অনুরাধা। মানুষটা তাহলে সারাজীবনই অপমানের জ্বালায় আনমনা থাকবে। প্রতিরক্ষার নতুন ব্লুপ্রিন্টটা অতি সাবধানে শেষ করল এইমাত্র। সাড়ে তিনদিন পর রাত বারোটা দশ মিনিটে। বালিশের তলা থেকে টাকাগুলো বের করে গুনল অনুরাধা তার জুয়াড়ি স্বামীর পাশে, তেরশ পঞ্চাশ সাকুল্যে। জুয়াজেতা টাকা কটা বড় জরুরি এখন তার কাছে।

দুই

চারদিন পর কোমল সব প্রভাতী রঙ নিয়ে ভোর এলো। ভোর এলো আবার স্বরধ্বনির অস্থিরতা কাটিয়ে আশ্রয় রাগের সঞ্চারীতে। চারদিন পর কমলকুমার আবার পরিচিত ভঙ্গিতে আড়মোড়া ভাঙে। আধবোঁজা চোখে ছেলে দুটোকে ডাকে চেঁচিয়ে। সকাল সাতটায় কমলকুমারের ভোর সবুজ গাঢ় হয় আদরে স্নেহে। স্কুলের পোষাকে কমলকুমারের দুই প্রাণের প্রহরী বাপের বালিশের কাছে লেপ্টে থাকে। বাবার আদরের কাছাকাছি থাকতে চারদিনের স্নেহ-অভুক্ত বালকদুটির দশা কাঙালের প্রায়। মমতার আগ্রাসনে চারদিনের অপরাধী মন যৌতুকে শাস্তি এড়াতে চায়। আশু সমাধানযোগ্য একজোড়া দু'তরফা প্রস্তাব পেশ করল যুগল তনয়কে। এক, ভিক্টোরিয়া,ড্যাল্গিং

ফোয়ারা, আনারকলিতে শাহি মোগলাই কোর্মা, তন্দুরিরুটির ডিনার এবং টুটিফ্রুটি। দুই, বিদ্যাসাগর সেতু বাই ট্যাক্সি, ফ্রায়েড রাইস পালং পনিরের ডিনার প্লাস টুটিফ্রুটি। আলাদা আলাদা রুচি আদরে দুগাল ভরিয়ে হৈ হৈ করে স্কুলে গেল খুশির শৈশব।

চারদিন পর কমলকুমারের এখন দুঘন্টা সময় থেকে অতিকষ্টে ঘন্টাখানেক বৌএর বরাদ্দে রাখে। বাকি সময়ে দুধ, বাজার করা থেকে নিত্যকর্ম সেরে রেডি হওয়া। ট্যাক্সিতে গেলে আরো হাফ এন আওয়ার গ্রেস। একেবারে না গেলে গোটা দিনটাই পড়ে পাওয়া। সিঙ্গিদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ছুটির দিনের মজা মরে গেছে। ক্যাজুয়্যাল জমছে। ছেলেদের স্কুলে পাঠিয়ে বৌএর জন্য আলাদা মেনু তৈরি করতেই মেজাজ কেটে দেয় অনুরাধা।

বিকেলে বেরোনো যাবে না, কাজ আছে। অনুরাধার তার কাটা জবাবে আমোদে-ফেরা কমলকুমার রেগে যায়।

তুমি ভীষণ জেদি, একগুঁয়ে, মুড খারাপ করে দেওয়ার গোঁসাই। ছেলেদুটোকে যে তাতিয়ে দিলাম, কী হবে এখন?

কিছুই হবে না, ওরাও তো তোমারই, ভীতু বাপের মুডের সঙ্গেই ওদের খেয়াল। কথা দিয়ে ফেলেছি, নইলে আমিও যেতাম রে বাবা!

ঠিক আছে, সকলই তোমার ইচ্ছা। তুমি আজকাল খুব বদলে যাচ্ছ, কলকাতায় নাগরি ছোঁয়া লেগেছে তোমার।

নাগরি ছোঁয়া! ভাষায় পেয়েছে? অ্যাটাকে যাচ্ছ?

--রাগছ কেন! এই রাগটাই তোমাকে খাবে ডিয়াব। নাও জল দাও, চানটা সেরে নি। কমলকুমারেব মাথাটা টনটন করে। খালিগায়ে, নাভির উপর একবার, নিচেও চাপ দেয়। না, কাঠিন্য থেকে মুক্তি নেই আজ। রাতের নেশার পোড়ানি পেটে নিয়ে চানঘরে চলে যায়। এককাপ চা হলে এসব কিছুই হতো না, কিন্তু চাইবে কোন মুখে, সেই তো রেশটা কেটে দিল। ওর অনিচ্ছায়ই, সকালটা ফিকে হয়ে গেল। ভোরের রঙটা যেমন গাঢ় সবুজ নীলচে হয়ে মায়ামমতায় ঘিরে ধরেছিল তাকে, তার গার্হস্থ্যকে। ধরে রাখতে পারছে না। এক অবাধ্য জটিলতা তাকে শামুক খোলে আটকে রাখে। যেমন রেখেছে গত চারদিন। সব রাগ, যা হয়, অক্ষমের সব অভিমান গিয়ে জমা হয়েছে বৌএর উপর।—কেন কথা বলতে গেলে ওদের সাথে? কেন নির্দোষ অপরাধের শিকার হলে না বৌ?

বাথরুম থেকে বেরিয়ে সোফায় বসে দুঃখী মানুষ সেজে। গরম জলও তো নেওয়া হয়নি। এরকম নখড়া কমলকুমারের আছে, অনুরাধা জানে। এখন লোকটাকে লাই দিলে কথার পিঠেকথা বলবে, অফিস যাবে না। তার পৃথিবীর সব অশান্তির মূল বৌকেই অভিযুক্ত করবে কথা দিয়ে। তার যখন কেটেই গেছে, যাক্, অফিসেই যাক্। আঁচল দিয়ে ডেকচিটা ধরে নিয়ে যায় বাথরুমে, ঢাকনা খুলতে গরম ভাপ লাগে হাতে, আঙুলে, মুখে। নাকে লাগতেই চোখ কোঁচকায়, বালতিতে ঢালতে ডানপায়ের পাতায় পড়ে। আর ঢালা হয় না জল, বাথরুম থেকে ধপধপিয়ে বেরিয়ে আসে। --আমি পারব না, কত বৎসর থেকে বলছি একটা গিজার লাগিয়ে নাও। না, এবাড়িতে টাকা খরচ করলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে। বলাই সিংহ আর ভানু সিংহের ভয়ে নিজের বাড়িতে চোরের মতো থাকবে। এসব মানুষ নিয়ে ঘর করা চলে না।

ওসব গিজার মিজার বাদ দাও তো। একটা ভাল খদ্দের খুঁজে এবার ফ্ল্যাটখানা ঝেড়ে দিতে পারলেই ঝাড়া হাত পা। এখানে শূন্যের ঘর আমাদের সইবে না। ম্যান্টালিটিও পোষাবে না।

ম্যান্টালিটিতে ফারাক দেখলে কোথায়? একটা অমানুষ পরিবার দিয়ে তুমি গোটা দেশটাকে বিবাদি করে তুলছ।

বাদবিবাদ বুঝি না, আমরা অশান্তি চাই না। শান্তিতে ঘর সংসার নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই। এখানে সে শান্তি নেই।

--কোথায় আছে? তোমার দেশে? শিলচরে? কচু আছে ওখানে, অশান্তি আরো বেশি। আত্মীয় স্বজন, অশিক্ষিত কূপমন্ডুক প্রতিবেশীর মেলা ওখানে। তবে তুমি যেতে চাও বাধা দেব না, যাব। কিন্তু অশান্তি যারা পাকিয়েছে তাদের জড় না উপড়িয়ে যাব কেন? পলায়ন শান্তি নয়।

চারদিন প্রায়-অভুক্ত কমলকুমারের আজ পারণ। দুদুটো প্রিয় মাছের পদ। মকা মাছের করু আর কাংলা মাছের পুর।

আঃ! খেতে বসে অনুরাধার স্বাভাবিক হয়ে আসা মুখে তাকিয়ে বলে, --যাই বলো, সিদল শুঁটকি হয়তো এখানে অচল, কিন্তু মাছের সুখ পাবে না দেশে ফিরলে।

এত দেশ দেশ করো না তো। এই আমাদের দেশ। এখন অফিসে যাও। রাতেও একই মেনু, রেলিশ করে খেও। অফিসের সময় পার করে দেওয়ার মতলবি গল্পের রাশ টানে অনুরাধা।

না, ভুল দেশ কখনও দেশ নয়। দেশে কখনও অশান্তি ছিল না, আতান্তর ছিল না। সুখ ছিল, শান্তি ছিল, স্বস্তি ছিল। প্রিয়জন ছিল, সঠিক অর্থে পরিজন ছিল।

পরিজনরাও কিল মারার গোঁসাই, কথায় বলে, আপনা থেকে বেগনা ভাল। এই বেশ আছি। ছেলে দুটো তো মানুষ হচ্চে, শিক্ষা পাচ্ছে।

শিক্ষা? হুঁ, নাগরিক শিক্ষার বাইরেও কিছু আছে, না নেই? আহা গো, বরাকের মতো একটা নদী দেখলাম না এদেশে। জোনাক জ্বলা অন্ধকার রাত দেখেছ এখানে! চন্দনির আকাশ দেখেছ ছ'বছরে? বাঁশের চালি বেয়ে মাঝির গানের অপার্থিব আবেশ পাবে মহানগরে? বল? তখন যে কি কেড়া উঠল মাথায়, দেশে থেকেও বিদেশী হওয়ার ভয়ে, আর এক বিদেশে চলে এলাম। নদীর পারের বাড়ি কেউ বেচে?

নদীর পার মন্দ নয়, পর্যটকের দুপাঁচদিনের জন্য। বর্ষায় বন্যায় কি হয়? যে কোন সময় তলিয়ে যাওয়ার দ্বীপ হয়ে থাকত বাড়িটা। সাপখুপের ডর। কাজ নাই বাবা, বেশ আছি, ভালই আছি। লাইট নেই তো নেই গোটা দিন, দুদিন তিনদিনও গেছে বিনা ইলেক্‌ট্রিসিটিতে। ভয়াবহ। যাইতায় নি বা, যাইতাম না-র গান শুনেশুনে কতদিন প্রেমতলা থেকে মালুগ্রাম গেছি হেঁটে, রিক্সা ছাড়া তো বাহনও নেই তোমার। রান্নার গ্যাস নিয়ে কালোবাজারি এখানে নেই। সবচে' বড় কথা এখানে মাছ খেতে পারছ, তোমার মতো নিরামিষাশি পর্যন্ত শুধু মাছ খেয়েই ঢেঁকুর তুলছ।

তা বলেছ মন্দ না, এখানকার নিরামিষ মাছের বাজারও তো শাকসব্জির মতো। মাকে এখানে নিয়ে এলে মাছ ধরিয়ে দিতাম আবার। বাবা মাকে বলতেন, আমি মরে গেলে তুমি নিরামিষ খেও, নিরামিষ মাছগুলি খেও। বাবা বলতেন-রোহিত মুদ্গর ইলিশা খলিসা ঘাঘটশ্চৈব

পঞ্চমৎস নিরামিষা। এখানকার মাছে কোন টেস্ট নেই সত্যি, চাতলা বা শনবিলের মতো মাছ এখানে কোথায়? সারের মাছ।

দেখেছি তো ওখানের মাছবাজারের ঝগড়া, মাছ নিয়ে কাড়াকাড়ি আর আগুনে দাম। জীবনের দৈনন্দিনতার অপ্রতুলতা এখানে কম, বা নেই। ছেলে মানুষ করা বা শিক্ষা দেওয়ার কথা উপলক্ষ, মানি।

ঠিকই আছে, তবু জটিলতা আমাদের কাম্য নয় ম্যাডাম। এখানে কেউ কারো নয়, একজনকে মেরে অন্যজন বাঁচে। এত ভার নেওয়ার মানসিকতা নেই আমার। এখানে কে আমাকে চেনে বলো তো? শিলচরে পরিচিতিটা তো বিস্তৃত ছিল। আর ভাল লাগছে না, চলো ফিরে যাই, প্লিজ!

ওহো, বললাম তো, আমার কোথাও যেতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু একটা নিষ্পত্তি না করে আমি নড়ছি না। অপমান সয়ে যাব না। একটা সতের বছরের ছেলে আমাদের প্রশ্রয়ে দাগি আসামি হয়ে উঠবে, এ কেমন কথা!

অনুরাধা কথা দিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করে চারদিন আগের ঘটনা তার মধ্যেও সমান ক্রিয়াশীল, কমলকুমাবেরর যেমন। যতই ভাবুক দুজন অন্যকথায় থাকবে, থাকা হচ্চে না। ঘায়ের অসুখ তো আর জ্বর মাথাধরা নয়, পুঁজরক্ত থাকবেই। কমলকুমার অনুরাধার উপর তার অভিযোগটা এবার মুখ ফুটে বলতে পারল না। বলতে পারল না, অনুরাধা তোমার কাজটাও আমি সমর্থন করি নি। অনুরাধার একটানা কথা আর দৃষ্টির শূন্যতা কমলকুমারকে আরো সান্নিধ্যে নিয়ে আসে। কথায় পাওয়া অনুরাধা আবার শুরু করে,-

হ্যাঁ গো, রুদ্রপ্রসাদ তো রাহুল শতবার্ষিকীর কাজকর্ম করছে খুব। সমিতির সভাপতিও শুনেছি খুব পাওয়ারফুল লোক। কিছু করানো যায় না।

না মহাশয়া, করানো যায় না। কলকাতা পুলিশের সিপি, বিরাট ব্যাপার, তুমি হলে লেতিপেতি। তোমার প্রবলেম তোমাকেই সলভ করতে হবে।

ঠিক আছে, অন্য সভাপতি আছেন, লেখক সংসদের বিহারীলালদা রুদ্রর সুবাদে তোমারও কাছের মানুষ, পার্টিরও লোক। এল সিকে দিয়ে কিছু করাতে তো পারেন। অনেক বিজ্ঞাপন তুলে দিয়েছ।

আবার পার্টি? আর নয়, এদেশের রাজনীতির কাছাকাছি থাকতে চাই না বলে এখনও ভোটার লিস্টের নাম উঠল না। ওদেশে বিদেশী বলে নাম কাটা গেল, এদেশে বিপার্টি সন্দেহে। এ আমি পারব না। দেখো, শুভবুদ্ধি ঠিক জিতবে। রাজনীতির দ্বারস্থ হওয়ার দরকার নেই। ছেলেটি না হোক তার বাবা মা ভুল বুঝবে, আর কোন উৎপাত হবে না।

হবে না, গ্যারান্টিড? ছেলে দুটো বড় হচ্চে, যখন তখন নিচে যায়। যদি কিছু করে বসে?

কী করবে? মগের মুল্লুক নাকি?

নয়তো কী? পুলিশকে তো জানালে সবাই গিয়ে, কিছু করল? পার্টি নেতার অনুমোদন ছাড়া ডাইরি নেবে না। তোমার সম্পাদক পার্টি লেবেলে ঘোরাফেরা করেন। কিছু করল? পুলিশের কাছে যাওয়া? সেও ছুঁচো গেলা। ঘটনার সময় বা ঘটনার পর কি কেউ এসেছিল? যেকজন ছিল,

তোমাকে ঘরে ঢোকাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়লো। যেন আসল অপরাধী তুমি, কাঁচটা তুমি ভেঙেছ। আসলে, সিন্ডিদের নয়, ওরা তোমাকেই ভয় পেয়েছিল, তোমার পরাক্রমী তেড়ে যাওয়াকে মারাত্মক ভেবেছিল, যদি মারধোর কর, ওদের একটা কাঁচ ভেঙে ফেল। লোকগুলো ভীতু, না স্বার্থপর বুদ্ধিমান?

ওসব কিছু না, ওরা সাধারণ মানুষ, ওদের নিয়ে এত ভাবতে নেই। ঠিকই করেছে, তখন রাগের মাথায় কি করে বসতাম। সবাই তো বলল, গুন্ডামি চলতে পারে না, থানায় যান।

থানায় যান! মানুষের চরিত্র কখন বোঝা যায় জানো? অন্যের বিপদে। বলল, থানায় যান, সঙ্গে কেউ যেতে চেয়েছিল? শুধু তোমার প্রেমিকার বর.......

অ্যাই ডিয়ার, বিশেষণহীন সরল বাংলা প্লিজ!

বলো, মি. শেঠ ছাড়া কেউ এসেছিল। ওই অনিচ্ছুক ক'জনকে জড়ো করল, চিঠি লিখল, থানায় জমা দিল। গাঁওবুড়ো রায়দা জড়িয়ে পড়ার ভয়ে টালিগঞ্জ পালিয়ে গেল বউ বাচ্চা সমেত।

বউ বাচ্চা?

ঐ হলো, বিড়ালকে বাচ্চা ভাবো। কাপুরুষ!

এতে অবাক হওয়ার কি আছে। মধ্যবিত্তের চরিত্রই এরকম। সবাই নিজের কোলে ঝোল টানে, নিজের নিজের নিরাপত্তার ঘেরাটোপ সবার আছে। আমরাই বোকা। চন্দন মুখার্জি, শেঠ কোম্পানি, তোমার রায়দা দিদিদেরও রাজনৈতিক পিতামাতা আছে। তাই তারা এত নিশ্চিন্ত।

তুমি আমাকে বাধা দিলে, নারী সমিতির মেম্বার হয়ে গেলে এখন এত ভাবতে হতো না।

যাও না, চন্দর মুখার্জির বৌতো মেম্বার, কিছু করাতে পার কী না দেখ। পাড়ার নেত্রী, মন্ত্রীর স্ত্রী অপালা রায়ের সাথে মিটিং করতে যান মুখার্জি বৌদি।

রাধাভাবিও নারী মোর্চার সভ্য। কড়োয়া চোতএর রাতে মহিলা মোর্চার সভানেত্রী ঋতা গিদওয়ানি এসেছিলেন আবাসনে। পাওয়ারফুল মহিলা। ওরা আজকাল খুব পপুলার। ইউ পি, এম পি, রাজস্থান, সিমলায় এলো বলে।

না, না, নিজের স্বার্থে মৌলবাদী হওয়ার মানে নেই।

তোমার সিংহশাবকরাও তো হিন্দুত্ববাদী, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা যায়।

নারী পরিষদের কাছে যাও না, পশ্চিম বাংলায় পাওয়ারে না থাকুক, সারা ভারত শাসন করছে। বেড়াল দিদির মাসতুতো বোন মধুশ্রী দেবী শুনেছি অগ্নিকন্যার খুব কাছের মানুষ।

তোমার শুধু ইয়ার্কি। আমি কিছুই ছাড়ব না, উল্টোপাল্টে সব পাথরেই দন্ডি কাটব।

কাটো তুমি দন্ডি, আমি পালাই, ছেলেদের ফেরার সময় হলো।

কমলকুমার সংকটের স্বরূপ জেনে তার মতো করেই সমাধান করে নেয়। অশান্তি হিং ..., মানুষের রাগের কারণ জেনে নিলে কোন আতান্তর থাকে না। অনুরাধার সঙ্গে মেলে না। বয়সের শিক্ষা হয়তো এরকমই হয়। অনুরাধার সাথে তার পাঁচ বৎসরের গ্যাপটা কখনই ভরাট হবে না। একজনের অভিজ্ঞ বয়সে পৌঁছতে অন্যজন আরো প্রবীণ হচ্ছে, এ এক মজার দৌড়।

তার চল্লিশ বছরের জীবনে জটিলতার অভিজ্ঞতা খুব কম বলেই চারদিনের অস্বাভাবিকতায় প্রিয় কবির একটা লাইন দিয়ে বারবার নিজেকে শাসন করছে কমলকুমার। গান্ধীবাদী নই, কিন্তু হিংসাকে ডরাই। হিংসাকে ভয় পাওয়া কাপুরুষতা নয়, বেঘোরে থাকায় কোন বীরত্ব!

অসূয়া এড়িয়ে বেঁচে থাকারও কিছু কায়দা তরিবত আছে, অপটু কমলকুমার চারদিনে সেসব বুঝতে শিখেছে। প্রভাবশালী কোন ব্যক্তির সঙ্গেই তার ঘনিষ্ঠতা নেই। কোন সংগঠন, রাজনীতির কাছাকাছি সে নয়। চেনাশোনায় অনেকেই আছেন, অনেক বিখ্যাত জনই তো কমলকুমারের হাসির এ্যানটেনায় ধরা পড়েন প্রায়শই। এদের কাছে কি বলা যায়,

আমার ফ্যাক্ড়া কাটিয়ে দিন।

ধুর মশাই, নিজের ল্যাঠা নিজেই সামলান। আশ্চর্য্য! এত লোক থাকতে দিনদুপুরে বাড়ি ভেঙে দিয়ে গেল, জুভেনাইল ডেলিংকুয়েন্সির আব্দারে একটি উচ্ছন্নে যাওয়া বাচ্চা বদমাস! দুরাচারে বিশিষ্ট হয়ে ওঠার প্রথম পাঠ ডিস্টিংসনে পাশ করে গেল! এশুধু তার ব্যক্তিগত সংকট, নিজের ল্যাঠা! সহজ সত্য জেনেবুঝেও প্রথম তিনদিন নিজের স্বভাবের শান্তি বজায় রাখতে পারে নি বলে এখন খুব অনুতপ্ত কমলকুমার। 'গান্ধীবাদী নই' কথাটা কতবার আলাদা করে ভেবেছে। কত প্ল্যান করেছে, ড্রপারে করে এ্যাসিড ঢেলে দেবে ভেবেছিল লোকটার, ছেলেটার মাথায়। ভদ্রলোকের, কাপুরুষের অক্ষম ভাবনায় বড় সুখ। রাতে জুয়াজেতা টাকা যত বাড়ছিল, ভাড়াটে গুন্ডার কথা ভাবছিল। টাকা বাড়ছিল, গুন্ডার গ্রেডও বাড়ছিল। কোথায় নেমেছিল মানসিকতা, মাত্র তিনদিনে? গল্পের লোটাচোর সাধু চুরির সপক্ষে যেমন মনকে প্রবোধ দিয়েছিল, ঠাকুরের জল আনার জন্যই চুরি। তার যুক্তিও বেশ শক্তপোক্ত, শান্তির প্রয়োজনে গুন্ডামি। কমলকুমারের সাধ্য কিছুই হতে দেয় নি। বলাই সিংহ বহাল তবিয়তে গান্ধি ময়দানে ছেলেকে কোরিয়ান ক্যারাটে শেখাচ্ছে। সিংহিনীর ঘরর্ ঘর্‌ও ঘন্টাধ্বনিতে ফেটে পড়ছে পাড়াময়। মাঝখান থেকে দীপান্বিতা আলোর আনন্দবন্যায় বাঁধ পড়ল আচমকা ঝন্‌ঝন্ ঝনাৎ শব্দে। সায়ন মাধবের নতুন হাউই ব্যোমকেশ আকাশে উড়ল না বিচ্ছিরি একটা কারণে।

এল থ্রি সি বিকেলে ডালহৌসী হয়ে যায় না, অভ্যাসবশে উঠে পড়েছিল কমলকুমার। ওয়াটার্লু ক্রসিং-ও নেমে ওয়েস্ট এন্ড থেকে পার্সেল ফুড এক প্যাকেট অর্ডার দিল। ছেলেদুটোর কাছে মুখরক্ষা হবে, ভাগ করে খাবে হৈহৈ করে। অনুরাধার আদেশ এবং অর্থানুকূল্যে ফেরা যাবে ট্যাক্সি করে । রেডি হতে একঘন্টা লাগবে, আচ্ছা ফ্যাসাদ। টোকেনটায় একটা হেডটেল বের করে। পকেটে হারায় তামার ভারি চাকতিটা। হেড হলে ইউনিয়ন অফিসে ঢুঁ মারবে একবার, নইলে বাউটা চক্কর । চাকতিটা ওঠায়, টেল। কোথায় চক্কর ভাবতে ভাবতে লালবাড়ি, নীলগাড়ি আর সাদা পোষাকের কাঁধে সিপি লেখা বাড়িটায় ঢুকে পড়ে। বিশাল চত্বরটা যে এত বড় কখনও চেয়ে দেখে নি। সবাই বলে পুলিশে বাঘের ডবল ঘা। নাম না জানলেও রুদ্রপ্রসাদের ভগ্নীপতিকে খুঁজে বের করতে অসুবিধা হলো না। মি. চৌধুরী না বললেও চলতো, ওসি আর্মসই যথেষ্ট। টেবিলের উপর নাম দেখে মনে পড়লো এককালের নামী ফুটবলার ছিলেন ভদ্রলোক। রুদ্রর কবিতা নিয়ে কৌতুক করলেন কিছুক্ষণ। আধুনিক কবিতা নিয়ে হাসাহাসি হলো, স্মৃতি হাতড়ে নমুনাও একটা শোনালেন-কায়রোর আকাশে সূর্য্যমুখী ফুল আর কবিতার বাক্সে দামাস্কাসের কুল। হাসতে-হাসতে চা খেয়ে বলতে পারল, --তাড়া আছে, আসবেন একদিন। বেরিয়ে এসে

অবাক হলো,এই কাণ্ডটার মানে হয়। তবু তো ভদ্রলোক বললেন--কোন প্রবলেম হলে বলবেন। সেই ওপেন করতে পারলনা। ফুড প্যাকেট নিয়ে হেঁটে হেঁটে ভীম নাগের দোকান থেকে ট্যাক্সি ধরল। জলভরা তালশাঁস আর আশুভোগ কুড়িটা করে কেনা হলো অনুরাধার কথা মতো, জুয়া জেতা ফান্ড থেকে।

সন্ধ্যা পাঁচটায় দরজা খুলেই গান জুড়লো দুই ক্ষুদে সায়গল--'বল বেবি বল'। কমলকুমারের দুই বাবা। গানের উদ্দেশ্য তাদের পিতা নয়, বাপের হাতের প্যাকেট । রক এন্ড রোলকে হা থামিয়ে ছোঁ মেরে দখল নিল হাসিমুখ শিকারী অনুরাধা । পরখ করে তাপসীদিদিকে বলল,--তোমার প্রতীক্ষার অবসান হলো দিদি, এতসব মন্দ কথা বললে রাতে, তবু দেখ ভাইটি তোমার কেমন মনে রেখেছে দিদিকে। দামি দোকানের প্যাকেট, শুদু দিদির জন্য নাকি গো, আমরা বাদ? কমলকুমার অনুরাধার মতিগতি বুঝতে পারে না, উদরম্ভরি এই কুতকুতে মহিলাকে এত খাতির কেন করছে। তবু অনুমোদন জানায় হাসিমুখেই-সবার জন্যই আছে, দিদিকে দাও না। পর্সিলিনের ডিসে ম ম গন্ধ ছড়ানো বিরিয়ানি আর মাটির ভাঁড়ের একঠেঙে পাখিটা কোঁক শব্দে চিৎপাত হয় পাত্রে। শূন্যদৃষ্টি কমলকুমার আর ছেলেদুটোর মায়াবী চোখের দুঃখ যেন চেঁচিয়ে বলে 'মা, আমরা?' মুখ ফোটে না। পাওয়ারফুল এক স্টেইন ডাইজেস্টারে দাগহীন দৃষ্টিতে পিসিকে দেখে। অভিমানী বাপকে সান্ত্বনা দেয় মাধবাচার্য ও তার ভাই। কমলকুমার দেখে কালোজমির লাল পাড় শাড়িতে অপরূপা তার স্ত্রীকে । ভাবে, কেমন মা? দিদি রেলিশ্ড সান্ধ্য আহারের পর অনুরাধাকে ইশারায় ডাকে। ভীম নাগের দুইকুড়ি সন্দেশ প্লাস্টিকে ঝুলিয়ে অনুরাধা নিষ্ক্রান্ত হয় কমলকুমারকে চোখের অনুনয় জানিয়ে।

নগরজীবনের দুর্লভ পাওয়া তার ভোর। ভোরের সূর্য কোন হাইরাইজের ব্যলকনিতে হাজিরা দিয়ে কখন যে মধ্যগগনের ডিউটিতে চলে যায়, সবসময় দেখাও হয় না । দৈনন্দিনতার রুক্ষতা কোলাহলহীন, ঘামপচা,ধূলোওড়া পথঘাটের প্রসাধনহীন শান্তশ্রী একটু সময়ের জন্য হলেও সুলভ হয় । একটুর পর সবাই, দোকানি, ফিরিওলা, রিক্সাচালক, অফিসবাবুদের মেজাজ রুক্ষতায় তিরিক্ষে হবে। একটু আগে, সেইসব মানুষের সতেজ প্রফুল্ল নির্ভাবন চিত্তভ্রমণই কমলকুমারের প্রভাতী পাওয়া। মানুষ বাড়ার সাথেসাথে যোদ্ধা মানসিকতা বাড়ে । কমলকুমার তাই প্রত্যুষের শুরুর সময়টা এগিয়ে রাখে, আলো ফোটার আগেই জেগে যায়। হারানো দেশবাড়ির স্নিগ্ধতা নিয়েই যে তার সারাদিনের চলাচল। বিষন্ন তিনদিনের সামান্য ক্ষতি পুষিয়ে দিতেই হয়তো পঞ্চম দিনের ভোরে অনুরাধাও তার সঙ্গী হল। চারদিন চট্‌কা ভেঙে না উঠলেও দেখেছে অনুরাধার প্রভাত আসে সিংহবাহনে । সিংহভবনের যে কোন শব্দেই অনুরাধা সচকিত হয়। কমলকুমার ভেবেছিল মোটামহিলাকে নিয়ে আদিখ্যেতার অনুতাপেই হয়তো ঘুম ভাঙল। অফিস ফেরতা কাজের ফিরিস্তি দিয়ে প্রভাত বর্ণালি থেকে অনুরাধা সব রঙ মুছে দেয়। জীবনের রঙ যে এখন মাত্র কালোসাদাতেই অবশিষ্ট রয়েছে জানিয়ে দেয় কমলকুমারের দুর্বোধ্য স্ত্রী।

দুধের লাইনে দাঁড়িয়ে চৈতালী বাড়ির বান্টু বলল—কাকু, শঙ্করদাকে কেসটা বলেছি। জগদ্ধাত্রী পুজোর পর মিটিয়ে দেবে বলেছে।

ঠিক আছে ভাই, তোমরা পাড়ার ছেলেরা আছ বলেই ভরসা, আমরা তো নতুন মানুষ।

কাকু একটা ফিস্টি খাইয়ে দিন না পাড়ার ছেলেদের। কার্তিক পুজোর দিন বেস্ট হবে। কমলকুমার সচকিতহয়, এক উৎপাত সামাল দিতে অন্য ফ্যাচাংএ জড়ানো।

আমাদের বাড়িতে তো পুজো আচ্চার পাটই নেই ভাই। তাও ওরা বলে পুজোর বাসিফুল নিচে ফেলি। দেখো ভাই আমি অশান্তি চাই না, ছেলেটা ক্ষমা চেয়ে নিক্,কাঁচ লাগিয়ে দিক। ব্যস্। তোমাদেরকেও খাইয়ে দেব ফিস্টি। শেষ কথাটা বলে না কমলকুমার। অন্যসময় বলবে বলে রেখে দেয়।

নড়ছে দেখে চারাপোনা কিনছিল রাজা, --আড়াইশো দিও। বাজারি সৌজন্যের ভাষায় কমলকুমারকে জড়ায়--সরকারের এই কৃতিত্বটা কিছুতেই খাটো করে দেখা যায় না দাদা। মাছের দাম দশ বৎসর থেকে একই জায়গায় রয়েছে। বলুন? কমলকুমারকে বলতেই হলো--হ্যাঁ, চারাপোনা আর তেলাপিয়ার দাম। তা, তোমাকে আর দেখা যাচ্ছে না কেন, ছেলেদের কাছে তো বাংলা সিরিয়াল মানেই রাজাকাকু। অনেকদিন দেখছি না?

না ছেড়ে দিলাম, এবার সিনেমায় নামছি, মৃণালদার ছবিতে। পাড়ার মস্তান টিভিতেও মস্তানের পার্ট করে, চাকরিবাকরি নেই, উঞ্ছবৃত্তি সম্বল,এখন কিছুই নেই হাতে, তাই মৃণালদা। কানের কাছে মুখ এনে বলল রাজা, দাদা মিটল? থানায় গিয়েছিলেন? শুনলাম বৌদি নাকি গালিগালাজ করেছেন, মায়ের অপমান সহ্য করতে না পেরে ছেলে ঢিল ছুঁড়েছে।

শুনেছ? মাতৃভক্ত? আরো কি বলেছে জানো? আমি প্রতিদিন জানালা দিয়ে অ্যাশট্রে ঝাড়ি, জ্বলন্ত সিগারেট ছুঁড়ে ফেলি। তুমি কি বলো? এসবেরও জবাব দিতে হবে? কথা না বাড়িয়ে চলে এলো কমলকুমার। মাস্তান ছেলে, রাগ দেখিয়ে চলে আসাটা কী ঠিক হলো? এই ছেলেটি সিগারেট হাতে ঢুকেছিল বলে, ঘরে ঢুকতে দেয় নি, বাইরে ফেলে এসেছিল। কমলকুমার নিজে সিগারেট খায় না, তার বাড়িতেও কাউকে খেতে দেয় না। কমলকুমার যতই পাঁচদিনের ঘটনা থেকে দূরে থাকতে চাইছে, মানুষ তাকে থাকতে দেবে না। মার খাওয়া হেরোর মতো সবাই অনুকম্পা দেখাচ্ছে। অফিসে এতদিন কাউকে কিছু বলেনি, সুবোধকে আজ অল্পকথায় জানায়। সুবোধ ওকে ধমকায়, এতদিন বলিস নি কেন? তোদের থানার সেকেন্ড অফিসার তো আমাদের পাড়ার লোক। খুব মাই ডিয়ার।

তাই!

নয়তো এমনি বলছি? দাঁড়া, তোর কেসটা একটু ডিটেলসে আমাকে লিখে দিস তো। আজই। ভট্চাযদাকে দিয়ে দেব। ও নিয়ে তুই ভাবিস না, ব্যাটাকে কড়কে দেয়া যাবে। তোদের সিঙি মালটি কোন অফিসে কাজ করে রে? কমলকুমার উদ্ধারকর্তা বন্ধুকে সব জানায়।

বাঃ ফাইন। নাম আর ডিপার্টমেন্টটাও দিয়ে দিস। বড়দা লোক পাঠিয়ে দাবড়ে দেবে। সিবিআইতে আছে কি করতে! এই তো মাত্র ব্যাপার। বাঘের বাচ্চার মতো থাকবি। সিঙি হয়েছে তো কি হয়েছে! আমি একটু ঘুরে আসছি, পিজিতে একজন পেশেন্ট দেখতে যেতে হবে। রিলেটিভ। ক্যাশ বইটা লিখে রাখিস।

অফিসের কাজ মাথায় উঠল, বাংলায় পুরো ঘটনার আদ্যোপান্ত লিখে রেডি করে রাখল কমলকুমার। সুবোধ ফিরলই না পাঁচটা পর্য্যন্ত। আশার আলো দেখিয়েছিল সুবোধ। ভেবেছিল,

যাক্‌, এবার সমাধান হলো। শহুরে ঘড়েল এরকমই হয়। ওর দুর্বলতা ভাঙিয়ে সারাদিনের ছুটি ম্যানেজ হলো। পাঁচটার পর বিষন্ন মনে রুদ্রর বাড়ি গেল।

কি খবর স্যার। 'আমার জীবন কথা' বেরোনোর খবর পেলেন? বেরিয়েছে প্রথম খন্ড? শতবার্ষিকী কমিটির সভাপতি খুব কাজের মানুষ, বলুন? বলে, কমলকুমার নিজেই ঘুরিয়ে নেয় কথা, আপনার শরীর কেমন ? আবার মোরায়, রুদ্রকে একটাও কথা বলার অবকাশ দেয়া না, কেমন অস্থিরতা । সহকর্মীর শর্বতার শিক্ষা সে এক স্কুলশিক্ষক রুশ কমিটিকে দিতে চায় । আবার অন্যকথা

ভাল লাগছে না মশাই এদেশ । আমরা মফঃস্বলি মানুষ, বিদেশি । মহানগরের জীবন আমাদের নয় । চলেই যাব আমার বরাক পারের শান্তির স্বদেশে। এখানে এসে লাভ হলো, আপনাদের সাথে পরিচয় হলো। এখানে থাকলে, বাঙালি জাতির গর্ব আমার মুছে যাবে। আপনারা কবি লেখকরা একটি অতি সাধারণ জাতিকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলেছেন যে, কয় বৎসরের বসবাসে স্বপ্ন ভাঙল। নমস্কার । নাটকীয় প্রস্থান নেয় কবির আবাস থেকে। এই একটা জায়গায় তার পরাক্রম দেখাতে পারল কমলকুমার।

ফেরার পথে বাগমারী কবরখানায় নামল। হল্‌দিরাম থেকে শুকনো মিষ্টির একটা গিফ্‌ট প্যাকেট কিনল দেড়শো টাকায় । ফিরিস্তি মিলিয়ে কেনা হলো অনুরাধার ফান্ড থেকে। ছেলে দুটোর জন্য আড়াইশো গ্রামের ক্যাসারোল ধোকলাও কিনল একটা । না খুলেও দর্শনধারী গিফট প্যাকেট পছন্দ হলো অনুরাধার। সাড়ে ছটায় প্যাকেট বুকে জড়িয়ে বেরিয়ে পড়ল আকাশনীল চুড়িদার স্যুটে কমলকুমারের দীর্ঘাঙ্গী রূপসী বৌ। রাধা ভাবির কণ্ঠস্বর আর অনুরাধার পদশব্দ আবার দরজায় থমকায়। অনুরাধা ঘরে ফেরে, আড়াইশো গ্রামের শিশুভোগ ক্যাসারোল নিয়ে ডাকাতে পদক্ষেপে বেরিয়েও যায়।

তিন তিনটে হারিয়ে-যাওয়া ভোরের মতো পাঁচের পিঠে ছয়তম ভোরও এলো দেরি করে। কমলকুমার উঠায়নি তাই ছেলে দুটোও ঘুমে, অনুরাধা যথারীতি অনেক আগেই উঠেছে। খোশমেজাজের গুনগুনানো শুনে কমলকুমারের বিভ্রান্তি বাড়ে। কি যে হয়ে গেল ছয়দিনে, সবকিছুই পাল্টে গেল, নিজের বৌকেও চিনতে পারছে না। ভোর ছটা মানে অনেক বেলা। কিছু একটা করতে হয়। অনুরাধাকে উপেক্ষা করে সোজা বাথরুমে ঢুকে যায়।

ছটাকুড়ির কল্যাণী লোকাল চেপে আটটায় ঘোষপাড়া নিত্যানন্দ পালের বাড়ি পৌঁছে যায়। পঞ্চাশ মধ্য পঞ্চাশের দম্পতি পালেদের গেরস্থালি বলতে নশো বর্গফুটের এক কুটির। ঢালাইছাদের ছোট্ট বাড়ির তিনদিকে শন ছাওয়া বারান্দা। বাঁশ কখানা আর ক আঁটি শন বেঁধে দিলে একটা গাড়ি বারান্দাও হয়ে যায়। বিজ্ঞাপনে এতকথা লেখা ছিল না। এত সুন্দর! পনের কাঠা জমির উপর বাড়ি। সামনে কম, পিছনে বিশাল। যেন সোনাডাঙার মাঠ। মাঠের শেষে ছোটমতো একখানা ঠাকুরঝি পুকুর। পুকুরের পাড়ে সজনে, বাতাবী, আমলকি ফুল অজস্র। ক্ষীণ কিন্তু দীর্ঘদেহী সুপুরিগাছের সঙ্গে জলপাই, করমচা গন্ধলেবুর গাছও পুকুরের মিতালিতে জড়িয়ে আছে। পুকুর থেকে রান্নাঘর অব্দি আদুরে ফুলকপির সারি। গাছের জঙ্গল নেই, আবার গাছ, পাখি, জল, মাছ সবই রয়েছে। আটকাঠা জমিজুড়ে শুধু ঘাসের কার্পেট। ছেলেদুটোর জন্য পুকুরপার বরাবর তারের বেড়া দিতে হবে।

ছেলেপুলে ছাড়া ফল ফুল পাখি সংসারে সারাদিন একা থেকে থেকে মহিলা অবসাদে ভুগছেন তাই, লোকালয় চাইছেন তারা। সল্টলেক বা আশেপাশের বাড়ি অর্থ বা ফ্ল্যাটের সঙ্গে পাল্টাতে চান। কমলকুমার চাইছে একান্ত, একামানুষরা চাইছে লোকালয়। নিত্যবাবু শিক্ষকতা করেন ব্যারাকপুরে। বাড়ি দেখতে এসে এক নতুন স্বজন সম্পর্কে জড়িয়ে যায় কমলকুমার। বরাকপারের আত্মীয়তায় আপ্লুত হওয়া পরিবেশ যেন। থলেভর্তি ফলসব্জির সঙ্গে বেল, জুঁই, কাঞ্চনফুলের ছোট ঝুড়িটি নিয়ে মনোসুখে বাড়ি ফেরে দুপুর দুটোয়।

শনিবার দুপুরে কমলকুমারের চিত্তপ্রসাদ অনুরাধাকেও স্বাভাবিক পুলকে ফিরে পায়। দুদিনের বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত মন খুশির আবেগে টগবগিয়ে ওঠে। কল্যানী সমাচার জানাতে উন্মুখহয় কমলকুমার, বৌকে না জানিয়ে কিছুই করা যাবে না। বৌ এর সঙ্গে আজ তার বড় প্রয়োজন, সুখ সইতে সুনু মুনুকেও ঘুম ভাঙিয়ে জানাতে হবে এ তুমুল সমাচার। পরিবারের সম্মতি ছাড়া কিছুই করা যাবে না। ছয়দিনের ঝড়ঝাপটার পর রোদ উজ্জ্বল কমলকুমার এর খুশির বেলুনটা আবার চুপ্‌সে দিল অনুরাধাই। অর্থ এবং ফর্দ নিয়ে বেরোতে হবে এবার, গন্তব্য শ্যামবাজার।

সংক্ষুব্ধ চিত্তে ইউনিয়ন অফিসেই ধাওয়া করে। দুতিনদিন ধরেই ঘুরে যাচ্ছে শান্তিদার সঙ্গে দেখা হচ্ছে না। জি. এস এর ইউনিয়ন অফিসে আসার সময় হয় নি এখনও। সময় কাটানোর উপায় হলো একটু। অনুরাধাকে নিয়ে ভাবার সময় হলো। ছতলার জানালা দিয়ে লালদীঘিটা যে এত সুন্দর দেখায়, চেয়ে দেখে নি কখনও। কল্যাণী চলে গেলে তো কলকাতা বেড়াতে আসার শহর হয়ে যাবে। অফিস সেরেই দৌড়। দৌড়ে শিয়ালদা ইসটিশন। উল্টোডাঙা, দমদম, ইছাপুর, নৈহাটি, কল্যাণী, ঘোষপাড়া। তবু তো নিজের বাড়ি, জল, মাটি, ঘাস। এখন ফ্ল্যাটবাড়ি সুখনীড় আর কল্যাণী পঞ্চবটীর ব্যবধান শুধু অনুরাধা। তার কুললক্ষ্মী। এক যুগের দাম্পত্যে অপ্রিয় হওয়ার মতো, মনের মিল না হওয়ার মতো কোন কাজই করে নি কেউ। আজকেই শুধু পারল না। তিন দিনের বিসঙ্গতি সয়ে অনুরাধাকে অনুপম সামাল দিতে পারে না। অনুরাধার প্রতিরোধে ভেসে গেল। মন খুলে খুশির খবর জানানো হলো না। ভুল হলো। গিয়েই জানিয়ে দেবে। তারই তো বৌ, কোন ব্যাপারই না। অনুরাধাকে কনভিন্স করানো যাবে। কল্যাণীর বাড়িটা যখন হয়েই গেল, বদলির দরখাস্তটা এবার উইথড্র করে নিতে হবে। আবার কিছুদিনের জন্য না হয় যেমন আছে থেকেই গেল। জেনারেল সেক্রেটারিকে বলবে। শান্তিদা বলেছিল, উত্তরপূর্বাঞ্চলে ইনসেনটিভ দিয়েও লোক পাঠানো যায় না। তার পছন্দমত বরাকপারের যেকোন জায়গায়ই হয়ে যাবে। জি.এস শান্তি বর্দ্ধন এসেই তার বাঁধা ছক পালটে দিলেন। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে বদলির অর্ডার করানো গেছে। এ কি করে সম্ভব! হতভম্ব কমলকুমার ভাবতেই পারে না, মাত্র পাঁচ দিনে একটা ইন্টারস্টেট ট্রান্সফার রেডি হয়ে যেতে পারে! --শান্তিদা, অর্ডারটা ক্যানসেল করানো যায় না, অন্তত কিছুদিনের জন্য? ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলতে পারলে উপর্যুপরি বিপন্নতা সামাল দিতে পারতো কমলকুমার। আশ্বাসের আভাসও দিতে পারলেন না শান্তিদা। বিস্তর বকাবকি খেয়ে বিকেল সাড়ে পাঁচটায় শ্যামবাজার পৌঁছল। চিত্তরঞ্জন ঘোষের রসগোল্লা একহাঁড়ি কিনে বাড়ি ফিরল সাতটায়। নিতান্তই আটপৌর রাজকমল শাড়িতে হাতবদলের হাঁড়িটা নিয়ে বেরিয়ে গেল কমলকুমারের ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট, নামে ছোট বৌ অনুরাধা।

অনুরাধা যখন ফিরল, আজকের, সকাল থেকে সন্ধ্যের তালগোল পাকানো খবরের কোনটা বলবে আর বলবে না ভাবতে ভাবতে কোনটাই বলে না। অন্য কথায় যায়,

তোমাকে বললাম বাহাদুরকে দিয়ে কাঁচটা লাগিয়ে দিতে । আমাকে দিও তো টাকা কয়েকশ, লাগিয়ে দেব কাল।

আমার কাছে টাকা কোথায়? আমরাই বা লাগাব কেন? ওরাই লাগিয়ে দেবে।

বাঃ এতগুলো টাকা দিলাম?

কত টাকা? মোট তো সাড়ে তেরশ। শ দেড়েক আছে, চারশ গেল মিষ্টিতে, তুমিই কিনলে। তিনশ তিন জোড়া সাক্ষীর, সব অটো শঙ্কর ম্যানেজ করে দিয়েছে । আমাদের যেমন ঘুম কেড়ে নিয়েছিল, এবার ওদের পালা। পুলিশকে পাঁচশ, কাল পুলিশও আসবে।

তিন

সন্ধ্যে সাতটায় কলিংবেল বাজিয়ে শ্রীমা হার্ডওয়্যারের বংশীবদন দু'ফুট বাই এক এব ঘষা কাঁচ নিয়ে ঢোকে । বাঁশির মতো শরীর, বাঁশির আওয়াজ গলায়। তীক্ষ্ণ । ছেলেটিকে দেখেই চিনতে পারে কমলকুমার। একদিন কাঁচের দরদাম করেছিল, ছেলেটি কর্মচারি । বলল,

ঋতা মেমসাব পাঠিয়ে দিলেন। কাল আসবেন, উনার সামনে লাগানো হবে।

ঋতা মেমসাব কে গো?

ঐ যে মস্ত বড় রুদ্রাক্ষের মালা পরে থাকেন, লীডার।

দশ মিনিটের মাথায় আবার কলিংবেল, আবাব বংশীবদন। আবাব সেই এক মাপেব কাঁচ। কমলকুমার অবাক, অনুরাধার মুখমন্ডলে হাসি।

আবার কে?

রায় দিদিমণি, নারী সমিতির সেক্রেটারি। বললেন, কাল আসবেন।

বললে না, একটা দিযে গেছ?

বলেছি। বললেন সে কাল দেখা যাবে।

কাল দেখা যাবে? বাঃ বেশ করিতকর্মা ছেলে তো তুমি বংশীবদন।

আমি বংশীবদন না বাবু, আমার নাম মারীচ, মারীচ চন্দ।

দশ মিনিট পর আবার বংশীবদন মারীচ আসে। একই জিনিস হাতে।

এবার কে ? পুলিশ?

না বাবু। মধুদি, মহিলা পরিষদের দিদিমণি।

দুখানা দিয়ে গেছ জেনেও পাঠালেন?

হ্যাঁ, বললেন পয়সা দেবে বলাই সিংহ, তুই দিয়ে আয়। নমস্কার বাবু, কাল সবাই আসবেন, তখন আসব। টিপ্‌রা বাঁশির ঠোঁট বাঁকানো সংলাপে মারীচ সংবাদ শেষ হয়। তিন-তিনখানা

কাগজে মোড়া কাঁচ তিনটি সদ্যোজাত শিশুর মত পাশাপাশি শুয়ে থাকে। রাতের মতো নিশ্চিন্ত নিদালিতে । দোলাচলচিত্ত কমলকুমারের জাগর দৃষ্টিতে শুধু কুয়াশা ভাঙা ভোরের প্রতীক্ষা। বাগজোলার ঘোলাজল আর ঘোষপাড়ার শান্তিবন পেরিয়ে সকল খোয়া গেল মালিনী বিলের বরই গাছটির আগে। বরাক নদীর পারে, শান্তির স্বদেশে । এখন অবকাশ শুধু পরবাসের অসফল দূতিয়ালির সমাপনে। অনুরাধার চোখের চাঞ্চল্য তাই স্পর্শ করে না কমলকুমারকে। একটা মাত্র জীবনকে টানাপোড়েনে বর্ণহীন না করে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্তই সঠিক বলে মেনে নেয়। চোখের তারায় আবার খুশি ঝিলিক দেয়। কুয়াশা ভাঙার আগেই অনুরাধাকে বলতে হবে। -- চল, ত্র্যহস্পর্শ কাটাতে যাত্রা ফিরিয়ে আসি দেশ থেকে।

অমৃতলোক, ১৯৯৫

খোঁজে লীলাবতী

প্রিয় ফুলদা,

সাদা লঙ্কার বীজ কিছু পাঠাইবেন । আপনার পাঠানো বীজে গাছ হইয়াছে অভিনব। এ ভাবা যায় না, কেহ দেখে নাই। টবের গাছে শত শত একই মাপের লঙ্কা। একই রঙে সারা বৎসর ধরিয়া ফল দিয়ে যাওয়া কল্পনা করা যায়! তবে ইদানীং দুই চারিটা করিয়া রঙবদলের ব্যাপার ঘটিতেছে। লাল হয়ে যাচ্ছে গাছ, গাছ থেকে যেন পাতা ঝরে যাচ্ছে। এমন কি হয়? আমাদের ছাদের সবকটি গাছই ফুলের। সাদা ফুল। ব্যতিক্রম আপনার পাঠানো এই সাদালঙ্কার গাছটি। প্রথমে ভেবেছিলাম শ্যালীর সঙ্গে রসিকতা কবলেন। বীজ অবশ্যই পাঠাইবেন, চারাগাছ থাকিলেও পাঠাইবেন। যতবড় প্যাকেটই হউক। ক্যুরিয়ারে পাঠাইবেন। লীলা ভাল আছে। মোহরকে দেখিতে পুরুলিয়া গিয়াছিলাম গত রবিবার। আপনাদের কুশল জানাইবেন। তমা, গুড্ডুর কলেজ বন্ধ হইলে পাঠাইয়া দিবেন। আপনি ও দিদি প্রণাম জানিবেন। বীজ, চারা বা গাছ আমার অফিসের ঠিকানায় ক্যুরিয়ারে পাঠাইবেন। ইতি-ভাস্করানন্দ শর্মা।

কাজের কথার চিঠিতে পরিবারের ক-জনের নাম এবং প্রীতিবিনিময়েব ব্যাপারটা না থাকলেই নয়। নইলে ভাস্করের এত সময় কোথায়! যত সত্বর সম্ভব পাঠাইবেন কথাটাতো কোথাও লেখা হল না। আবার খাম খুলে লিখে দিলেই হয়। না থাক। আঠা খোলা লাগানব অনেক ঝামেলা। খাম বদলাতে হবে। ফুলদা মানুষটি খুব দায়িত্ববান। লীলাবতীর প্রিয় জামাইবাবু। মালুগ্রাম মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ। ঠিকানা লিখতে লীলাকে ডাকল। শিলচর শহর এবং দিদির পাড়াকে নিয়ে একটু অনাদরের মজা করবার জন্য। মজা করতে করতে হুল ফোটানোর হুলোহুলি। নিত্যনৈমিত্তিক যেমন হয়।

ঠিকানাটা কি হবে গো? খলিহামারি না খলিয়ামারি । তোমরা মুখে বল খইল্যামারি, লিখতে অন্য। কি সব নাম রে বাবা!

নাম যেমন তেমনই। আমি লিখে দিচ্ছি দাও। খাম বন্ধ করে দিলে কেন? দু-লাইন লিখতাম।

তোমার দু-লাইন আমার দু-লাখ শেষ করে দেবে। আলাদা লেখো।

ও লঙ্কাবীজের অর্ডার পাঠিয়েছ। পারও বটে । বুজরুকিতে তোমার জুটি দুটো নেই।

ধর্মাচরণের নাম বুজরুকি হল! ভাল লাগার ফুল ফলে বুজরুকি। জিজ্ঞেস করো তোমার

প্রিয় সন্ধ্যামণিকে, নয়নতারা বা পথের কিনার থেকে কুড়িয়ে আনা অনার্য দ্রোণকে। কে না পছন্দ করে তোমার ফুলদার শ্বেতা উষণসুন্দরীকে।

ভাল লাগার অত্যাচারে বেচারি লঙ্কাগাছটাকে তো অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না। পারবে না তোমার জ্যোতিষ দিয়ে লাল ফলকে আবার সাদা করে দিতে।

পারব না বলেই তো চিঠি লিখলাম। জ্যোতিষ তো আর ম্যাজিক নয়। তোমার ভাই সম্বর রায়ের হাতের জাদুদন্ডও নয় যে, তোমার অবিশ্বাসী খোঁচাখুচিকে তাক লাগিয়ে দেবে। জ্যোতিষ অনেক বড় ব্যাপার। তমসাবৃত বিশ্ব-সংসারকে আলোকিত করতে ভগবান সূর্য আর অনন্ত নক্ষত্রমন্ডলকে নিয়েই ফলিত জ্যোতিষের মহাবিশাল চক্র। যার নাম কালপুরুষ। জন্ম-মৃত্যু, উত্থান পতনাদি সাংসারিক ক্রিয়া এই বিধাতৃচক্রের অধীন। চক্রজ্ঞান সকলের অধীন নয়। বুঝলে বুজরুকিও নয়।

ভবিষ্যৎ জেনে, জানিয়ে কি লাভ ?

এতসব ফলে যাওয়ার পরও বলবে কি লাভ ? তোমার জীবনেও তো কম হল না। ছেলের পুরুলিয়ায় ভর্তি অসম্ভব ধরে নিয়েছিলে। আমি বলিনি, ওম শিবশম্ভু! শিলচরে তোমার দিদির বাড়ি আর কোথায় বরানগর কলকাতা। শাশুড়ি মায়ের মৃত্যু সময়টা বলে দিইনি।

আশি বৎসরের মা দিদির বাড়িতে অসুস্থ। তোমার মা তো নয়, তাই নিদান দিয়েছিলে। সন্তান কখনও মৃত্যুকামনা করে না।

আমি তোমার মায়ের মৃত্যুকামনা করেছি। এত অবিশ্বাস, বিদ্বেষ! তবে বিয়ে করেছিলে কেন ?

সে তো বুজরুক জ্যোতিষীকে নয়। আদর্শবাদী এক যুবককে স্বামী মেনেছিলাম।

বুজরুক বুজরুক আর বুজরুক। আমি না হয় পড়াশুনা করে বুজরুকি শিখেছি। আমার বাবা তো তেমন লেখাপড়াও জানতেন না। গ্রামের পর গ্রাম উজিয়ে মানুষ আসত বুড়ো বুজরুকের কাছে।

বিহারের গ্রাম্য মানুষদেরে তো এইসব খাইয়েই রাখা হয়েছে। জাতপাত ধর্ম জ্যোতিষ।

তোমাদের আসানসোল থেকেও আসত।

আমার বাবা এসেছিলেন।

এসেছিলেন শুধু! আইবুড়ো মেয়ের ভাগ্য দেখাতে এসেছিলেন। তান্ত্রিক ভৃগুচরণ শর্মার বখে যাওয়া ছেলের সঙ্গে বিয়ের ইতিহাসটা একবার মনে করো। ঝাঁঝাঁর বাড়িটা আমাদের বাবার পরিচর্যায় কেমন তপোবন হয়ে থাকত। সাদা ফুলের প্রতি দুর্বলতা বাবারও ছিল। কত ফুল ছিল বাড়িটায়। কামিনী কাঞ্চন অতসী অপরাজিতা গুলঞ্চ জুঁই টগর কুন্দ আর মাধবীলতার বিতান। অন্য ফুলের মধ্যে অভিজাত তো এরাই ছিল। আমাদের পুকুরটার নামও ছিল শালুকদীঘি। সাদা শালুক।

শ্বশুর বাড়ি আর পেলাম কোথায়। তুমি তো পশ্চিম বাংলায় চলে এলে। দাও দেখি খালিহামারির চিঠি ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখি। কপট মোহিনী হাসি ছড়িয়ে নিচে যায় লীলাবতী।

দুই

ফিরে এসে মনোভার লাঘব করতে মোজাইকে বাঁধানো গোল জলাধারের পাশে বসে। পশ্চিমে দাদুর বাড়ির পুকুর দেখেছে মিহির। শৈশবের অনেক চাহিদার মধ্যে কলকাতার বাড়িতেও শালুকদীঘির অসম্ভব চাওয়াকে রূপ দিতে গড়ে উঠেছে তাদের এগারশ বর্গ ফুটের শূন্যোদ্যান ও জলাশয়। শালুকদীঘির জলে আলতো ঢিল ছুঁড়ে লীলাবতী নিজেই জলতল সমান করে দেয়। মনের অতলে অভিমান রুদ্ধ করে রাখে। লীলা জানে ভাস্করকে যতক্ষণ রাগাবে ততক্ষণই রাগ। আসলে এসব টুকটাক হল তার প্রাত্যহিকতা। অফিস থেকে ফিরে টবের, টিনের, হাঁড়ির ফুলগাছ আর একটি সাদা লঙ্কার গাছ পরিচর্যার ফাঁকে ছাদের চিলেকোঠায় বসে চিঠি-ফিটি লেখা যেমন। অনেকে তো চিঠিতে ড্রাফট পাঠায়। বিশাল বিশাল দুঃখের চিঠিতে জ্যোতিষের করার কিছুই থাকে না। সমাধানের বিশেষ কিছু উপায় আছে ভাস্করের। সরাসরি হ্যাঁ বা না করায় অপ্রমাণিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে বলে মাঝামাঝিতে আশাবাদী থাকে জবাব। প্রত্যয়ী সত্যকে না যেমন করে না, না কে জানায় খুব কম। এক-ফাঁকে লীলাবতীকে উসকানো, চটানো তাতানোর খেলাও তেমন নিয়মে বাঁধা মনোসুখ সওয়া বা ভার লাঘব করা। বৈশাখের সন্ধ্যা,দিনকে হাত নেড়ে বিদায় নিতে দেরি হয়ে যায়। সারাদিনের তাত সওয়া এই দেরির সময়টুকুই বড় সুখের। বৃষ্টি যখন হলই না লীলার সঙ্গে একপশলা ঝগড়া শেষে চেয়ার নিয়ে দু-জনে বসল শালুকদীঘির পাড়ে পা তুলে । দুই গ্লাস বেলের সরবৎ দু-জনের হাতে । স্বাস্থ্যরক্ষার খেয়ালে চায়ের নেশা নেই কারোরই । মনের কপাট খুলে আবার অভিমানরুদ্ধ হয় লীলার কণ্ঠস্বর।

তোমার সঙ্গে মজা করলাম, তুমি বাবাকে টেনে আনলে।

আমার খুব রাগ হয় জানো। যে জিনিস বিনিপয়সায় বিতরণ করার কথা, দুটো পয়সা নিয়েই না হয় করি। এর জন্য একটা অপরাধবোধ তো আছেই। তার উপর তোমার কথাব হুল। হ্যাঁ, বুজরুকি করি বৈ কী। সাদাফুলে পূজা করি সাদা মনে । ওম শিবশম্ভু! যার পূজা যে ফুলে।

সাদা ফুল বুঝি, সাদা লঙ্কা?

আরে বাবা ঐ কথাই তো বলছি। ওটা বুজরুকি । প্রথমে বুঝতে পারিনি যে ওরকম লেগে যাবে । বীরেনদাকে দেখতে দিয়েছিলাম আশ্চর্য বস্তু। প্রসাদী ফুলের সঙ্গে।

বীরেনদার দৌলতে তোমার এত এত শাঁসালো মক্কেল। প্রমোশনের আশায় বসে থাকা জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের এস ডি ও বীরেন্দ্রসদয় দত্তর ভাগ্যকেতাক লাগিয়েই না ভাস্করানন্দ শর্মার এত নাম ডাক ! তান্ত্রিক, জ্যোতিষ রত্নাকর!

বীরেনদা প্রচারে নিয়ে গেল। মন্দ হল না কি বল! এক বৎসরে কম হল না!

হাত দেখা পাথর দেওয়া ওসবে কিছু হয় না জান। বিফলে মূল্য ফেরৎ লিখে দেখ লাইন লেগে যাবে। যা নিয়েছিলে সব ফিরিয়ে দিতে হবে।

ভবিষ্যৎবাণী আমার নির্ভুল। কি করে হয় জানি না।

তুমি তো কিছুই বল না। হতেও পারে নাও হতে পারে । তবে পাথরের ব্যবসায় তোমার হেভি প্রফিট।

প্রফিট যেন আমার একার, তোমরা কেউ না।

না করেছি নাকি।

যাক না-করনি আমার ভাগ্যি।

তোমার ভাগ্যি, না তোমার বাপের ভাগ্যি। ওরকম বড় মাপের মানুষ দু-জন হয় না। ভবিষ্যৎ বলাটা ওনার বিশ্বাসের ব্যাপার ছিল। লাভের আশায় করতেন না।

আমি তখম ঝাঁঝাঁয়, বেকার যুবক। নক্সালবাড়ি, কানু সান্ন্যাল, অসীম চ্যাটার্জির নাম ও শিক্ষা পন্ডিত ভৃগুচরণ শর্মাকেও শ্রেণীশত্রু চিহ্নিত করেছে। বাবা তো বাবা! বিহারের এক টুলো পন্ডিত । বিদ্যাসাগরেরই মুন্ডুপাত করেছি কলকাতায়।

তুমি কিন্তু আউটলাইন হয়ে নিজের কথায় চলে যাচ্ছ।

তাই? শিমূলতলা থেকে এক গাট্টাগোট্টা হনুমানজির শিষ্য রামশরণ সিংহ বাবার কাছে শরণ চাইতে এল। শিমূলতলা ঝাঁঝাঁ খুব দূর নয়। দুটো স্টেশন । ঠাকুর রামশরণের লেবু আটকানো গোঁফ জোড়ার ন্যাতনেতে মালিন্য তার দুর্ভাগ্যের সঙ্গী হয়ে বাবার পায়ে লুটিয়ে পড়ল। বউ-এর সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছে । বশীকরণ তাবিজ চাই।

আমার বাবা যেটা নিয়ে গিয়েছিলেন?

আজ্ঞে না, আমার বাবা কাউকে কোনো তাবিজ দেননি কখনও।

তাহলে আমি?

তুমি বশ হলে তো কথাই ছিল না। কথাটা শেষ করতে দাও না। বাবা লোকটাকে ধমকালেন না, বসতেও বললেন না । তক্ষুণি বাড়ি ফিরে যাওয়ার আদেশ দিলেন। কি করে যায়, সকাল নটার ট্রেনে এসেছে। ফেরার কিছু নেই। আমার সাইকেলটা দিয়ে দিতে বললেন। লজঝড়ে আধাভাঙা সাইকেল নিয়ে লোকটা গেল। গিয়ে কি দেখল জান?

জানি বাবা জানি অনেকবার বলেছ । বউকে গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যার হাত থেকে রক্ষা করতে পেরেছিল।

শুধু কি তাই । স্বামী-স্ত্রীতে ভাঙা সাইকেলটা ফেরত দিতে এসেছিল নতুন একটা সাইকেল সহ । পন্ডিতজিকে সেবা লাগে বলে বাবাকে কত অনুনয় করল। বাবা নিলেন না। কি করে যে হয় বলো। সেই লোকেরই ছেলে আমি। দেখতে পাই। ওম শিবশম্ভু! আমিও সব দেখতে পাই।

হুঁ। ভাস্কর লীলার অবজ্ঞায় মর্মাহিত হয়। লীলার অবিশ্বাস আর অবহেলার মূল এত দৃঢ় প্রোথিত! স্বামী বলে একটু সয়েও তো নিতে পারে। না, সইবে কেন, নারীর গোঁ যে। ভগবান শম্ভুকেও মান্য করেনি ছিন্নমস্তা ধূমাবতীরা। দশদিক ঘিরে অ্যাটাক করেছে।

তিন

শম্ভুঠাকুরের সেবক ভাস্করানন্দ মনকে শান্ত করতে চোখ বন্ধ করে। ওম শিবশম্ভু! তার চোখে তখন মাধবীলতা আর নয়নতারার শুভ্র দৃষ্টির ঝলক । নিমেষেই মন থেকে রোষের সব বিকার উধাও হয়। হাসিমুখে তাকায় লীলাবতী দেবীর অধীর দৃষ্টিতে। বশীকরণ তাবিজ মাদুলি প্রার্থীদের দিকে যেমন তাকায়।

বিশ্বাস হচ্ছে না? ঠিক আছে। ঐ যে দু-জন লোক যাচ্ছে দেখে রাখ। রিমিদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছে। দু-জন দু-রকম। কেউ কাউকে চেনে না। আমিও চিনি না। একজনের হাইট পাঁচফুট ছয় হবে, অন্যজন ধুতি পরা প্রায় ছয়ের কাছাকাছি। ধুতি পরা ঢ্যাঙা বলে আরো দীর্ঘ লাগছে। বিচ্ছিরি দেখতে। নামের আদ্যাক্ষরও বলে দিতে পারি। সুপুরুষ প্যান্ট সার্টের 'র' অন্যজনের 'তালব্য শ'। ব্যাকব্রাশ করা আর দু-পাশে চিরুনি করা লোক দু-জনই এক দুর্ভাগ্যের শিকার হতে যাচ্ছে। একজন খুন হবে আজ।

খুন! একেবারেই খুন?

গোদা লোকটিকে দেখ, গলির পাশে আড়াল হয়ে গেল। খুন করবে আজ তার বউকে।

আবার খুন! তুমি আজকাল খুব কনফিডেন্ট। দিনকে রাত করে দিচ্ছ। তোমার তন্ত্র এত অ্যাফেক্টিভ যে পথচারী দু-জনকেও ভাগ্যহত করে ফেলল!

বিশ্বাস হল না? কালকের কাগজ দেখে নিও, খবর হয়ে বেরোবে, যেমন বেরোয় প্রতিদিন। বিশ্বাস করে লীলা। মহাদেবের কৃপায় আমি দেখতে পাই। আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার ভাই সম্বর আসানসোল থেকে পুরুলিয়া গেছে। পুরুলিয়া থেকে কলকাতা আসছে আজই। সরাসরি। দেখে নিও লীলাবতী ভাই-এর বোন ভাগ্যবতী।

এখন তো কোনো ট্রেন নেই। তুমি উত্তেজিত হয়ে পড়ছ কেন। তবে র এবং তালব্য শ এর গল্পটা তো জমল না। হঠাৎ কেন খুন হবে দু-দুটো মানুষ। কি কারণ? ঝিকে মেরে বউকে শিক্ষা?

কারণ র-য়ের বউ তোমার মতো ঝগড়ুটে, রাগ উঠলে হিতাহিত অজ্ঞান হয়ে যায়। গ্রামের মানুষ তো, চেলাকাঠ দিয়ে পিটিয়ে মারবে। না, না ওম শিবশম্ভু! খামচে খামচে মারবে, তুমি যেমন করো।

বাঃ। আর তালব্য শ? ঢেঙা লোকটা তোমার মতো বেঁটে নয় যে কথা দিয়ে বউ মারবে।

হোক না লম্বা। তালব্য শ লোকটা আমার মতো অনেকটা। বউ আবার তোমার মতো, খুব রাগী, ঝগড়ুটে। স্বামীকে কেয়ার করে না। হেয় করে যায়। স্বামীর কৃতিত্বকে খাটো করায় নজর। আজ লোকটা প্রমোশন পেয়েছে। দেখলে না কেমন খুশি খুশি মুখ।

এত সব দেখতে পেয়েছ ছাদের উপর থেকে।

আমি কি আর দেখেছি। শম্ভু ঠাকুরের চোখ সব নজর রাখছে। দেখ তোমার শালুকদীঘির চোখও কেমন চেয়ে আছে। কত আর সহ্য করবে বল! বেচারী স্বামী ছাদের উপর থেকে বউকে মারবে এক রাম ধাক্কা।

ছাদের উপর শালুকদীঘির জলে পুঁটি মাছ দুটোর ছোটাছুটি দেখছিল লীলা। শাপলা পাতার ফাঁকে রূপালি আভাস ছেড়ে হড়কে হড়কে ভাসছিল। পুঁটি মাছকে রোজি বার্ব বলে ঠকিয়েছে এন্টালির মাছওয়ালা। জেব্রা ফিশ দুটো বেঁচে আছে মন্দ না। আরো কি কি মাছ এনেছিল গোল্ড ফিশ, অ্যাঞ্জেল, সানফিশ ক্লাউড। কিছুই বাঁচল না। বদ্ধ অ্যাকুয়্যারিয়াম ছাড়া নাকি বাঁচে না। মিহিরের পোষা দাঁড়কিনা আর কুচো চিংড়ি কটাও বেঁচে আছে শাপলাপাতার ফাঁকে। ছাদের বাগানে জলাশয়ের প্ল্যান ও নামকরণই শুধু বেটার। জলবদল পরিচর্যার ভার লীলার। পুঁটিমাছ

একটাকে হাতে তুলে স্বগত চেঁচিয়েই বলে—তুমি পারতে না। মাছটাকে শক্ত মুঠোয় ধরে আবার ছেড়ে দেয় জলে।

চার

রাত সাড়ে নটায় খেতে বসে ভাস্কর। রাতের আহার তার অপরিমিত। রুটি ফুটি চলে না। মাছ মাংস ডিম নিরিমিষ যত পদ দাও না নেই। লীলাকে বলল, দশ মিনিট অপেক্ষা করে ভাত দিতে। সম্বর এল পাঁচ মিনিটের মাথায়। লীলা চমকায় না। তার বাউন্ডুলে ভাইকে সে চেনে। উঠল বাই তো তমলুক যাই।

কী রে, কী করে এলি? এখন তো কোনো ট্রেন নেই।

নেই। ট্যাক্সি একটা পেয়ে গেলাম। অনেক টাকা নিল। তোকে দেখতে নয় জানাতে এলাম।

কি জানাবে? বিয়ে করছ নাকি? ম্যাজিসিয়ানের বিয়ে, ভোজবাজি নয় তো?

আরে না রে বাবা। আপনার ছেলের লেটেস্ট কীর্তি জানাতে এলাম।

আমার ছেলে তো তোমার ভাগ্নে।

আমার ভাগ্নের কার্যকলাপে আমি গর্বিত ভাস্করদা।

হেঁয়ালি রেখে আসল কথাটা বল তো শালাবাবু। লেটেস্ট কীর্তি আবার গর্বেরও ব্যাপার। কি হয়েছে খুলে বল।

অতীত ভবিষ্যৎ যার নখাগ্রে তারও উদ্বিগ্ন কৌতূহল? পুত্রস্নেহে সব ভেসে যায়। মিহিরকে দেখে এলাম। মহারাজরা একবাক্যে স্বীকার করেন বরাহমিহির শর্মার মতো মেধাবী ছাত্র দুটি নেই স্কুলে।

তুই হঠাৎ কেন যেতে গেলি। তোর ভগ্নীপতি খবর পাঠিয়েছিল নিশ্চয়।

মহারাজের কমপ্লেন?

হ্যাঁ কমপ্লেন বটে। পড়াশুনায় ভাল না হলে কবেই টিসি হয়ে যেত। প্রেয়ারের সময় পুত্র তোমার অসুস্থ হয়ে পড়েন। জানিস দিদি, কি সাংঘাতিক ছেলে হয়েছে। বন্ধুদেরকেও বলে বেড়ায় প্রেয়ার ফ্রেয়ার, ধর্মাচরণের অসারতা। এমন বাপের ছেলে কি করে হল !

কেমন বাপ? তুমি আমার কতটুকু জানো হে শালা! নক্সাল করতাম। বনবাদাড়ে ঘুরতাম, ছিলাম ভাল। তোমার বাপই তো এরজন্য দায়ী। ভৃগুশর্মার একমাত্র ছেলেকে বশীকরণে ভুলিয়ে সর্বনাশ করলেন। তোমার বাপের জামাই হতে গিয়েই না আমার এই দশা।

নক্সাল টার্নড তান্ত্রিক।

তান্ত্রিক না ঘোড়ার ডিম। জন্ম-মৃত্যুর হিসাব রাখা কেরানি ছিলাম বেশ। মাসে দশটাকার বঙ্গলক্ষ্মীর টিকিট কাটতাম। একবার পাঁচশ লেগেছিল নেশায় পেয়ে গেল, এখনও কাটি।

এখন তো আপনার অনেক টাকা।

এখন আমার অনেক টাকা। শুধু ফুল দিলে টাকা, ড্রাফট। সাদা ফুল। ফুলের সঙ্গে সাদালঙ্কায় মামুলি প্রণামী।

অনেক টাকা যেখানে ফোকটেই আসে, সাদালঙ্কা দিয়ে রেট কমানো কেন?

শালাবাবু হে। বিজনেস তুমি বুঝবে না। সাদালঙ্কা আমার সততার প্রতীক। তান্ত্রিক জ্যোতিষী যে সর্বশক্তিমান নয় সে কথাটাও জানানোর প্রয়োজন। তাই মাঝে মাঝে না করে দিই। সত্যজিৎ রায়েরে ছবি দেখে নি, জয় বাবা ফেলুনাথে, মছলিবাবা। আমিও তেমন সাদালঙ্কাবাবা। সাদা মরিচ যার ভাগ্যে সে হারল। ওম শিবশম্ভু! আমি তো করি না কিছুই।

বাঃ দারুণ তো! বিবেকবান তান্ত্রিক বলুন। আমাদের ওখানে এক পীর আছেন। মকা পীর। থাপ্পড় মারলে সৌভাগ্য আর আদর করলে সর্বনাশ। পীরকে উত্যক্ত করে মার খেলেই শহরের হিরো।

তুই ট্রাই করেছিলি?

ধুর, আমাকে ছুঁয়েও দেখেননি মহাপুরুষ। শোঁকাশুকি করে ছেড়ে দিলেন। নইলে কি আর এই হাল হতো।

তুইও যেমন। হাতের কাছে সৌভাগ্য ফেলে পীরের মার খেতে হত্যে দিয়ে বসে থাকিস। দেখ—

দিদি, তুই ভাস্করদাকে বড় ঠুকিস। তোর জন্যই ছেলেটা ওরকম গোঁয়ার গোবিন্দ নাস্তিক হয়েছে।

ছেড়ে দাও ভায়া। তোমার দিদির মতো আধা নাস্তিকের কাছে তো আমার শিক্ষা নয়। নক্সাল সময়ের গুরুরাও গুরু নয়। অসীমদা আমার রিয়্যাল গুরু। অসীমদা আর আমি জন্ম-মৃত্যুর হিসাব-রাখা অফিসের দুই লোয়ার ডিভিসন ক্লার্ক। কট্টর নাস্তিক। কম্যুনিস্ট। তখন থিওরিটিশিয়ান কথাটার খুব চল ছিল। অনেক পড়াশুনা। বলতেন কম্যুনিস্ট হতেও বেদাঙ্গ জানতে হয়। জ্যোতিষ জানেন।

কম্যুনিস্ট জ্যোতিষ!

দিদি!

ছাড়ো তো। ওর কথায় কান দিও না। তো দিলাম ধরিয়ে বীরেনদার কোষ্ঠী। যা যা বলেছিলেন সব বলে দিলাম। সব আশার কথা। শুধু অসীমদার শেষ কথাটা বলিনি।

সব বলেও শেষ কথা?

হ্যাঁ। তোমার দিদি যা বলে। অসীমদাও বলেছিল। জ্যোতিষকে ভিত্তিহীন বুজরুকি বলতে পারিনি। পণ্ডিত ভৃগুচরণ শর্মার একমাত্র পুত্র কি তা পারে। বরং ছাদের গাছ থেকে সাদা জবাদুটো হাতে তুলে দিয়েছিলাম। ওম্ শিবশম্ভু!

সাদা জবা?

ছাদে লাল জবাও ছিল। অন্য রঙের ফুলও ছিল। হঠাৎ একদিন দেখলাম সাদা ফুলের সংখ্যা বেড়ে গেছে। লাল হলুদগুলোকে ছাঁটাই করলাম। সবই শম্ভু ঠাকুরের ইচ্ছে।

লঙ্কা ধরলেন কেন হঠাৎ?

এই তো সেদিন । এক বৎসরও হয়নি। সে এক স্বপ্নে পাওয়া ব্যাপার। বুঝবে না। এরকম এক সাইজের মরিচ দেখেছ ভূভারতে ?

ফুলদার বাড়িতে এন্তার।

সে তো শিলচরে। ভারতের বাইরে। যাও শুয়ে পড়গে।

পাঁচ

মধ্যরাতে ছাদের আলসেয় হাত রেখে জাগল লীলাবতী। ভাস্করের বাঁ হাতটাকে জাপটে ধরে অব্যক্ত চিৎকার করে ওঠে। ছাদের কোণের বদলে বেঁটেখাটো বলিষ্ঠ মানুষটাকে দেখে স্বস্তি বোধ করে। প্রিয় মানুষটিকে দেখে তার ভয় পাওয়া মুখশ্রীতে মিষ্টি হাসির মিহিন রেখা ধীরে ধীরে জেগে ওঠে। এরকম ভয়ের স্বপ্ন কেন সে দেখল? ছাদের কোণ থেকে রাম ধাক্কা মারার কথাটা কেন বলল ভাস্কর? এত রাগ কেন মানুষটার তার উপর! 'আমিও যদি পারতাম' কথাটা কী বলেছিল সে? নইলে মাছটাকে ধরে এমন ক্ষিপ্র হল কেন তার উত্তর 'তুমি পারতে না'? কেন, কেন, কেন,? সেই সন্ধে থেকে যেন লীলা দুটো মানুষ হয়ে গেছে। আদর্শবাদী প্রিয় মানুষটার বদলে যাওয়ায় বিরক্ত হয় সে সত্য। বিজাতীয় ক্রোধে পাগলও হয়ে যায়। মানুষটাকে মারার কথা কখনও ভাবেনি সে । খামচা খামচি করেছে, যদি ওতে পালটায়। খোঁচাখুঁচির কথা বলেছে। যা বিশ্বাস করে না, অবিশ্বাসের পুজোআচ্চা, ফুল লঙ্কা এসব ছেড়ে আবার জীবনমৃত্যুর হিসাবরক্ষকের জীবনে যদি ফিরে যায়। ওদের চাহিদা নেই কিছু, একটা মাত্র ছেলে। ভাস্কর কি তবে ওকে সন্দেহ করে ? অবহেলা,অবজ্ঞা শুধু! ছাদ থেকে ফেলে দেওয়ার কথা বলল কেন? ঘুমের মধ্যে তাই পিছু হঠতে হঠতে ছাদের আলসের কাছে চলে এল। ভাস্করের বাঁ হাতের কনুইকে ছাদের কোণ ভেবে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে। জাগে এবং ঘুমঘোরে ভয়পাওয়া মুখশ্রীতে মিষ্টি হাসির মিহিন রেখা টেনে ভাস্করের মোহন মুখকান্তি নিরীক্ষণ করে । মুখেচুলেগালে ঠোঁটে আদরের হাত বুলোয়। না না এ মানুষের এত মুরোদ নেই। আর ঠেলে ফেলার জায়াগা তো তার দিব্যদৃষ্টির ছাদ। তালব্য শ আর রয়ের ভিন্ন কথা।

ছয়

দক্ষিণের ব্যালকনিতে অতসী আর অপরাজিতার মুখ চাওয়া-চাওয়ি হাসি দেখে ঘুম ভাঙে লীলার। ভাস্কর উঠেছে ঘন্টাখানেক । পুবের বলটাকে কিক অফ করিয়ে পুষ্প পরিচর্যা আর শালুকদীঘির জলে পাতিলেবুর রস ছড়িয়ে মাছের স্বাস্থ্যরক্ষার দৈনন্দিনতা সারবে লুঙ্গি সাইজের গামছা পরে। খালি গায়ে। লেবু রস ছড়িয়ে মাছের ডাক্তারি লীলার অপছন্দ। বাহারী মাছগুলি এর জন্যেই মরে গেল। ভাস্কর একবার যা বুঝেছে তাকে অবুঝ করার সাধ্য কারো নেই। সকালিক কাজকর্মের সঙ্গে চলবে বিড়বিড়ানো গুনগুনানি। কেউ বুঝবে না লীলা জানে ঠিক। ওম শিবশম্ভু ছাড়া সব ভাবনাই মন থেকে ভাগিয়ে দিয়েছে নতুন সমাজ গড়ার ভূতপূর্ব কারিগর। অপরাজিতার হাত ধরে দড়ি বাঁধা কাগজ এল ব্যালকনিতে ধুপ করে । যেমন আসে প্রতিদিন। বঙ্গলক্ষ্মীর টিকিট নিয়ে ভাস্কর নম্বর মিলিয়ে দেখল অভিনিবেশে । এবং ছিঁড়েও ফেলল নির্বিকার ভাবে। লীলার কাগজ পড়া ভাস্করের বেরিয়ে যাওয়ার পর। সাড়ে আটটায়। প্রথম পাতায় কি থাকে জানে না। শেষের পাতায় খেলা। ক্রিকেটে উৎসাহ। দুঃস্বপ্নের পর আর ঘুমই হয়নি তেমন গাঢ়।

ভেবে রেখেছিল কাগজ এলে আজ আর প্রথম ধরতে দেবে না ভাস্করকে। লোকটা কাজ করে যায় টুকিটাকি আপন মনে কিন্তু নজর ধরা থাকে 'ধুপ'-এ। কাগজ কখন পড়ে। এবং উঠিয়েও নেয় তড়িৎবেগে। লাখপতি মাটিতে গড়াগড়ি যেতে দেখেই আসে লীলা। আজকের মতো কাগজ পড়া শেষ। প্রথম পাতা থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত তন্ন তন্ন করে খুঁজল। ভাস্কর যেমন বলেছিল তেমন কোনো খুনের খবর নেই। ঘুম ভেঙে ভাই সম্বরসিদ্ধিও কাগজ পড়ার লাইন দিয়ে বসে ছিল। তার দিকে না দিয়ে ভাস্করের সামনে ছুঁড়ে দেওয়ায় প্রমাদ গোনে। দিদি ভগ্নীপতির প্রভাতী মেঘের লড়াইটা এড়ানো গেল না। লীলাবতী কাগজ এবং প্রশ্ন যুগপৎ ছোঁড়ে ভাস্করকে ।

কি হল তান্ত্রিকমশাই । জ্যোতিষ রত্নাকর! কোথায় খবর?

কিসের খবর?

কেন জোড়া খুনের ? তালব্য শ আর র । ব্যাক ব্রাশ আর ডাইনে বাঁয়ে চিরুনি?

তাই খুঁজছিলে? পাওনি? আজ পাওনি অন্যদিন পেয়ে যাবে ঠিক।

অন্যদিন কেন আজই পাবি ঠিক। ভাস্করদার জ্যোতিষ তো মিথ্যে হয় না। কোথায় খুন? কি বলেছিল তোকে । কাগজটা দেখি।

বলেছিল জোড়া খুন হবে। বেঁটে লোক আর একটা ঢ্যাঙা লোকের বউ।

জোড়া খুন! এই তো রয়েছে হুগলী শহরে চাঞ্চল্যকর বধূহত্যা। তার নিচে একই খবরে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ভাঙড়ে চেলাকাঠ পিটিয়ে স্বামী হত্যা। ভাস্করদা কি বলেছিল?

বলেছিল খামচে খামচে। কই দেখি।

না না চেলাকাঠই লিখেছে ।

কোথায় তোর চেলাকাঠ? ফাজলাম হচ্ছে, না! সব চোরের সাক্ষী।

কাগজ দেখতেও শিখলি না দিদি । আইন আদালত খুন জখমের বিশেষ কলাম থাকে। খুঁজে দ্যাখ।

লীলা অবাক হয়। তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে কাগজ। এমন তো হয় না তার । সম্বরের হাত থেকে কাগজটা নিয়ে চোখ রগড়ায়। খোঁজে।

খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ। খোঁজে আবার লীলাবতী।

কুঠার ১৯৯৪

দধিয়া

দধিরাম কর্ণবাহাদুর সিংএর জীবন সাহস সংগ্রাম আর ওৎ পেতে থাকার কহানিতে ভরপুর। গুর্খাকাকির বাড়ির এক বৎসরে মছিপুরের দধিরাম সিং হল দধিরাম কর্ণবাহাদুর। কাকির বড় লেড়কা সুবাস ভাইয়া এখন তার পাহুন। দিদির বর দাজু। মছিপুর তাদের পৈত্রিক বাড়ি। জিলা কাটিহার। মছিপুরে দধিরাম বিহারি, পাঙ্খাবাড়িতে নেপালি আর এখন পশ্চিম বঙ্গালে বাঙালি। দধিরাম শত প্রতিশত বাঙালি যদিও তিনটি ভাষায়ই সে সিদ্ধবাক। তার মতে, তার বাংলায় আছে অল্প বিহারি আর বাঙাল টান, নেপালিতে বাংলা আর বিহারিতে সবকিছু। ব্যারাকের সহকর্মীরা সব শালা চুতিয়া। তার কোন দাওয়া মানতে চায় না। বলে, মোর কে দুম লাগানো কাউয়া। ব্যারাকের বন্ধুরা দধিরামকে মান্যও করে। দধিরাম মতলবি নয়। একা খায় না, বড়া দাঁও মারলে হিস্সা একটা সবাইকে দেয়। তার শিকারি বেড়ালের গোঁফ যে সব সময় ওৎ পেতে থাকে ! শিকার ধরার কায়দা তরিবত তার ভিন্ন। চল্লিশ বছরের হাবিলদার দধিরামের দস্তুর বড় পাকা। উপরঅলাকে অসন্তুষ্ট করে কোন কাজ করে না সে। ওখানেও তার উশুল যোলআনা। বড়বাবুই হোক আর মেজ ছোট এমনকি ডি এস পি সাহেবের বাড়িতেও বিলাইতি পৌঁছে দিয়েছে সময় মতো।

উশুলমে পাক্কা আর লগন ও একাগ্রতা সম্বল করেই দধিরাম আজ কলকাতায়। অন্য সব সহকর্মীরা যেখানে অনেকবার বদলি খেয়ে খেয়ে এখনও গার্ড ডিউটি দিচ্ছে, ব্যারাকে কয়দি থাকছে সেখানে দধিরামের রেকর্ড একেবারে ক্লিন। বদলি হওয়া আর খাওয়া এক কথা নয়। দধিরাম তার ইচ্ছেমত বদলি নিয়েছে। সবকটা থানাই ইনাম পোষ্টিং। তার একটাই দুঃখ, কলকাতায় থাকলেও লালবাজারিয়াদের মত হওয়া যাবে না। শালা সিপির কনেষ্টবলভি এক এক জমিন্দার। এরিয়াকা শেরা। সেখানে দধিরাম কনেষ্টবলের কপালে কী জুটত ? একটাকা পাঁচটাকা, দশপঞ্চাশ কখনও বড়াপাত্তি থেকে শালা হারামজাদা ঠেলাওলার বিড়ি পর্যন্ত। ওসব ভাবলেও দুঃখ হয়। পেটিকেসে দধিরাম এখন নেই। বিএ পাশ হাবিলদার সে। আনপড় ঠেলাঅলার কোমরের ঘামে তেতো বিড়ির ধোঁয়া তার নয়। তিনদেশ ঘুরে পশ্চিমবাংলায় কী এর জন্য এল। পুলিশের নোকরি বদনাম করবে না দধিরাম। তার বাপও ছিল ইনামদার কনেষ্টবল। বাপ বিহার পুলিশের কনেষ্টবল শুনে এসপি সাব তার ইন্টারভিউই নিল না। বলল, চলো নৌকরি হো গ্যয়া।

সাহেব ভেবেছিল দধিরাম বিহারি। চাকরি পাওয়ার পর থেকে অন্ধা বাপের উপর দধিরামের ভক্তি বেড়ে গেল দধিরামের সৌভাগ্যের সূচনা মহারানী তার বউ হয়ে আসার পর। মহন্ত রাজবংশী ছিল তার বন্ধু। কোচবিহার পোষ্টিং-এ দধিরাম ব্যারাকে থাকত কম। বন্ধুর বাড়িতে যাতায়াত। রাত্রিবাসের সূত্রে বন্ধুকে যা বলতে পারেনি, তার পঁচিশ বছরের জীবনের সব দুঃখের কথা জানাল বন্ধুর বৌকে । মহারাণীর বয়স তখন কুড়ি। সেই দধিরামের সংগ্রামের শুরু। আগেভাগে পোষ্টিং নিয়ে চলে গেল মহদিপুর। একগাড়ি বোল্ডার ফিরি পাশ করিয়ে দিলেই অনেক মাল। রোঁদ গস্তিতে রিস্ক থাকলেও ইনকাম বেশি। ইন্ডিয়ার শাড়ি শালারা অ্যাম্বাসাডর করে পাচার করে রাতের বেলা। এদিক ওদিক যেদিক দিয়েই যাও দধিরাম কনেষ্টবল ঠিক ওৎ পেতে থাকে। মহারানীকেও ভাগিয়ে নিয়ে এল। ব্যস. এক সাল সুখের সংসার । শিবমন্দির বদলি নিতেই দুধকা দুধ পানি কা পানি। মহন্তের কাছাকাছি মহারানীকে রাখার সাহস হল না দধিরামের । মহারানীর পেটে তখন অর্জুন।

বিহার থেকে ম্যাট্রিক করিয়ে ছেলেকে নিয়ে আসবে কলকাতা। পনের বছর পর মহারানীকে নিয়ে আবার সংসার। প্যার উয়ার ফির সে শুরু হবে। উট্রাম ঘাট পিন্সেপ ঘাটে কবুতর কবুতরনি দেখে তার জ্বলন হয়। মহারানীর জন্য দিল দুখায় । একহাতে মুছুয়ায় হাত দিয়ে বেটনের শব্দ করে সিমেন্টের বেঞ্চিতে । আপন মনে বিড়বিড় করে চিড়িয়া তাড়ায়, ভাগ। ভাগতে ভাগতে পরেশান হয়ে গেছে । এবার স্থিতি চাই। নিজের জন্য সময়ও চাই । ছেলে বড় হচ্চে, নাইন ক্লাসের ছাত্র অর্জুনবাহাদুর। ছেলেকে নিয়ে ঘুরবে, কলকাতা দেখাবে। ভিক্টোরিয়া জাদুঘব নিয়ে যাবে। বহুত পুরানা সমান রাখখা আছে মিউজামে । হাজার হাজার সালের পুরানা ডেডবডি ভি আছে। ছেলের সঙ্গে নিজেরও দেখা হয়ে যাবে। এমনিতে দধিরামের সময় কোথায়। ব্যারাক ছেড়ে বেরলেই লস। অন্ধাবাপ আর মাইর জন্যও মনে দরদ হয় । মহারানীর সঙ্গে বিয়ের আগে তো সে শ্রাবণকুমার হয়েই ছিল। অন্ধাবাপ আর মাই-এর ভাবনা ছাড়া কিছুই ছিল না জীবনে। বাপ চেয়েছিল একটা মকান উকান বানিয়ে দিক ছেলে। শিবজিকে একটা মন্দির ভি থাকবে। বাপ তার সঙ্গে কথাই বলে না, মাইকে দিয়ে বলায়। দুঃখী মাই ছেলের কাছে আব্দার করে, বেটা তোর পিতাজির আর একটা খোয়াইস ছিল, জিন্দা থাকতে একবার গঙ্গাজি করে আসবে। সব খরচা তোর বাপের, কথায় আছে হর তিরথ বারবার গঙ্গাসাগর একবার। মাইর মনে সন্দেহ ছিল তাই আরো জোরদার সুপারিশ পেশ করেছিল, বহুভি কোথাও যায়নি অনেকদিন, অজ্জুরাজাও কলকাতা হাবড়া বিরিজ দেখার নামে ঘোড়ে পে সওয়ার। দধিরাম আশ্বস্ত করেছিল, ব্যস ব্যস মাই, তোহার সব খোয়াইস পুরা হবে। তিরথ ভি হবে, মকান বাড়ি ভি হবে।

দধিরাম অবাক হয়ে গিয়েছিল। মা-ই যে তার অন্তর্যামী, কলকত্তা জইন করেই সে ভেবে রেখেছে সব । আর উড়ে উড়ে বেড়ানো নয়, কপিলমুনির আশীর্বাদ নিয়ে এবার ঘর সংসার। গঙ্গাসাগরে ইস্পেশাল ফোর্সে নাম লিখিয়েছে। অন্ধাবাপ ছেলের ঠাটবাট কিছুই বুঝে না। দেখবে ছেলে, ছেলের মার ওসবে উৎসাহ নেই। মাইও না, ছেলে তার জজ না বারিষ্টর হল দেখে না। ফোর্সের বন্ধুদের সামনেই ডেকে দেয়, হেই দধিয়া ! দধিয়া তার মায়ের আদরের ডাক।

অন্ধাবাপের মর্জি সে এত বয়সেও বুঝল না। একমাত্র ছেলে, তার সঙ্গে কখনও ভালমুখে কথা বলেনি। পুলিশে চাকরি করত যখন রোদে বসে মুছে তেল মাখাত আর দধিরামকে হুকুম

করত সান্তরা ছিলে দিতে। একবারও তাকে দেয়নি কখনও। নাম ধরে আদর করে কখনও ডাকেনি বেটা, দধিয়া, দধিরাম কিছুই না। কুম্ভবিল্লির মতো হেই হেই করে গেছে। শালা খুব ঘমন্ডি। ঘুষ খায় না বলে ঘমন্ড। আসামী অন্ধা করার সময় কোথায় ছিল ঘমন্ড ! এখনও যায়নি, বলে আমার পিনসিনের টাকায় খাচ্চি। এতই যদি ঘমন্ড তবে মাইকে দিয়ে কেন বলাচ্ছিস গঙ্গাসাগর যাবি, মকান করবি। শিউমন্দির করবি। মন্দির বানাবে দধিরাম ঠিকই, তবে মছিপুরে না। কলকাত্তায় করবে। মছিপুরে তার বাপের খুব বদনাম। তার বাপের নাম নেয় না কেউ, বলে কইদি অন্ধা করনেবালা সিপাই। পন্দর সালের দধিরাম মাইকে শিকায়ত করেছিল, মুজরিম বাপের সঙ্গে থাকবে না। মাই পারমিশান দিয়ে দিল সাথোসাথ, যা চলে যা পাঙ্খাবাড়ি। শুরু হল তার মুসাফির জীবন। ডেরাডান্ডা কোথাও বসল না জীবনে। মছিপুর ভি দুদিনের জন্য যায়। ভাঙাবাড়িতে দুরাত থেকে চলে আসে। আসলে ঘমন্ডি বাপ তাকে ঘৃণা করে, সে ঘুষখোর বলে কথা বলে না। মা বলেছে বাপ তার খুব রোয়। কান্দে এখন ছেলের জন্যে। বিলাপ করে, অন্ধা হয়ে গেলাম ছেলেকে শিখসা দিতে পারলাম না, বেটা আমার হুনহার ছিল। লালচি ছিল না, কেন যে এমন হয়ে গেল। মাইকে জিজ্ঞেস করেছিল, বাপ তাকে বেটা বলেছিল? মাই দুঃখ চেপে হাসতে পারে, দধিরামকে ভুলিয়েছিল, না দধিয়া বলেছে। চাটা দিয়ে বলেছিল, বুদ্ধু।

এইট ক্লাস ফেল করা কনষ্টেবল দধিরাম এখন কলকাতায় হাবিলদার। সবাই জানে দধিরাম বি. এ. পাশ। বিহারে তো হিন্দিতে বি. এ. পাশ করা যায়। কলকাত্তা পুলিশে সার্জিনেরও তিন বিল্লা তারও তিন। ভটর ভটর সে চালাতে পারে না। মাই সাইকিলও চালাতে দেয়নি এক্সিডেনের ভয়ে। মুর্দাঘরে ঠিকানা। ট্রাফিকের জমানা দধিরাম কবেই শেষ করে এসেছে। এখন সে সবরকমের ডিউটি দেয়। এক্সপার্ট ইস্পিশাল ডিউটিতে ডাক পড়ে ডিকেবি সিংএর। গঙ্গাসাগরে এবার সিকিউরিটির খুব কড়াকড়ি। ডি এস পি সাহেব বলতেই অন্ধা বাপ আর মাই-এর মুখটা মনে পড়েছিল। হ্যাঁ করে দিল। হ্যাঁ করেছিল বলেই না মাইকে বড় মুখ করে বলতে পারল, সব হবে। টি-এ ডি-এ থাকার জায়গা, দেহাতিদের কাছ থেকে ইনকাম ভি কম হবে না। অন্ধা মানুষের থাকার নাহানের ঠিকঠাক প্রবন্ধ তো করতে হবে। অন্ধা পিতাজির সখ ছিল পশ্চিমবাংলায় এসে বাড়িঘর করবে, থাকবে। আসামি অন্ধা করার কেসে ফেসে গিয়ে হাবিলদার থেকে হয়ে গেল কনস্টেবল। মনের দুঃখে মছিপুরেই কাটিয়ে দিল জিন্দগি। স্রেফ পেটের দায়ে রাম পরসাদ সিং হয়েই থেকে গেল দধিয়া গ্রামের রামপ্রসাদ চৌধুরী। মাই বলেছে, তার বাপের আদিবাড়ি ছিল দধিয়া গ্রামে। জিলা দিনাজপুর। তাই তো মাই তাকে আদর করে ডাকে দধিয়া।

অন্ধাবাপ তার ঘুষখোর ছিল না, কিন্তু বদমাইশ ছিল। ঘুষ না খেলে আর কত টাকা হবে পুলিশের নৌকরিতে। বদসুরত মেয়ের বিয়ে দিয়ে গুর্খাকাকির লেড়কা সুবাস ভাইয়াকে ফাঁসিয়ে দিল। মাই যখন বলল, যা চলে যা, পন্দর সালের দধিরাম কিছুই বোঝেনি। তখন এত খুশি ছিল বোঝেনি যে এও তার অন্ধা বাপের চাল। জিন্দেগির জন্য ছেলেমেয়েকে অলগ করে দিল নিষ্ঠুর মানুষটি।

পাঙ্খাবাড়িতে দধিরাম নেপালিই বনে গিয়েছিল, থেকেই যেত গুর্খাকাকির আদর যত্নে। চা বাগিচায় নৌকরি একটা তো করত। পাত্তি বওয়া টলারের যোগালি। চা ঘরের অন্দরতক চলে যেত। এক পাকিট চা ফ্যাক্টরি আউট করে দিলেই চার আনা। রোজানা চার আনা ইনকাম কম

ছিল না। পাম্বাবাড়িতে খাওয়া দাওয়ার পবলেম খুব। মছলি নেই। গুর্খাকাকি সব খায়। শুওর খায়, চুঁহা খায় ঘেন্না নেই। দধিরাম ধরে দিয়েছে বড় বড় সাইজের চুঁহা।

ছাঁটকল লাগে না, দধিরাম ওৎ পেতে থাকে গর্তের মুখে। খপাৎ করে ধরে। চুঁহার চিঁহিঁহিঁহি ডাক শুনতে ভাল লাগে তার। চুঁহা খায় দধিরামও, খুব পছন্দ। কিন্তু মছলি তো পাওয়া যায় না, তাই পালাল। জিজি থেকে গেল কাকির বহু হয়ে। সুবাস ভাইয়ার জরু।

পাম্বাবাড়ির চুঁহামার কর্ণবাহাদুরের কত কীর্তি পুলিশের নৌকরিতে। অনেক কামিয়েছে জীবনে দধিরাম। কামিয়েছে যেমন জমিয়েছেও। খরচা আর করেছে কত। সে মছিপুরে জমি কেনেনি। জরুর পিছনে খরচা করে নি। জুয়া দারুও তার নেই। খাওয়ালে খায়। খৈনি খায়, বিড়ি ভি দুচার পিস। মুছের জন্য তেল কেনে ইস্পেশাল। পইসা আছে দধিরামের, সে পয়সা কোন চুঁহা মারতে পারবে না। দধিরামের পইসা সব রয়েছে লকারে। রাম মহাজনের লকার। না টিপছাপ না সহি, কুচ্ছু না। উত্তর বঙ্গাল থেকে কলকাতা তকভি চালু করে দিয়েছে তার লকার বিজনিস। জরুরত সমঝে টাকা দেয় দধিরাম। হাজার লেও তংখা পেয়ে পাঁচিশ ফেকো। ডিপার্টমিন্ট এর মুলাজিম ছাড়া কাউকে টাকা দেয় না সে। বড়বাবুরাও নেয় রামব্যাংক এর টাকা। এবার সব উঠিয়ে নেবে। আর কত পালাবে? এবার সে সপ্না সাকার করবে। মহারানীকে নিয়ে সেই যে পালিয়ে গেল মহদিপুর। এক সালের সপ্না সপ্না হয়েই থাকল। শিকায়ত করে না মহারাণী। অন্ধাবাপ আর মাই এর সেবা করেই কাটিয়ে দিল জিন্দেগি। আসলমে মহারানীর সপ্না ছিল আওলাদের। মহত ওকে আওলাদ দিতে পারেনি তাই অর্জুনকে পেয়ে সে দধিরামকে ভুলেছে মহারানী তাকে জোর করেনি কখনও, মহারানী বললে ব্যারাক ছেড়ে মকান নিত কিবাযায় অন্ধাবাপ মছিপুর ছেড়ে নড়বে না, গান্ধারী মাইকেও সরানো যাবে না।

দুই

এবার তার সপ্নার দুসরা রূপ। আর রুপেয়ার পিছনে ভাগবে না। মহাবানীকে মহাবানীব মত রাখবে। আপনা মকানে মালকিন। খোদ কলকাতায় মকান খরিদবে দধিরাম। কত বেওয়ারিশ জমিন পড়ে থাকে এখানে ওখানে, কেউ খরিদতে চায় না। পারেও না, মালিক ওয়ারিশান নেই, ডিসপুটেড। দধিরামের ওসব বাঁয়ে হাতকা খেল। সে কি লোন নিযে বাড়ি করবে? সার্চ ইনকামবেন্স দেখবে? কিছু চাই না, সিরিফ জমিন চাই। আপনা মকান হবে পুলিশ পজেশন নিলে ওঠাবে কে? তবে যেমন তেমন জমিতে নেই দধিরাম। সল্টলেকে চেষ্টা করেছিল কেশরীদাকে দিয়ে। দত্তবাড়ির কেসটা হওয়ায় ভড়কে গেল সবাই। জমিন তো অনেক আছে, দধিরাম বর্গাদার নয়, সে জমিনদারের মত থাকবে। বাস টিরাম মিট্রোর সুবিধা না থাকলে কেন যাবে। যাদবপুর লেকটাউন এমনকি দমদম টালিগঞ্জের কাছে হলেও চলবে। নিউ আলিপুর বালিগঞ্জ তার হিসেবের বাইরে, ওসব আমির লোকদের ইলাকা। পূর্বি কলকাতার সীমা পার করে এক চুঁহার খবর দিয়েছে কেশরীদা। এলাকার কাউন্সিলার কেশরীদা, পাওয়ারফুল আদমি। দেখনে মে একদম সিম্পল। তার মত মুছউছ নেই, লম্বা চওড়াভি না। লেকিন কেশরীদার হাসি বহুত ডিঞ্জেরাস। হাসি দিয়ে জখম হাসি দিয়ে মরহম পট্টিভি করে কেশরীদা। আদমি বহুত খতরনাক। তার ডরে শের ভ'ইস ভি এক ইন্দারায় একঘাটে পানি পিয়ে। মিনসিপালটির চেয়ারম্যান ভি না, ভাইস ভি না তবু শালা বাপকে বাপ। কেশরীদা ছাড়া রাজ্য চলে না, চিপমিনিষ্টার ভি কথা শোনে। কেশরীদার

দুর্গাপূজা কলকাত্তার এক শান। গভর্ণর ওপেন করে। এক চুঁহা মারতে কেশরীদার এত দিক্কত !

আদমি বটে কেশরীদা। ইতনা বড়া মানুষ, ঠোঁটে হাসি ছাড়া দেখেনি কখনও । শালা লিডার হতে গেলে হাসি বহুত জোর প্র্যাকটিশ করতে হয়। এতবড় অপারেশন হাসিমুখে করিয়ে দিল খালপারে। সরকারি জলাজমি বুজিয়ে ফেলেট বানাচ্ছিল শ্রীহরিদা। সবাই বানায়। কেশরীদাকে পাত্তা দিত না। ভাবত ও হাসিমুখ মানুষকে আবার কী বলবে। ব্যস হাসিমুখেই কেশরীদা ফিট করে নিল দধিরামকে। লোকাল থানা হাবিলদার দধিরাম কর্ণবাহাদুর সিং। ওস্তাদ মানুষ গোঁফ দেখেই চিনে ফেলল শিকারি বিড়াল। দধিরাম একা দুই কনস্টেবল নিয়ে করিয়ে দিল কামবন্দ । তারপর সবাই এল, শালতি, গাঁইতি কনকিট কাটার অফিসার মেজিস্টর। কঙ্কালের মতো পড়ে থাকল ফিলেটের খাঁচা সালভর।

অপারেশনের সময় কেশরীদা ছিল না। মিটিন এ চলে গিয়েছিল হলদিয়া। কেশরীদার প্ল্যানমাফিক তসবিরওয়ালা দধিরাম কর্ণবাহাদুরের ছবি খিঁচে নিল কয়েকটা। সঙ্গে মুখে গামছা মগরমচ্ছি শ্রীহরিদা। গামছা ভি দধিরাম সাপ্লাই দিয়েছিল, কুলির কাঁধ থেকে টেনে। মগর মাছ ভি তো দধিরামের লছমি । ওসব নেতা প্রমোটারের নখড়া অনেক দেখা আছে। আখবারওয়ালারা ভি উস্তাদ আছে। লিখে দিল, পুলিশ লকআপে প্রমোটার শ্রীহরি বর্মনের হেনস্থা। সরাসর ঝুট। শ্রীহরিদা থাকবে ওই গন্দা ছাটকলে? বড়বাবুর সামনে বসল, ঠান্ডা গরম কেলাসিক সিগারেট সবই আনিয়ে দিল দধিরাম। শ্রীহরিদার কাছ থেকে ফুটি কৌড়ি ভি নেয়নি পুলিশ। বড়বাবুকে বলে গেছে কেশরীদা।

শ্রীহবিদা অপারেশনের ডিউটি সেবেই দধিরাম ঢুকে গেল কেশরীদার ভুলভুলাইয়ায়। ভুলভুলাইয়া মতলব কেশরীদার বাড়ি। বাড়ি তো সিধাসাধা লেকিন বহুত সুন্দর ভি, ফুল উল আছে বাগিচায়। কেলাব ঘরের মুখোমুখি। কেশরীদার আসলি রুমে কেউ ঢুকতে পারে না। আম পাবলিকের জন্য কেলাবঘরে সবসময়ই হাসতে হাসতে বসে থাকে পাবলিকের মসিহা। খুল যা সিমসিম ঘরে ঢুকেই পন্দর সাল পুরানা বাত ইয়াদ করে দধিরাম। মহদিপুর পোষ্টিং-এ গৌড় গিয়েছিল মহারানীকে নিয়ে। মহারানী মানত করেছিল লেড়কার জন্য রসুল কদম মর্সাজিদে। খাদিম এসে তালা খুলে দেখিয়েছিল হজরত মহম্মদের পদছাপ। সবাই দেখতে পায় না, দধিরামের সৌভাগ্য ওরা পেরেছিল। দিনের বেলা পদচিহ্ন চলে যায় দূরের মসজিদে, যেখানে অনেক মানুষের জন্য নিমেষের দেখা। মানত করার সময় পাওয়া যায় না। দধিরাম কলকাতায় মকান মালিক বনতে সবরকমের মানত করবে। মহারানীকেও নিয়ে যাবে একদিন। টেলিফোন কম্পুটার বোতাম টিপার সব কল দেখিয়ে আনবে। খুশি করিয়ে আনবে তার হাসিমুখ পয়গম্বরকে। ইলাকার লিডার যখন মিছিল নিয়ে যায়, জনতা তখন জয়ধ্বনি দেয়। আপনা ডিউটি ভুলে সেও নারা দিয়ে ফেলে কেশরীদা জিন্দাবাদ, কেশরীদা যুগ যুগ জিও। কেশরী জিন্দা থাকলেই দধিরামের সাফল্য ওৎ পেতে থাকার সিদ্ধি ।

কেশরীদার ছোটঘরে ঢোকার পরই মনে হয়েছিলঐ ঘরটা ভুলভুলাইয়া। ওঘরে একবার ঢুকলে আর বেরোনো যায় না। সেও বেরোতে চায় না । কেশরীদা না থাকলে চুঁহার কবল থেকে দশকাঠার জমিটা হড়প করা যাবে না।

তিন

চুঁহার নামের কী বাহার! পদা, দধিরাম বলে পচা। শালা হেভি মালখোর। মালের পাহাড়। বিছানার নিচে পাত্তি পেতে শোয়। শ'পাঁচশ । প্রথম প্রথম বিশ্বাস হত না । মাল খেতে খেতে একদিন দেখেছে। খুব মাল খেয়েছিল লিভারপচা পদা। রোয়েছিল দধিরামের হাত ধরে পড়াশুনায় খুব টেলেন্টেড ছিল। বাপের পয়সা ছিল না, পাথরকলে চৌকিদার । এফ সি আইর খালাসিতে ঢুকিয়ে দিল। পইসাই পদার লগন। ম্যাট্রিক পাশ করে প্রমোশন হয়ে গেল, ইস্টিশান ডিউটি। ওয়াগনকে ওয়াগন ঝেড়ে দিয়েছে। —দিইনি তোর বাপের গোদামে, শালা। আমাকে কী করবে তোর কেশরী । কেশরীদা তার দুচোখের দুশমন। দধিরাম বলেছিল, —তুই তো শালা চুঁহা, কী বাঁকা করবি তুই কেশরীদার? কান্না থামিয়ে গেলাস রাখা টেবিলে থাপ্পড় মেরে বোতল ভেঙে দিয়েছিল পদা। —শালা কেশরীনন্দনকা চামচা, তোকে ফিট করেছে আমাকে তাড়াবার জন্য। আমি নড়ব না । তোর বাপের পাবলিক আছে, আমারও আছে। মহল্লার সবাইকে খাইয়ে রেখেছি শালা লিডার মারাবি না। পাথরকল এখন আমার। দধিরাম আরো চটিয়েছিল — মকান তুমকো ছোড়না পড়েগা গুরু। দধিরামের কাঁধে হাত দিয়েছিল পদা। —তুই নিবি? রাখতে পারবি না দোস্ত। ও শালা আমাকে তাড়িয়ে তোকেও মারবে। নতুন বোতল থেকে পানিউনি ছাড়া এক আঙুল গলায় ঢেলে বলেছিল, —শালা কেশরীনন্দনের ম্যাও, নিবি? যা তোকে দিয়ে দিলাম । তবে তোকে যেদিন খপাৎ করবে মনে করিস পদার কথা। পদার অভিশাপ তোকে লাগবে ।

পদার বাড়িতেও দধিরামকে ফিট করেছিল কেশরীদা। একা দশ কাঠার মকানে থাকে পচা। ঘাস শ্যাওলা চুনসুরকি ভাঙা দেওয়াল ঘেরা হাভেলি। অন্দরমে পাথরকল ছিল, কভ বন্ধ হয়ে গেছে। পদার বাপ চৌকিদার ছিল, এখন মালিক হয়ে বসেছে পচা। আসলি মালিক উলিক কোই নেই। ওয়ারিশান সেজে আসে গিদ্ধর পার্টি, দূরকে রিস্তেদার। প্রমোটার নিয়ে ঘোরে। পদাও বহুত দিলদার আদমি, কাউকে ধমকায় না, খারাপ কথা ভি বলে না। দিনেশের দোকান থেকে চা বেগুনি এনে খাওয়ায়। সন্ধ্যার পর এলে মাল ভি পিলায় । আসলি বাত পচা কাউকে দেয় না। সব আদমির ঘমন্ড তাকে বরবাদ করে দেয়। তার বাপেরও ছিল, পদারও আছে। লিভার পচা পদা সব নেতাকে পাত্তা দেয়, চান্দা দেয় লেকিন কেশরীদা ডাকলে যায় না। পদা চুঁহা হলে কী হবে, লড়তে জানে।

পুলিশে নৌকরি করতে করতে দধিরাম নেতাদের মর্জি উর্জি সব শিখে নিয়েছে। তাই তো শ্রীহরিদাকে থানায় ঠান্ডা গরম কেলাসিক পিয়ালো। ফেলেট রেডি হয়ে গেল দেড় সাল বাদ। দোস্তি ভি হল কেশরীদা শ্রীহরি বর্মনে। সরকারি জল ভরে আরো দুকাঠার পার্কিং স্পেস বেচে দিল। শ্রীহরি অ্যাপার্টম্যান্ট এর পর শ্রীহরিদা এখন ইলাকার ঘুপচি ঘাপচি যেখানেই খালি জমি পাচ্ছে পালাজ্জা বানাচ্ছে ইলিভেটার লাগাচ্ছে। পাঁচশ টাকা স্কোয়ার ফুটের ম্যাচবাক্স আর বানায় না। পালাজ্জা আর কোর্ট শুধু। পদাকে ওঠাতে না পেরে ভুলভুলাইয়ায় মিটিন করে দুই বন্ধু। পাথরকলের জমিদারি দিয়ে দেওযা হয় দধিরামকে । --নে দধিয়া। শ্রীহরিদা দধিরামকে আদর করে। প্যার সে তার মায়ের নামে ডাকে । দধিয়া। দধিয়া তার পিতৃপুরুষের গ্রামের নাম। শ্রীহরিদার আদরে আর কেশরীদার প্রশ্রয়ে দধিরাম ঠিক করে নেয় দশকাঠার বাড়ি থেকে পদাকে সে ওঠাবেই। পুরানা ইস্টাকচার ভেঙে নয়া মকান করবে, একটা শিউমন্দির ভি করবে। অন্ধাবাপের

ইচ্ছা পূর্ণ করবে। বাড়ির নাম রাখবে দধিয়া।

তকলিফও আছে। পচা চুঁহার সঙ্গে লড়তে হয়েছে বহুত। দধিরাম হাট্টাগাট্টা মুছুওয়ালা হাবিলদার আর পদা তালপাতার সিপাই। পদার মনটা নরম, আপনা উশুল মাফিক রাজার মতো জীবন তার ভাঙাবাড়িতে। মাল খাবে ওভি আপনা পয়সায়, খাওয়াবে ওভি নিজে। দধিরাম একরাতে নৌটঙ্কি করে গেল পাথরকলে। জিসদিন জেনানা লকআপে রেপউপ হল, আখবারে ছেপে বেরল। বলল,- পচাদা, হামার নৌকরি গেল, সাসপিন হয়ে যাব। আর ব্যারাকে থাকা যাবে না। পদার মনটা খুব নরম। দধিরাম পানি ছাড়া এক আঙুল ঢেলে দিয়েছিল পদার গলায়। শালা চুঁহার কী হল সাথোসাথ বলে দিল, তুই থাকবি আমার কাছে। পারমিনিন্ট হয়ে গেল দধিরাম। পচা বলল, পুলিশ সঙ্গে থাকলে শালা শকুনের পাল দূরে থাকবে। বর্মন আর তার বাপ কেশরীনন্দন বড় জ্বালাচ্ছে। আমার হাত থেকে বাড়ি হড়প করবে। দেখে নেব কত ধানে কত চাল। তখনও পদা জানত না কেশরীদার সঙ্গে তার সাজিশ। পরে জেনেও তাকে তাড়ায়নি। পদা দধিরামকে প্যার করত। চামচা উমচা বলত, ফিরভি মাল খেয়ে কান্দত খুব। মাল খেয়ে দুবলা পাতলা চুঁহা যখন কথা বলত, দধিরামের দিলে লাগত। পদা ভি তাকে দধিয়া বলত। তার মাই যে নামে ডাকে। দধিরাম ভাবত ঘাস শ্যাওলা চুনসুরকি বেরনো দেওয়াল সারাই করবে কবে? শিউ মন্দির গড়বে। নাম দেবে দধিয়া। পদা বলত, --দধিয়া, এ বাড়ি আমি ছেড়েই দেব। --কিঁউ দাদা? আবার এক আঙুল জল ছাড়া ঢেলে দিত পদার গলায়। --কোন শালা তোমাকে তাড়াবে? পুলিশ হাবিলদার তোমার দোস্ত, ছোটা ভাই। পদা মালের নেশায় তুঙ্গে। --শালা তোমাকে আমি চিনি না, তুমি হাবলিদার ত জমিনদার বনবে খোয়াব দেখছ। কেশরী আর শ্রীহরি মিলে যখন ডবল ছাপ্পা মারবে তখন মনে কর এই পদার কথা। বাড়ি আমি কাউকে ছাড়ব না। --তবে যে বললে দাদা, ছেড়ে দেবে? --ব্যাটা তোকে দিয়ে যাব। তোর হাতে ছাড়ব। তোকে ফিনিশ করে যাব। সব সূচ ফাল হয়ে বেরয় না। গোঁফ থাকলেই শিকারী বেড়াল হয় না। বুঝলি!

শ্রীহরিদাকে ভুলভুলাইয়ায় ঢুকিয়েছিল দধিরামই। মিডলম্যান হয়ে সমঝোতা করিয়ে দিয়েছিল। এহসানের বদলে দধিরামকে দিয়ে দিল পচা পদার বাড়ি। --নে দধিয়া, শোধবোধ হয়ে গেল। অনেক ঠান্ডা গরম খাইয়েছিস। সিগারেট যুগিয়েছিস। কেশরীদার গুহায় ঢুকিয়েছিস। তোকে ইনাম দিলাম পদার পাথরকল। নতুন দুই বন্ধু বহুত জোর হেসেছিল। কেশরীদা আর শ্রীহরি বর্মন। দধিরাম কিছুই বোঝেনি। শ্রীহরিদা দধিয়া ডেকে তার শোধবোধ খুইয়ে ফেলেছিল। দধিয়া যে তার মাইএর আদরের ডাক। দধিয়া তার পিতৃপুরুষের আদিবাড়ি। দধিয়া তার নতুন বাড়ির নাম। ঘাস শ্যাওলা চুন সুরকি ভাঙা ইট সরিয়ে নতুন দেওয়াল হবে। শিউ মন্দির হবে, তার অন্ধা বাপের খোয়াইস। হবে তার নতুন বাড়ি দধিয়া।

পচা মাল খাওয়া বাড়িয়ে দিল। পানি ছাড়া দু-দু আঙুল এক সঙ্গে ঢালত গলায়। আর দধিরামকে জড়িয়ে ধরে খুব রোত। কেঁদে কেঁদে তাকে গালাগালি দিত, আদরও করত। তার মুছুয়া ধরে আদর করত। মুছুয়ায় হাত সে কাউকে দিতে দেয় না। একমাত্র মহারানী, তার জরু তার মুছ নিয়ে নাড়াচাড়া করে। মহতের বাড়ি থেকেই শুরু। পহলা প্যার তার মুছ ধরেই। মহারানী এখনও খুব খিঁচে। মহতটা ছিল এক না মরদ। মহারানী তার মুছ খিঁচে মর্দানগি পরখ করে। লেড়কা ভি খিঁচেছে। সে বচপন মে। এখন বাপকে ভয় পায়। ওসব নিয়ে দধিরাম সোঁচে

না, আপনা লেড়কাইতো । সব ঠিক হয়ে যাবে। মকান উকান হলে প্যার সে সনসার বসাবে দধিরাম। বুরা কামউম কিছু করবে না। কেশরীদা শ্রীহরিদাকে হাতে রাখতে হবে। প্লেন উন পাস করাতে হবে, ইট পাথর লোহা সিমেন্ট দেবে শ্রীহরিদা । ভুলভুলাইয়ার পথ সে ভুলে যাবে। ও বড়ি খতরনাক জায়গা। দধিরামেরও চোখ লাল হয়। পচার সঙ্গে সেও মাল খায় । আজব আদমি এই পচা, মালের পিপা। মাল খাবে তো কিছু খাবে না। শেষ দিকে পানি ভি না। এমন মানুষের লিভার বলে কিছু থাকে ?

দধিরামের গুস্‌সা বলেও কোন চিজ ছিল না। গুস্‌সা থাকলে এত লগন সে ওৎ পেতে থাকতে পারত? পচা বলত, —তেরা গুস্‌সা কিঁউ নাহি আতা রে দধিয়া। বলে মুছ ধরে টানত। দধিরামের গুস্‌সা হত । দেখাত না। দুধ দেবে গাই চাটা তো খেতেই হবে। মাল খেয়ে দধিয়া দধিয়া ডাকলে গুস্‌সা হয। প্রথম প্রথম মনটা বেকাবু হয়ে যেত। পচা বুঝত দধিরাম গুস্‌সা চেপে রাখছে। বেশ করে ডাকত । মুছ ধরে টানত। পদা প্যার ভি তো করত। পাথবকলে মাঙনা থাকতে দিয়েছে। আপনা পইসা দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছে দধিবামের ঘর। জাজিম বিস্তব দিল। বিস্তরের নীচে পাঁচ টাকা দশ টাকাব লোট ভি রাখল বিশ পঁচিশটা। হ্যারিসন তালা কিনে দিল। মাল খেয়ে বলল, --পাথরকলের মালিক বনবি না? শেঠকা মাফিক থাকবি । আমি ছেড়ে দিলে ভোগ করতে পাববি তো? আযেশ কবে নে বে দধিযা। বলেই কেন যে সেবাতে এত জোবে মুছ ধরে টানল। দধিরামের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠেছিল এক টানে। আসলে দধিবামের ভি নেশা হয়েছিল। সেও রঙিন সপ্নায ভেসে যাচ্ছিল। ইস্পিসাল ডিউটি থেকে ছুটিভি নেযনি। গঙ্গাসাগব থেকে চলে এসেছে। কাটিহার এক্সপ্রেস আসবে ভোববেলা। ভোর হতে অনেক দেবি। এই ফাঁকে রাতের বেলা পচাব সঙ্গে একটু কচটা কচটি। যতুটুকু এগিয়ে বাখা যায় জমিদাবি।

সকালবেলা আসবে তাব অন্ধা বাপ। ঘমন্ডি বাপ তাব আপনা পইসায তিবথ কববে। মাইকে গোদমে বৈঠাকে গঙ্গাজি আস্নান করাবে। বদমাস লেড়কা তাব বাপেব সামনে কেমন ডরপুক হয়ে থাকে. দেখবে এক হপ্তা। আর দেখবে মহাবানীকে । বাপ আব মাই থাকলে কখনও মহারানী তার কাছেও আসবে না । ভুলিযে ভালিযে নিয়ে যাবে পুলিশ তাম্বুব ভিতব। সচমুচ, মহারানী মুছ ধরে না টানলে মর্দানগি আসে না দধিবামের । ইতনা সাল হযে গেল তবু মহাবানী এখনও সেই মহদিপুরের জরু তাব। এসব যখন ভাবছে রাতে, মাল খেতে খেতে শালা পচা আবার তাকে দিয়ে দিল পাথবকল। পানি ছাড়া দু'আঙুল গলায ঢেলেই তাব মুছে দিল টান, আবার। —দধিয়ারে, তোকে দিয়ে দিলাম দশ কাঠার জমিদাবি। আবার টান । গুস্‌সায বোতল একটা ভেঙেছিল খেয়াল আছে। ঘর ছেড়ে যখন বেবিয়ে এল পচার গোঙানি শুনেছিল শুধু, দধিয়া দধিয়া। কানে হাত চেপে শিয়ালদহ ইস্টিশানে এসে বাত কাটিয়েছিল। ভোরেই কাটিহার এক্সপ্রেস।

চার

লেড়কা এক হপ্তা বাপকে একসাথে পায়নি কখনও। দধিরামের ডরপুক লেড়কা গঙ্গাসাগরে গিয়ে বাপের দোস্ত বনে গেল। অন্ধা বাপ পিনসিনের টাকা থেকে দু'শ দিল মাইর হাত দিয়ে । আপনা পইসায় তিরথ। দিক, ঘুষখোর লেড়কার পয়সায় পুণ্য হবে না। অন্ধা বাপ বুঝেও বোঝে না দু'শ টাকায় রেলের টিকট ভি হয় না। ঠিক আছে, আপনা আপনা ঘমন্ড। মাইকে বলেছিল

দধিরাম, শিউমন্দির করে দেবে, কলকাত্তা এসে থাকতে । মাই খুশি হয়েছিল, অন্ধা বাপের ঘমন্ড না করে দেয়, মাই খুব রোয়। মহারানী শাশ শ্বশুর ছেড়ে আসবে না। মছিপুরে বিহারী, পাম্বাবাড়িতে নেপালি হয়ে যাওয়া বাপ পুলিশের হাবিলদার দধিরাম কর্ণবাহাদুর সিং শিয়ালদা ইস্টিশানে ছেলে অর্জুনবাহাদুরকে খুশিতে আপ্লুত হয়ে বলে, --বেটা, আমরা আসলমে বাঙালি, দিনাজপুরের দধিয়ায় আমাদের আদিবাড়ি । কলকাতায় আমরা একটা বাড়ি করব। নাম দেব দধিয়া। থাকবি এসে বেটা? ছেলের মুখে খুশির ঝলকানি দেখে দধিরামের আনন্দ আর ধরে না। গঙ্গাসগর যাত্রী নিয়ে কাটিহার এক্সপ্রেস ছাড়ল সময় মতো। রাত এগারটায় পাথরকলে ঢুকতে গিয়ে ধুতি ছিঁড়ল দধিরামের। কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে দেওয়া হয়েছে গেটে। ভেতরে কোন আলো নেই। দধিরামের গা ছমছমিয়ে উঠল। এতবড় মুছটা নেমে গেল নিচে। শীতের রাতে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে দধিরাম দৌড়ল ভুলভুলাইয়ায়।

ভুলভুলাইয়ার পথ বন্ধ । শ্রীহরিদা মালের ঘোরে অনেক কিছু বলল। বলল, পদা নেই। লিভার পচে পদা মরে পড়ে রইল তিন দিন। কেউ খবর করেনি। আঁৎকে উঠেছিল দধিরাম। পদার কোঁকানো আওয়াজে দধিয়া দধিয়া বাজছিল কানে । --ভাঙা বোতলেরউপর পড়েছিল বডি । আমরা যা পারিনি তুই কী করে করলি গুরু? পচা মরে গেছে, শ্রীহরিদা এত খুশি কেন?-- পাবলিক তোর উপর খুব ক্ষেপে আছে। --পাবলিক ক্ষেপবে কেন? কী করেছে দধিরাম? --তুই কিছু করিসনি। সব ম্যানেজ করে দিয়েছে কেশরীদা। এখন শুধু অর্ডার নিয়েই পালাবি। --কোথায় পালাব? কেন পালাব? আমি তো মারিনি পদাকে । --চুপ চুপ চুপ। এখন পালা, তোর মনমতো পোস্টিংই হয়েছেরে দধিরা। আবার নর্থ বেঙ্গলে। শ্রীহরিদার দধিয়া ডাকে আর গুস্সা হয় না দধিরামের। তার মাইএর আদরের ডাক দধিয়া আর তাকে বিচলিত করে না। তার আদিভুমি দিনাজপুরের গ্রাম আর তাকে আকুল করে না। লিভার পচা মানুষটাকে তার বড় প্রিয় মনে হয়। অন্ধ বাপের জন্যে প্রাণ কাঁদে খুব । শ্রীহরিদা বলল, --জমিটা তোরই রইল দধিয়া। কেশরীদা পাবলিকের হাত থেকে বাঁচাতে কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে দিয়েছে। যদি ডেভেলাপ করাতে পারি তোকে জানাব। --কেশরীদার সঙ্গে একবার দেখা হবে না দাদা? --কেশরীদা? ক্ষেপেছিস। স্থানীয় পুরপিতা এখন পুলিশি জুলুমের নিন্দায় মুখর। --কেন ? কেশরীদার কথামতোই তো আমি....., দাদা একবার দেখা হবে না। --না, এখানে তো নেই সেন্ট্রাল কমিটির কাজে চন্ডীগড় গেছে। আর থাকলেও দেখা হতো না। --কিঁউ নাই হোগা, কিঁউ ? --শালা ম্যাও করছিস যে খুব । রোয়াব দেখাচ্ছিস। কেশরীদা অর্ডার না করলে বাঁচতি না ব্যাটা। যা পালা।

হতভম্ব দধিরাম মনে করে পচার অভিশাপ, মনে করে সন্তানের মুখ । মছিপুরে ক্লাশ এইট পড়ুয়া অর্জুনবাহাদুর তার নতুন সখা। ভুল তথ্যে সে ছেলের হাসিমুখ চেহারা এক সাপের বিষে নীল হয়ে যেতে দেখে । ওঝা হয়ে ঝাড়ার ওস্তাদিও তো সে কেশরীদার কাছ থেকে শিখেছে। ছেলেকে গিয়ে বলবে, --বেটা আমরা বাঙালি উঙালি কুছু না । হামরা সব চুহামার বিল্লি। বাঘ শেরের জঙলে হামাদের কোন জায়গা নেই। অন্ধা বাপকে নিয়ে তার ভয় নেই। বাপের হিসাবে সে বরাবর ছাপ্পান্ন পন্নায়। মাই কিছু বুঝবে না। মহারানীকে কী বলবে ভাবতে ভাবতে নেমে যাওয়া মুছ চুমরাতে চুমরাতে নতুন করে ওৎ পাতার কহানি ভাবে দধিরাম।

অমৃতলোক, ১৯৯৬

ধারণমূল্য

মেঘ মেঘ আকাশের গতিবিধি বোঝার সাধ্য নেই কালোয়ার । ভোরবেলা বেরিয়েছে যখন মেঘবৃষ্টির নামগন্ধ নেই আকাশে। থাকলেও নৈবেদ্যর চূড়োয় বাতাসাই দেখেছে সে। উপরে যে অতসী ফুলের পাঁপড়িও ছিল খেয়াল করেনি। নীলচে ফুলের দল থেকে কালো বলির পাঁঠার দলে ছেয়ে যাওয়া আকাশ দেখে খুশিই হয়। কাজ হবে । কেরামতি ফলবে। শুরুতেই ভেল্কি দেখিয়ে দিল কদমালি কাকার গ্রাম মেঘদুপুর। মেঘদুপুর না সকাল সন্ধ্যা বার তেব বছরের বালক কী অত মনে রেখেছে গ্রামের নাম । শুধু মনে আছে ইস্টিশান ডাকপুর, রেললাইন ধরে পুবমুখি হাঁটিতে হাঁটিতে অনেকখানি। জেলা বোর্ডের কাঁচা রাস্তা ঢুকে গেছে গেরামের দিকে। তিনটে সোজা চারটে এঁকেবেঁকে । ব্যস, মেঘদুপুরের নড়বড়ে সাঁকো। এবার কাঠের পুল হয়েছে। কাকার উঠনে পা দিতেই ফর্সা। বাতাসাটি যেমন, ধবধবে আবার আকাশ । কাকার দাওয়ায খেলছে কয়েকটি অতসীর পাঁপড়ি। ছড়া গেয়ে নাচছে ঘিরে ঘিরে।

বিসমিল্লা গুণ কর

মেঘনার সাথে মেঘনির মিল কর।

পঁচিশ বছর আগের কালোয়া আর আজকের ল্যাংড়া ঠাকুর চণ্ডীও নিজের আবাধ্য বিসমিল্লা দিগম্বরী মাকে ডাকে। —মা মাগো, গুণ করে দাও মা। কদমালি কাকাকে বলে দাও একটু কেরামতি দেখাতে। পিতার স্বপ্নকে সাকার করতে যেন সাহায্য করে কাকা।

পঁচিশ বছর আগে পিতার হাত ধরে এই দাওয়ায় এসে উঠেছিল কালোয়া। বসারও সময় হয়নি, উঠানে ছড়ান সব ফুলের দলের সখ্যে মেতে উঠেছিল। গ্রামবালকের সঙ্গে খেলার মত্ততা দেখে পিতার পুলক হয়েছিল। এতবড় মানুষটারও কী শৈশব মনে পড়েছিল? কাকাকে বলেছিলেন, বুঝলে কদমালি, মানুষ বড়বেলায় এসে তার ছেলেবেলা সাজায়। জীবনের জটিল অঙ্গারক বাষ্প এড়িয়ে তাজা অম্লজান নেয় শৈশবের। কদমকাকা কী বুঝেছিল কে জানে। কালোয়াও সেদিন বালক ছিল। আজ বোঝে পিতার বাক্যে দীর্ঘ উপবাস ভঙ্গের পরিতৃপ্তি ছিল। উপলব্ধি করে শুধু অম্লজান নয়, শৈশবস্মৃতি ক্ষুন্নিবৃত্তিকারক আহার্যও বটে । কদমালি কাকার বাড়িতে সেদিন শুধু প্রাণ ভরে বাতাসই নিয়েছিলেন তিনি। জল, ফলাহারেও আপত্তি । কাকা দুঃখ পেয়েছিলেন।

কালোয়াও কিছু খাবে না ঠাকুর?

তা কেন, সব খাবে। শৈশবের কোন জাত নেই। গরিব কাকার বাড়ির মুড়ি কলা আর দুধের বিকল্পহীন জলপান আজও স্মৃতিতে অটুট রয়েছে তার।

আহার্যের স্মৃতি থাকলেও তার ফিরে আসার উদ্দেশ্য আহার নয়। নয় কাকার উঠানের শৈশব। ছেলেবেলা সাজাতে আসেনি সে। মেঘ আর অন্নজান কেরামতিতে যদিও বার বার বিভ্রান্ত হচ্ছিল। ভুলে যাচ্ছিল তার মেঘদুপুর গ্রাম ভ্রমণের উদ্দেশ্য। কাকার দয়া চাই তার। তার নিজস্ব একটি ছেলেবেলা চাই। কাকা বলেছিল সব পারেন। তার কেরামতিতে সব হয়। পিতা বর্তমানে কাকা কখনও বলেনি তার কবজ তাবিজ গুণবাণের কথা।

কাকার সঙ্গে শেষ দেখাও এক অদ্ভুত অবস্থায়। যেদিন তার মতিচ্ছন্ন হল। পিতার উত্তরাধিকারীর পৌরুষে প্রমাণহীন সংশয়ের প্রতিবাদ করেছিল যেদিন। এক স্বৈরিণী, খোকা সামন্তর বোন, তার দাদার স্ত্রী নিজের স্বামীর উপর অনাস্থা জানিয়েছিল। আর সে, তিরিশ ঘর এক পুকুর মন্দিরের সেবাইত চন্ডীঠাকুর পিসিমার কণ্ঠনালী চেপে ধরেছিল আক্রোশে। পিতাঠাকুরের স্বভাবের উত্তরাধিকার থেকে বিচ্যুত হয়েছিল। এত মানুষ থাকতে চারপাশে, প্রতিনিধান চেয়ে কাকাকেই কেন যে মনে পড়ল তার। যেমন চাওয়া তেমনি পাওয়া। দেখা দিলেন কাকা। দিগম্বরী মা আর কাকা এক চৌকাঠ কাছাকাছি। মায়ের যেমন বসনের বাহুল্য নেই, কাকা ঠিক উল্টো। কাকা বলেছিলেন, ভেক ছাড়া বেটা পেট ভরে না। জোব্বা লুঙিতে রঙবেরঙের তালি, জড়িবুটির ঝোলাটিও একটি নক্‌সি কাঁথার রূপান্তর। মুখের প্রশান্ত হাসি শুধু পিতাঠাকুরকে মনে পড়ায়। কালোয়ার জীবনের হারিয়ে যাওয়া অন্নজান যেন উপচায়। বলে,

কেরামতি জানেন কাকা?

জানি বেটা, পেটের জন্য জানি।

মেঘ নামাতে জানেন?

জানি।

হারানো জিনিস?

পারি।

বিয়ে দিতে পারেন?

কাকে?

কাকে আবার।

পারি বেটা সব পারি। করবি বিয়ে?

সন্তান?

কাকা বলেছিলেন সব পারেন। স্বপ্নের কেরামতি স্বপ্নেই মিলিয়ে গেল। মেঘদুপুরের পড়ন্ত বিকেলে। খোয়াবঘোরে কাকার গেরামে এসে মিছিমিছি হল। কদমালি কাকা কোন কালে চলে গেছেন পিতাঠাকুরের দেশে। পিতার অসার্থক স্বপ্ন বয়ে সাঁঝবেলায় ফিরে এল দুঃখী কালোয়া। কালোয়া নামে পরিচিতির আর একটা সূত্রও ছিন্ন হয়ে গেল চন্ডী ঠাকুরের। বর্ষণহীন মেঘ মেঘ আকাশ মাথায় নিয়ে এবার ফেরা। স্বপ্ন থেকে হাঁসের পায়ে থপথপানো অঙ্গারক বাষ্পময় জীবনে।

দুই

পিতা তাকে অনেক কিছুই শেখাতে চাইতেন। সে অনেক কথার মাপ পিতাপুত্র দুজনেরই ছিল অজানা। চটির মাঠের দুদিকে কাত হয়ে থাকা আকাশটাকে যেমন সে ধরতে পারেনি কোনদিন। পিতার প্রত্যাশাও ছুঁতে পারেনি। শেখার বয়সে শেখা হল না কিছুই। কিপ্টে ঠাকুরের ইচ্ছে ছিল সাধ্য ছিল না। জানতেন না, অর্থহীন স্বপ্ন সাকার হয় না। জানতেন না, যজমানির পাঁচসিকে দক্ষিণা আর এক ডালা সিধে নয় অর্থ। জানতেন না, ঘড়া ঘড়া অর্থ ছাড়া কিছু হওয়ার নয়। দুই শিশুপুত্র আর বালবিধবা কনিষ্ঠার প্রতিপালন করতে করতেই গলদঘর্ম ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ। পুরসভার মাগনা পাঠশালার পর আর কিছুই হল না দুই দ্বিজ বালকের। হুট করে চলে যাওয়ার কালেও কিছু রেখে যেতে পারলেন না রক্তাম্বর সম্বল ব্রাহ্মণ। কপর্দকহীন দুই অনাথ ভাইপো পিসিমার গলায় উল্টো পাকে জড়িয়ে থাকল অনেকদিন। খেতে দিল পিসি, মাতৃস্নেহ দিল না। না দিক, বাঁচিয়ে ত রাখল। তবু প্রতিবেশীরা পিসিকে ডাইনি অপবাদ দেয়। ম্যাজিক জানে বুড়ি। টাকাকড়ি কোথায় লুকিয়ে রাখে কেউ জানে না। রোজগারপাতি নেই, ফুসমন্তরে চালিয়ে যায় তিন পেটের খোরাক। শেষ পাতে এক পিস সন্দেশ ছাড়া কোন বিলাসও নেই পিসির। এত মধুরেও পিসির মুখটা মিষ্টি হল না। পিতাঠাকুর হেসে বলতেন, তোদের পিসি হল চিরতার জল। পেট ভাল থাকে, রক্তে শর্করার আধিক্য কমায়। দিনে কম করেও তিনবার পিসিমার পিত্তপ্রকোপ হয়। পিসেমশাইর নিত্যশ্রাদ্ধ না করে জলগ্রহণ করে না। অকালমৃত এক কিশোরের প্রতি আক্রোশ ধীরে ধীরে পিতায় ভ্রাতায় অবতরণ করে। এর পর এক যুবতি বধূ। তাদের মা। মাতৃকল্পনার মাধুর্য হারিয়ে যায় পিসির তির্যক মন্তব্যে। বলে, মুক্তিযুদ্ধের সন্তান। বলে, কালো গরুর ধলো বাছুর। কালোয়া চন্ডী তার গাত্রবর্ণ নিয়ে মোটেই গর্বিত নয় যত গর্ব তার অসিতবর্ণ পিতাকে নিয়ে। খর্বকায় কালো মানুষটির রোমময় বুকে শুয়ে থাকার মত নির্ভরতা কোথাও নেই। কিছুতে নেই। দুভাগ বুকের উপর শুয়ে থাকা যেন চটির মাঠের ঘাসমাদুর। বিশাল হৃদপিন্ডের ধুকপুক দু পাশ থেকে দুভাই স্পষ্ট শুনতে পেত। শুনতে শুনতে কুচুটে পিসিকে মাপ করে দিত। সেই মানুষটাকেই পড়শিরা বলত কিপ্টে। এত বড় বুকের মাপ যার সে কখনও কৃপণ হয়। সংসার প্রতিপালনে পিতাঠাকুর যজমান বাড়ির সিধে প্রসাদের কলা বাতাসা বেচে দিতেন গামছা শাড়ির সঙ্গে। পুটলি বেঁধে খুচরো পয়সা নিয়ে ফিরতেন। পিসিমাকে দিতেন। সৎপথে জীবন নির্বাহ করতে গলদঘর্ম পিতা নিন্দা কথায় কান দিতেন না। বলতেন, কুকথায় মন নষ্ট হয়। মানবধর্ম বিচ্যুতির আশঙ্কা দেখা দেয়। গরীব মানুষ এক শিষ্যবাহিনী ছিল পিতাঠাকুরের। উপদেশ দিতেন, ভাল ভাল কথা বলতেন। কোষ্ঠীবিচার ভাগ্য গণনা বিধান দিতেন। কর গুণতেন না। বলতেন গ্রহশান্তি দ্রব্যগুণ এসব আছে। রাহু কেতু শনি শুক্রর অবস্থান দেখে গ্রহরত্নের কথা বলতেন, বিধান দিতেন বৃক্ষমূলের। মূল বললেইত হল না, হদিশঠিকানাও দিয়ে দিতেন। জিলা মেদিনীপুর, গ্রাম মেঘদুপুর নাম কদমালি মিয়া। কার্ড একখানা পোস্ট করে দাও বাড়ি বয়ে দিয়ে যাবে শ্বেতভেড়েলা অনন্তমূল আরও কত রকমের বিকল্প শিকড়। সাবধান করে দিতেন, নকল শিকড়ে ফলংনাস্তি। ধারণ করে এসে প্রণামী দিতে চাইলে অজিত ঠাকুর নেননি কখনও। সৎ মানুষের সুনাম ছিল ঠাকুর মহাশয়ের। তবে সুনাম দুর্ণাম নিয়ে পিতা কখনও ভাবনা করতেন না। বলতেন, মানুষ হল গে শালিক পাখি। গাঙশালিক যেমন আছে, আছে গুয়েশালিকও।

গুয়েশালিকদের কথা শুনলে পিতার নিত্য ভিক্ষা তনুরক্ষার সংসারে এত সুখ থাকত না। পিতার মনে কোন ক্লেদ কোন সংশয় কখনও দেখা দেয়নি। এমনকি মুখরা ভগ্নীর প্রতিও সমান স্নেহশীল ছিলেন। লোকে ত বলে--বড় ভাইয়ের সিধে বিক্রির টাকা জমিয়ে বুড়ির লেপ তোশক তোরঙ্গের গুপ্তধন। মাটির তলায়ও লুকিয়ে রাখে পিসিমা। সে রাখুক, তা বলে যার শিল যার নোড়া তারই অনিষ্ট করবে। পিতার খেয়ে পিতারই বদনাম করত সহোদরা। সব কথার এক কথাই ত তার সম্বল। রঙ মেলানোর তুরুপ দিয়েই কাত করতে চাইত বড় মানুষটিকে। পিতা পুত্রের গাত্রবর্ণ চেহারা ছবি গড়ন বাড়নেই শুধু মিল নেই। স্বভাবে অমিল কি কোথাও দেখেছে পিসিমা। দাদা না করুক চন্ডী চেষ্টা করেছে মানে প্রাণে পিতার পুত্র হয়ে উঠতে। অকালে চলে না গেলে, বেঘোরে মার খেয়ে হাঁসের পায়ের ল্যাংড়া ঠাকুর হয়ে না গেলে সেও হয়ে উঠত পন্ডিত অজিতকৃষ্ণ ভট্টাচার্যর সার্থক উত্তরাধিকারী। অমিল যেটুকু সে ত জ্ঞানের, পাণ্ডিত্যের। পিতা সাবেক কালের পুরোহিত, টোলে পড়া সংস্কৃতজ্ঞ। আর সে পাগল চন্ডী, রোয়াকে বসে সিনেমার গল্প শুনেছে। বন্ধুরা সিটি মেরেছে, সে হেসেছে। পিতাকে লুকিয়ে বিড়ি খাওয়া সেও বালক বয়সেই। অজিত ঠাকুর অনেক কিছু জানতেন, জ্যোতিষ আয়ুর্বেদ পূজাবিধি জানতেন, করতেন নিষ্ঠাভরে। সন্তান মানুষ করতে চাইতেন মনের মত করে। বলতেন, অপাপবিদ্ধ সন্তানসুখে মৃত্যু হলে স্বর্গবাস হয়। অন্তেবাসী চন্ডী পিতাগুরুর কাছ থেকে অনেক শিখেছে। পিতা বলতেন, ইস্কুলে পড়ে চাকরি পাবি। গুরুমুখি বিদ্যায় হবি মানুষ। পাবি শিক্ষা আমার সব শিক্ষা সব উপলব্ধি দিয়ে যাব তোকে। সব কি দেওয়া যায়। বড় মানুষ পিতার ভিতরও একটা গুপ্ত কুঠুরি ছিল নিষেধের তালায় বন্ধ। সোনার কাঠি চাবিটা নিয়েই চলে গেলেন। ওরা যে মাতৃধনে বঞ্চিত, সে কথা, তাদের মায়ের কথা, নিজের স্ত্রী, সহধর্মিণীর কথা কিছুই বললেন না বেঁটেখাটো মনের ধনী বিশালকায় মানুষটি। বাস্তবতায় ভরা পুরুত ঠাকুরের এই একটাই মাত্র অভিমান। মার জন্যও দুঃখ হয় চন্ডী কালোয়ার, এমন একজন স্বামী পেয়েও দুঃখ হল তার। সে ত দাদার মত স্বামী পেয়েও বৌদির দুঃখ। তখন ছিল ছোট কালোয়া এখন বড় বেলার চন্ডী ভাবে যে মরল সে তাদের মাই কি শুধু, পিতাঠাকুরের কেউ নয় ? মনের ভিতর যে কত কিছু থাকে। কত যন্তর। মনের অসুখ মিউনিসিপালিটির জলকলের মত। অমরপল্লীতে রাস্তা ফুঁড়ে জল বেরলে যতক্ষণ না রিপেয়ার হচ্ছে, চার কিলোমিটার দূরের প্রফুল্ল কাননে একফোঁটা জল বেরবে না কলের মুখে। কোথায় দুঃখ, কোথায় ব্যথা!

তিন

জলকলের মিস্ত্রি খোকা সামন্ত ইলেকশন লড়বে। সঙ্গে থাকবে কে ? খোকাদার জন্য জান লড়িয়ে দিল চন্ডী ভট্টাচার্য। নাওয়া নেই খাওয়া নেই, মাটি ফুঁড়ে বেরনো হাফসূর্য প্রতীক সাঁটিতে সাঁটিতে সময় কোথায়? জলকল দেখে নিন, খোকাদাকে ভোট দিন। খোকা গুন্ডা জিতল না, সুবীরদা পার্টির ক্যান্ডিডেট, জিতবে সে নতুন কথা কী। পজিশন পোক্ত করতে গোঁজ দিয়েছিল। হেরেও খোকামিস্ত্রির লাভ হল। ওয়ার্ড মেন্টেন্যান্সের দায়িত্ব পেয়ে গেল। প্রাথমিক হিসেবে সেও হারেনি। ভোট লড়েনি গোরা চন্ডী। ঘুঁটি হয়ে এগোন পিছোনর খেলায় ছিল শুধু। ছিল দুটো কারণে। কারণেরও কারণ, তার ভিতরেও জট। পিতা ঠাকুর বলতেন, স্বার্থের শেলাই হল বাবুই পাখির বাসা। সে আর তার দাদার ভাগ্য জড়িয়ে ছিল ভোটে লড়া না লড়ার উপর। খোকা সামন্ত

এলাকার মস্তান, তার বৌদির ভাই। তখনও বৌদি হয়নি। হোমগার্ডের কনস্টেবল দাদার চয়েস দারুণ। চণ্ডীরও পছন্দ। বলেছে, তোমার দাদাকে জেতাতে জান লড়িয়ে দেব বৌদি। দ্বিতীয় কারণ, কমলি হিরা। কমলি তার এঁটুলি। গোবর হিরার মেয়ে। কমলা ধূপ, হিরা আগরবাতির মালিক। বেকার ব্রাহ্মণ সন্তানকে বলেছিল শিখিয়ে দেবে তার জ্ঞান দক্ষতা। মেয়ের বিয়ে দেবে। ওদিকে খোকা সামন্তর সঙ্গেও একটা গাঁটে বদ্ধ ছিল। বলল, একদান খেলে দাও বাপ। কমলিও থাকবে। কমলি যখন খেলবে তখন কিসের পিছপা। চল হাডুডুডু। লড়তে গিয়ে পা টাই হড়কে গেল।

ল্যাংড়া ঠাকুরের বৃত্তান্ত এরপর। কালোয়া থেকে চণ্ডীঠাকুরের মাঝামাঝি একটা পিতৃদত্ত নাম ছিল তার। শ্যাওলা পুকুরে চান করার, রকে বসে আড্ডা দেওয়ার দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার সাঁটার চণ্ডী নামের আগে অনেক বিশেষণ, পাগলা খেপা গোরা কালোয়া। মন্দিরদিঘীর তিরিশ ঘরের কেউই জানে না কালোয়া চণ্ডীর পোষাকি নাম। বৌদি জানে শুধু, বলেছে। বৌদিকে নিয়ে যে তার স্বপ্ন তখন। রাজপুরোহিতের ঘরে সৈন্যসামন্ত বলে বিষদাঁতে যতই গদ কাটুক পিসি, বৌদি তার ঘরের লক্ষ্মী। বৌদিকে দেখলে তার মায়ের মুখ কল্পনায় ভাসে। মাকে দেখা হল না, চিরতার জল পিসিও মা হতে পারল না। মা হবে দুধের কৌটোর বিজ্ঞাপন যেমন। শিশুকে দুধ খাওয়ানোর ভঙ্গি কী সুন্দর, মায়ের মুখে তখন স্বর্গের মমতা। ওরকম দৃশ্যে পিতৃস্মৃতিও প্রাণবন্ত হয়। পিতা বলতেন, সন্তানসুখেই পিতার সিদ্ধি। তার মনে হত বৌদিই পারবে। পিতার স্বপ্নপূরণ করতে দাদার স্ত্রী হয়ে এলেই পারবে। স্বর্গীয় অজিতকৃষ্ণ ভট্টাচার্যর নাতিব ভিতর দিয়ে স্বপ্নের উত্তরাধিকারী রেখে যেতে পাববে খোকাদার বোন। খোকা সামন্ত গুন্ডা হলে কী হবে, বোন তার ভিন্ন মানবী। ভালবাসতে জানে। তার দাদার জন্য জান কবুল। পিসিমাকে পটিয়ে বাড়িতেই বসত তাদের কদমতলা। শেলী লালীতেও গেছে। হাজার হলেও খোকাদার বোন ত, হোমগার্ড দাদার ডিউটি বেড়ে গেলে বেপাড়ার বিলু ছক্কাদের নিয়েও বেরিয়ে গেছে শুক্রবারেব ম্যাটিনিতে। পাড়ার মেয়ের ওরকম একটু আধটু হয়ই, কেউ গায়ে মাখে না। সেও কী কম সিটি বাজিয়েদের সঙ্গ দিয়েছে। চণ্ডীর পকেটে তখন কাঁচকাটা হিরা কমলি। বৌদির অনেক বন্ধু। পাড়া বেপাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মস্তি। হবে নাইবা কেন, ভাইবোনের সংসারে চিরতার জল পিসিমা বলে ত কেউ নেই। রাজ্যের সব আগাছা জমিয়ে রেখেছে। কিছু জমিয়েছে কিছু গজিয়েছে। কানা খোঁড়া টেকো ঝাঁকড়া নুলো সব পিস আছে। সিনেমা হলের ব্ল্যাকার দুখানা টিকিট দিল। মিনিবাসের কন্ডাক্টার টিকিট নিল না। অটো ড্রাইভার প্যাসেঞ্জার নামিয়ে উঠিয়ে নিল। ভাই মস্তান বলে নয়, বৌদির মত এত পরিপাটি হাসি দিতে পারে পাড়ার কোন ছুকরি। সাম্যবাদি হাসি, সবার প্রতি সমান। আবার পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে মুরগিপচাকে কষে থাপ্পড়ও মারতে পারে তার বৌদি। সেও ভয় করত পাড়ার হান্টারওয়ালিকে। দাদার সঙ্গে ভাব হয়ে পাল্টে গেল বৌদি। পিসিমাকে ভক্তিভরে প্রণাম করত, মা কালি সুইটস থেকে দুপিস সন্দেশ কিনে আনত। সৈন্যসামন্ত বলা পিসিমা পটে গেল। বিধান দিল, বামনির কোন জাত নেই। বৌদি সামন্ত ব্রাহ্মণী হয়ে গেল। তার ডান পায়ের দৈর্ঘ বেড়ে গেল দুইঞ্চি খোকা সৈনিকদের দাপটে। থেঁতলে থেঁতলে পায়ের পাতা হাঁসের পায়ের পাতা হয়ে গেল। এমন পেটান পেটাল দাদার শালা যে আর জি করে তিন মাসে তার নামটাই পাল্টে গেল।

লক্ষ্মণ ভাই ল্যাংড়া হয়ে বাঁচিয়ে দিল দাদাকে। পাগলা চন্ডীর ঠ্যাং খোঁড়া করে নার্ভাস হয়ে গেল খোকা গুন্ডা। খোকা সামন্ত প্রতিজ্ঞা করেছিল ভট্টাচার্য বংশ নির্বংশ করবে। সেই মানুষটাই ইস্টিকের আঘাতে থেঁতলে যাওয়া পা এবং খোবড়ার পেশেন্টকে নিয়ে গেল আকস্মিক বিভাগে। স্ট্রেচারে শুইয়ে রেখে আউটডোরের কার্ড করাল নিজে। চন্ডীর পায়ের রক্ত চুঁইয়ে পড়েছিল কাঁধে। ইলেকশন লড়া খোকা গুন্ডা হয়ত ভাবছিল নতুন শ্লোগানের কথা। শহিদের রক্ত দেখে যেমন হয় নেতাদের। খোকানেতার ধৈর্য আছে এলেমও আছে । মেরে পালিয়ে ত যায়নি। চন্ডীর নিজের ভাই তখন কোথায় ও দু জায়গায় একই সময়ে তখন দাদা। বৌদি বলেছে, ডিউটিতে। পিসি বলেছে, ঠাকুরঘরে। বৌদির কথায় বিশ্বাস করেছে ল্যাংড়া ভাই। পেশেন্টের আত্মীয় কেউ আছেন? কেরানিবাবুর প্রশ্নের জবাবে খোকা সামন্ত একবার কাঁধের রক্ত মুছে ছিল। ভগ্নীপতির ভাইএর নাম বলার সময় তোতলেছিল দুবার। চন্ডী ঠাকুর নামটা বলে ফেলে আর ঘাবড়ায়নি। যদিও যন্ত্রণায় কঁকিয়ে চন্ডী পিতৃদত্ত নামটা উচ্চারণ করেছিল শেষ বারের মত । কেউ শোনেনি। খোকাদার দেওয়া নামেই তৃতীয় জন্ম হল। পিতার নামে অপমানজনক ভুল সহ্য করেনি ল্যাংড়া চন্ডী। স্ট্রেচারের উপর আধমড়া জেগে উঠল। --আমার পিতার নাম স্বর্গীয় অজিতকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। তারপর কী হয়েছিল জানে না। হাসপাতালের তিন মাসে এক দুবার এসেছিল খোকাদা। পিতার শিক্ষা তালিম করেছে। হেসে কথা বলেছে চন্ডী তার ঘাতকের সঙ্গে।

হাসপাতালে শুয়ে শুয়েই শুনল বিয়ের খবর । দাদা বৌদি দুজনই এসেছিল। বলল, দেরি হয়ে যাবে ভাই। খোকাদার মর্জি যদি আবার পাল্টে যায়। --ঠিকই ত ঠিকই ত । পাগলা চন্ডী ও জোর দিয়েছিল। চলে যাওয়ার পর কেঁদেও ছিল অঝোরে। তার সম্পূর্ণ স্বপ্ন, পিতাঠাকুরের স্বপ্ন ঝাপসা হতে দেখে দুঃখ হয়েছিল। আর কে আছে তার বিশ্বসংসারে। ওষুধ বিষুদের ঝাঁঝালো গন্ধ দূর করতে ধূপকাঠি জ্বালিয়েছিল হাসপাতালে। পিতাঠাকুরের ঘরের বর্তমান দখলদার দিগম্বরী মাকে ডেকে অনুযোগ করেছিল, এমন কেন হল মা। দুটো দিন তর সইল না। মাকে বলবে কী কেঁদেই অঝোর ভাসিয়ে দিল। তার পরিকল্পনা ছিল ধূমধাম বিয়ে হবে দাদার, পুকুরপারে পটকা বাজি ফাটবে। জগন্নাথ ঘাট থেকে ফুল কিনে আনবে। দুভাই-এর দেড়া খাট নতুন বিছানা মশারি আর ফুলে ফুলে সাজাবে । ঘোষণা করবে এক বাসিন্দার উচ্ছেদ আর নতুন দখলদারের স্বত্বাধিকার। ঘরত মাত্র তিনটে, একটা গেলে থাকে পিসিমার আর মা জননীর মন্দির। দিগম্বরী ঘরই পছন্দ তার । পিতার আবাস । মায়ের পায়ে পড়ে থাকতেন কোনমতে। হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে পিতাকে স্মরণ করে সব ভুলেছে সে। পায়ের পাতাকে হাঁসের পাতা হতে দেখে ব্যথা ভুলেছে ঘরে ফেরার আনন্দে। ঘর মানে দুভায়ের দেড়া খাটে শুয়ে ঘুমনো নয়। পিসির ডাল চচ্চড়ি আলুভাতে নয়। ঘরেতে তার বৌদি এল গুনগুনিয়ে । ডাইনিবুড়ির গুমোর ভাঙতে রাজকন্যা তেতো জলে মধু ঢালবে এবার ভ্রাতৃবধূ। অনেকদিন পর বাড়ির মালিক হবে। একটা চাবির গোছ করে দেবে মালকিনকে । ঝমঝমিয়ে বাজবে বৌদির কোমরবাগে।

চার

পিসিমার গান শুনে সব ভুলে যায় চন্ডী। ভুলো মনটাই যে তৈরি করে দিয়ে গেলেন কিপ্টেঠাকুর পিতা তাই সব বুঝেও সে কিছুই বুঝতে চাইত না। পিসির চক্রান্তের শিকার সেই হয়েছে নিরন্তর। বারবারই ভেবেছে পিসিমা যাই করুক ভাইপো বলে স্নেহটুকু করে। সময়ে খেতে

দেয়। ধুমসো অনাথদের খবরপাতি আর কেই বা করে। আসলে পিসিমা হল গব্বর সিং। ঠাকুর তোর পা দিয়ে দে বলে ভাইপোর পা জোড়া কেড়ে নিল। পিসিমা খৈনিখোর ডাকাতটার মত মারব বলে মারে না। ঘুঁটি সাজিয়ে সব করে। দাদাকে ঠাকুরঘরে লুকিয়ে রেখে তাকে ছেড়ে দিল তোপের মুখে। খোকাগুন্ডার দলবল তার পা-কে হাঁসের পা করে ছেড়ে দিল। সারাজীবনের খঞ্জ। তাও চন্ডী সব ভুলে যায়, পিসি যে তার পিতৃসহোদরা। গান শুনে ভোলে পাগলা। রাইজাগো গায় পিসি, ভবসাগর গায়। অমাবস্যার রাতে গায়, নরমুন্ড নিয়ে খেলিস শ্যামা। কখনও বলে পিসি কৃষ্ণমন্ত্রী কখনও বলে আমরা ঘোর শাক্ত। দুপুরে একা একা পিসি দুঃখের গানও গায়, ক্ষণিকের মালাখানি।

মুড ভাল থাকলে পিসি কল্পতরুও হয়। কমলি যেদিন হামতুম-এর গান শোনাল, পিসির আমোদ হল। বলল, দূর দূর মুখপুড়ি। কমলিকে পছন্দ করত বুড়ি। হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার পর দুজনেই থাকত তার ঘরে। কমলির গান শুনে ঘর ছেড়ে যেত পিসি। ভাইপোর জন্য হামতুম। খোঁড়া মানুষের কী অত শখের শক্তি আছে তখন, কষ্টের হাসি হাসত শুয়ে শুয়ে। পিসিমা গেলে বৌদি আসত। খঞ্জ হয়ে সুখের চমক এসেছে বারবার ভেঙেছেও মুহুর্মুহু। পিসির নিপুণ চক্রান্তে সব ছারেখারে গেছে।

নতুন বিয়ের বৌদির জন্য দুঃখ হত একানড়ে ঠাকুরপোর। বড়লোক বাড়ির মেয়ে গরীব ঘরে এসে অনেক কষ্ট। সব বোঝে চন্ডী, কিন্তু বিছানায় পড়ে পড়ে কীই বা করতে পারে। ভাবে সুস্থ হয়ে রোজগার পাতি হলে প্রথমেই একটা বাথরুম করে দেবে। এতদিন কী ছিল, পুকুরে এক ডুডুৎ মেরে চলে এল জবাকুসুম গেয়ে। বৌদি যখন ওরকম চান করে ঝাপাস ঝাপাস বুকে গামছা জড়িয়ে ঘরে আসে, মাথা নুইয়ে থাকে চন্ডী। নোলা টসকানো হা লোকগুলোর মুখে পিসিমার কাঁচা ঘুঁটে গুঁজে দিতে ইচ্ছে হয়। সুন্দরী বৌদি খোকাদার বাড়িতে টাকা পয়সা দেখেছে। স্নো পাউডার নখের ঠোঁটের রঙ লাগিয়েছে বিস্তর। দাদা হোমগার্ডের চাকরি করে কত আর পায়। দেওর বৌদিতে টাকা রোজগারের পরিকল্পনা হয় দুপুরবেলা। দাদা থাকে ডিউটিতে, পিসিমার তখন তৃতীয়শখ। রাতের খাবার শেষে একপিস মিস্টি, যখন তখন গান আর দিবানিদ্রা। পিসির ডাল ঘ্যাট আর বৌদির শংকর মাছের ঝোল দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে রোজগারের ফিকির বাতলায় চন্ডী। বৌদি খুশি হয়। নিজের মানুষকে খুশি দেখলেই তার সুখ। সুখের মুখ দেখলেই পিতাঠাকুরের স্বপ্নকথা মনে পড়ে। দিন গোনে পিসিমার যদি আবার আমোদ হয়। যদি বলে, পাগলা তুই এবার কাকা হবি। ভট্টাচার্য পরিবারের এমন সুদিন যে কবে আসবে। পিতাঠাকুরের সব শিক্ষাই যে চন্ডী মাথার বুদ্ধি কোঠায় জমিয়ে রেখেছে। গচ্ছিত ধন উত্তরাধিকারীকে দিয়ে সে নির্ভার হবে।

কমলিও জেনে গেল পাগলাচন্ডীর পা আর সারবে না। খোঁড়া চন্ডী হয়েই থাকবে সারাজীবন। বৌদি কমলিকে বলে ধূপকাঠি বানানো শিখিয়ে দিতে, কমলি বলে বাবাকে বলবে। বলা আর হয় না। মন্দির দিঘীর এপার থেকে ওপার গোবরকাকার বাড়ি। ল্যাং চাতে ল্যাংচাতে বৌদির কাঁধে হাত রেখে চন্ডী পৌঁছে গেল কমলি নিবাসে। গোবরহিরাং বয়স হয়েছে। বলল, চোখে দেখি না, কমলিকে বল। শেষমেষ বিপত্তারণ বৌদির দাদা। খোকাদা বলায় কাজ হল। যা শিখল দেওর বৌদি, তাতেই ধূম পড়ে গেল। পিসি হাত লাগাল না। বলল, ওসব সকড়িমকড়ি, গোবরদলায় হাত লাগাব না। সকড়ি বটে, ভাতের ফেন দিতে হয়। গোবর মেশায় না চন্ডী ওটা ভেজাল।

বাড়িতে কারখানা হয়ে যাওয়ায় কমলিবাড়ি যাওয়া বন্ধ। কমলি এল একদিন। বলল, একটু গোবর মিশিয়ে নিতে, কাঠগুঁড়ো কম লাগবে, দাম কমবে। গোবরের মিশেল প্রস্তাবে একপ্রস্ত ঝগড়া হয়ে গেল দুজনের। কমলি জানে ল্যাংড়া মানুষের গোঁ, তাই তাতাল। পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করল। কমলি সেই যে গেল, তো গেলই।

কমলি আসলে ওরকম না। চন্ডী কালোয়ার বাল্যসখী। যে মেয়ে একা একা হাসপাতালে রাত জাগতে পারে সে ল্যাংড়া খঞ্জ হয়ে যাওয়ায় ছেড়ে যাবে? কমলির তখন দুর্দিন। গোবরকাকা ও চলে গেল হঠাৎ। একটা ভাইও নেই কমলির যেমন আছে বৌদির। কমলির পাশে দাঁড়ানোর মত কিছুই নেই চন্ডীর। পা দুটো হাঁসের পাতা হয়ে গেছে কবেই। খোকাদার সাকরেদি করে পায়খানা বাথরুমের কল লাগিয়ে হাফসূর্য বিলি করে যা জমিয়েছিল সব ফর্সা কোনকালে। কাঠি সুগন্ধের খরচা, ডাক্তার কবিরাজের খরচায় হাত শূন্য। দিশেহারা চন্ডী তখন তার বাড়ির গুপ্তধনে হাত দিল। পিসিমার শরণ নিল। আর পিসির ঝুলিতে কেউ হাত দিতে চাইলে রক্ষা নেই। তখনই ত পিসিমা নিকৃষ্ট জাতের শালিক পাখি। কমলির বাড়ির সামনে গিয়ে পিসি চেঁচাল অকথ্য। পিতৃদায়গ্রস্ত কমলিকে জড়িয়ে কিছু বলার ঝুঁকি নেয়নি পিসি। দেওর বৌদির ভাবসাবের তেলেভাজা ছড়িয়ে গেল মন্দিরদিঘীর চারপারের হাতবাড়ানো মুড়ির ঠোঙায়।

বৌদির কাঁধে ভর দিয়ে মন্দিরদিঘীর ওপারে যেতে যেতে স্বপ্ন বুনত বোকা চন্ডী। ধূপকাঠি বিজনেসের আয়ে ভরে যাবে তার তিনঘরের দখলদার বাড়ি। পায়ের চিকিৎসা হবে, সুস্থ হবে। দপদাপিয়ে হাঁটবে। বৌদিকে নিয়ে যাবে রথের মেলায়, সিনেমায়। খাবে আলুকাবলি, ফুলুরি। বৌদি ত বৌদি না শুধু। পুরুষ পুরুষ সংসারের মরুদ্যান। মা ও বোনের অপরিপূর্ণতার সমগ্র। বৌদির হাত ধরে অপলক চেয়ে দেখেছে তার স্বপ্নপুরীর মানবীকে। পেলবতায় মোড়া হাতদুটি বেয়ে সে চলে গেছে পিতাঠাকুরের স্বপ্নের ভিতর। যেখানে আগরবাতি কারখানার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠেছে এক শৈশবের খেলাঘর। ভাঙামানুষ চন্ডী এভাবেই নিজেকে জুড়তে চেয়েছে বারবার। আর পিসিমার বুদ্ধির খেলায় পর্যুদস্তও হয়েছে। পুকুরপারের শেষ বোমাটি যখন ফাটল, পাড়াপড়শির মধ্যস্থতায় কমলির দেখাশোনার দায় বর্তাল বৌদির ভাই খোকাদার উপর।

এর মধ্যেই এক একটা সুখের দিন আসে। হাঁসের পায়ের চন্ডী, বেকার চন্ডীর জীবনের শেষ সুদিন। ভুল দিনকে শুদ্ধ ভেবেছিল। ধূপকাঠিতে হাত পাকানো বৌদি একদিন তার দাদাকে নিয়ে ঢুকল মুন্ডমালিনী মায়ের ঘরে। মাতৃভক্ত খোকা সামন্ত মা মা বলে লুটিয়ে পড়ল সাষ্টাঙ্গে। সঙ্গে একটা হাফ প্রমাণ হাঁসের পায়ে। ভক্তিভরেই থেঁতো পায়ে প্রণাম করেছিল খোকাগুন্ডা। চন্ডী বিশ্বাস করে তাকে নয় খোকাদা প্রণাম করেছিল পিতাঠাকুরকে। পিতার রক্তাম্বর বেশ, মাথায় রক্তটিকার পরম্পরা ছাড়েনি চন্ডী। শুদ্ধাচারে সে কতটুকু তার জন্মদাতার সমকক্ষ জানে না তবে বেশভূষায় পিতা থেকে দীর্ঘকায়। সৌভাগ্য সেদিন একা আসেনি, কমলিও এসেছিল হাসিখুশি। প্রণাম করল তাকে। হাঁসের পাতা পায়ে হাত দিয়ে আঁতকেও উঠেছিল। দুজনকেই বলেছিল চন্ডী, আমাকে কেন, আবার। ওরা বলেছিল, ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ।

সৌভাগ্যের তৃতীয় স্তরে বৌদি। খোকাদা কাউন্সিলার না হলে কী হবে, এলাকার হোমরাচোমরা। বোন দাদাকে বলল, –একটা লোন করে দাও না ঠাকুরপোকে। ব্যাংক মিউনিসিপালিটি তো দিচ্ছে আজকাল। তোমার হেভি লাইন দাদা। পটে গেল জ্যেষ্ঠ। পুরসভার ঋণবিভাগের দালাল রবিদাকে

নিয়ে এল। ধূপকাঠিই স্থির হল। স্কিম ফিম করে সইসাবুদ করিয়ে নিয়ে গেল। ব্যাংকে জমা দেবে। খোকা সামন্ত বোনকে বলল, এসব গোবরকাঠির বিজনেস দিয়ে কী হবে রে বোন। ল্যাংড়াটাকে কেমন কাপালিক কাপালিক লাগছে বল। বলিস ত মন্দিরদিঘীর পূজারির কাজে লাগিয়ে দিই। লোনটা হলে রবিকে একপাত্তি দিস।

দশ হাজারের নেশায় পেয়েছিল সুন্দরী বৌদিদির। রবিদাকে নিয়ে এসেছে ঘরে, চা খাইয়েছে। রবিদা বলেছে এসব লোনের বড় ঝেং, ব্যাংকএর লোক আসবে ইনসপেকশান হবে। বছর গড়িয়ে বছর যাবে। ইচ্ছে হল দিল নইলে বলে দেবে কাজ জানে না, ল্যাংড়া মানুষ। রবি দালাল আর একটা কথাও বলল, ল্যাংড়া লুংড়াদেরও লোন আছে সরকারেব। হেন্ডিকেপ লোনএব টাকা ফেরৎ দিতে হয় না। বৌদি বলল, দুটোই দেখ রবিদা, তোমাকে একদিন আচ্ছা করে খাওয়াব। দিগম্বর মায়ের ঘর থেকে শব্দটা শুনল চন্ডী। খাওয়ার কথায় উম চকাশ পরিতৃপ্তি নিয়ে ফিরল রবিদা।

বেচারা বৌদি তার জন্য খাটছিল। দাদা একবারও বলল না, ভাল হল। ভাইটার হিল্লে হবে। দাদাকে নিয়ে কত স্বপ্ন দেখত কালোয়া। সেই মানুষটা পাল্টে গেল। দশ হাজার টাকার আগরবাতি আর অফেরতের তৈরী হেন্ডিকেপ লোন-এর খাটাখাটুনি করেও বৌদি তাকে সময় দিত। বসত, গল্প করত। আর দাদা ঘর থেকে শুধু ডাকত। বৌদি হাসত খিলখিলিয়ে। চিনাবাজারের মুক্তো ঝরত দাঁতে। চন্ডীও হাসত। সুধাময়ী বৌদির মিষ্ঠি মিষ্ঠি হাতদুটো ধরে বলত, যাবে না। বৌদি এলে একটা মমতার পরশ ছড়িয়ে পড়ত ঘবের কোণে কোণে। মমতাময়ীর হাতদুটো চোখে মুখে ঘষত। সেদিন ছিল বিশেষ পুলকের দিন। হাঁসের পাদুটোও নিটোল পূর্বাবস্থায় ফিরে যাচ্ছিল। উঠে দাঁড়িয়েছিল একা একা, ভ্রাতৃবধূকে জড়িয়ে ধরে পতন সামলেছে। তুমুল সমাচার যে জানাল বৌদি। তার সাধনার ফলে ভারি হয়েছে পল্লবী। দাদা পিতা, সে খুড়ো আর বৌদি হবে জননী। পিসিমা কী হবে। দিদা না ঠানদি। ডাইনি বুড়ির হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে সোনামণিকে। ভট্টাচার্য বাড়ির নতুন দখলদার আসবে। কাকা চন্ডীর চোখের কোণে জল চিকচিক করছিল আর অপলকে নবীনা মা জননীর মুখে তাকিয়েছিল। পিতাঠাকুরেব স্বপ্ন ছিল একটা সৎপুত্রের, মানুষের মত মানুষ সন্তানের। দরিদ্রের ঘরে এসব হয় না। হবে হবে। সে বেঁচে থাকলে সব হবে। ব্যবসা করবে, ধূপকাঠি হোক হেন্ডিকেপ হোক একটা মূলধন নিয়ে সে নামবে। ভট্টাচার্য বাড়ির সৎপুত্র মানুষ করতে খোঁড়া পায়ে ভেল্কি দেখাবে খুড়ো।

তারা দাদা ভাইও কেউ অসৎ নয়। সততার জন্যই দাদার হোমগার্ডের চাকরি। ভাড়ায় চালাত অটো। কুড়িয়ে পাওয়া কাগজপত্র ফাইল নিয়ে গেল পার্টি অফিস, পুলিশ। টাকাপয়সা কিছুই না, তাও তাকে নিয়ে হৈচৈ। নাম হল, চাকরিতে কাজে লাগল। কুটনি পিসি আজকাল উল্টো গায়। বলে, দাদা ঘুষ খায়। চন্ডী বিশ্বাস করে না। হোমগার্ড ত পুলিশ নয় যে ঘুষ খাবে। দাদা সাদা কাল টিভি কিনেছে, কেবল লাগিয়েছে। হুক দিয়ে কারেন্ট ঢুকিয়েছে। কী করবে বেচারা, বৌদির যে সিনেমার শখ। একটার জায়গায় দুটো টিকিট পায়, একে ওকে নিয়ে যায়। এরচে এই ভাল ঘরে বসে দেখ, মতি হবে। এখন খুশির সময়, ফুর্তির সময়, সিনেমা দেখুক বেশি করে। ভাল ভাল সব বই। শুনেছে সে পুরনো দিনের ছবি দেখায় টিভিতে। মহাতীর্থ কালীঘাট, বাবা তারকনাথ, নীলাচলে মহাপ্রভু। ভগবানের আশীর্বাদ নাহলে সুসন্তান হয় না। খুশির

বেলুনটা যখন অতি বেশি ফুলে উঠেছিল তখনই, একটা সাদা থানের পুটলির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে চুপসে গেল সব অহংকার। সাদা পুলিশ পিসি আর খাকি রঙের লেঠেল দাদার হাতে মার খেল এবার। বিষের পিসি কিছুদিন থেকেই বৌদিকে নিয়ে পাচন বানাচ্ছিল। তেতো জলে যে তাকে জড়াবে আবার ভাবতে পারেনি চন্ডী। অভিযুক্ত ব্যভিচারিণী সন্তানসম্ভবাকে টেনে নিয়ে গেল দিগম্বরী মায়ের চোখের থেকে। মা সব দেখেও প্রতিবাদ করল না। খড়কাদার মূর্তি জিভ কামড়ে দাঁড়িয়ে থাকল অপলক।

দাদা পেটাল বলে কী ভায়ে ভায়ে সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল! চন্ডী পাগলা তেমন পাগল ত নয়। মনের পুলক কেন অকারণ নষ্ট করবে। এখন শুধু অপেক্ষা । পিতাঠাকুরের স্বপ্ন সার্থক হওয়া। কখন ও ঘরে শৈশবের ডাক শোনা যাবে। আকাঙ্খিত ডাক চন্ডী শুনতে পায় না। কেবলের শব্দ হয়, বৌদির বন্ধুদের আসা যাওয়া হুল্লোড়ের মধ্যে এক বাঁশিওলার ডাক শোনা যায় না। অপেক্ষাই সার হয়। ভাইপোর জন্ম হয় না।

পাঁচ

অভিমানে বিয়ে পাগলা হয়ে গেল চন্ডী। সব ঠিকঠাক ছিল যার সঙ্গে । প্রাণের হিরা কমলির কথা মনেও আনে না। কমলা নামে বালক বয়সের সখি এখন তার বেয়ান। পরস্ত্রী খোকা সামন্তর ধর্মপত্নী কমলি বুদ্ধির কাজই করেছে। জীবন নিয়ে ত ছেলেখেলা চলে না। শক্তপোক্ত পুরুষ ধরেছে। বিয়ে করার আগে খঞ্জ মানুষটার জন্যও ভেবেছে। বাঁশের কাঠিতে কাঠগুঁড়ো গন্ধ মাখতে শিখিয়েছে। বরকে দিয়ে দশ হাজার টাকার লোন প্রতিবন্ধী ভাতার ব্যবস্থা করিয়ে রেখেছে। আর কত, ছেলেবেলার বন্ধুনি অনেক করেছে ।

কমলিদেখা ত কাউকে দেখল না খেপা চন্ডী জীবনে। বিয়ে পাগলা হয়ে কাকে ভাববে। কমলি ভোলাতে একজন এসেছিল । তার নাম লিলি। থ্রি-সির ড্রাইভার লিলির বাপের কামাই ছিল দুহাতে। আগের বাসকে টেক্কা মেরে মেরে প্রতিদিনই অ্যাকস্ট্রা ট্রিপ মেরেছে। মুড়ির কৌটো ঠেসে প্যাসেঞ্জার উঠিয়েছে। কখনও ধীরে কখনও স্পীডে কখনও ওভারটেক করে। যাত্রীর গালাগাল হজম করতে বিকেলের বরান্দ একপাঁইট বাংলা আর লিলির মার উপর এক রাউন্ড রদ্দা। চাঁপা গাছের বুলবুল পাখিটা মিল্ক কলোনির মোড়ে হাতের চক্র ডাইনে করতে বাঁয়ে করল। কেউ মরল না চোট জখমও না। ডাক্তার বলল স্নায়বিক। কাজ ছেড়ে দিল। বাসমালিক সমিতি লিলির মাকে সেলাইকল কিনে দিল। মা মেয়ে এক মেশিনে ইজের সেলাই করে বুকে পেটে দুডজন বেঁধে চলে মহাজন বাড়ি। কুড়ি তিরিশ চল্লিশ মা মেয়েতে পাল্লা দিয়ে পঞ্চাশ পর্যন্ত উঠেছে পূজার সিজনে। —কী হয় বলো ঠাকুর একদিনের পঞ্চাশ টাকায় । লিলি বলেছিল তার অন্তর্ধান হওয়া নিয়ে কাকের মুখে ছড়ান পিসিমার ভাত চচ্চড়ির ডেলায় খবরের প্রতিবাদ জানাতে এসে। —আমি বাড়ি ফিরি না রাত করে ফিরি, সব সত্যি ঠাকুর। পাড়ার কোন ছেলেকে নিয়ে ত পালাচ্ছি না । তবে কেন ঠাকুর! প্রতিবাদ নয় লিলি এসেছিল অজুহাত খুঁজে ল্যাংড়া মানুষটার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে। নইলে হাঁসের পায়ের চন্ডীর কী ক্ষমতা প্রতিবিধান করে। চন্ডীঠাকুরের ভাঙা জীবনে একটি মহার্ঘ সংখ্যা হল পুকুর পারের লিলি। মানবী সংখ্যার স্বল্পতায় একের বৃদ্ধিও অনেক। পিসিমাকে মানবী ভাবার, কোন রমণীর প্রতিরূপ কল্পনার সাহস হয়নি জীবনে। এছাড়া বৌদি আর কমলি। দুজনেই দূরের মানুষ। লিলিকে পেয়ে বিয়ে পাগলার সাধে আবার পুলক

জাগে। একবার দিগম্বরী মাতাকে দেখে একবার দেখে সর্বদা দেখার লিলিকে। পুকুরপারে দিনের দেখা যাকে দেখেছে সন্ধ্যের পর ঘোর লাগা চোখে বিভ্রম হয়। দিগম্বরী মা আর স্বল্পবসনাবৃতাকে একাকার হতে দেখে পাগলা ঠাকুর। পিতাঠাকুর বলতেন, মাতৃপূজার প্রধান উপকরণ হল কারণ। কারণবারি সেবন না করলে মায়ের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ হয় না। মাগো অক্ষম সন্তানের কথা রেখো মা! আমার পিতাঠাকুরের স্বপ্ন সাকার হতে দিও শুধু। একটি অপাপবিদ্ধ সন্তানের জন্ম হোক মা। রাতের লিলি এসেছে তার মায়ের পায়ের জবা হয়ে। মায়ের আশীর্বাদ হয়ে এসেছে দিনের বেলার পড়শি। কারণ ছাড়াই চন্ডীর ঘোর লাগে। লিলি তার খোঁড়া পায়ে মাথা খুঁড়ে, ঠাকুর আমাকে রক্ষা কর। আমাকে রক্ষা কর। আমাকে বাঁচাও। কে কাকে বাঁচায়। চন্ডীকে যে বাঁচাতে এসেছে সে বাঁচাবে তার সন্তানের জননীকে ! মাতৃমূর্তি লিলিকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ওঠে চন্ডী। লিলির মুখে তাকায় বিয়ে পাগলা। লিলিতেও তখন ঘোর, —আমার বড় পাপ ঠাকুর । আমাকে বাঁচাও। খোঁড়া পা তুলে রাখে মাথায় । শক্তিরূপিনীর ঘোর ভাঙে পাগল ঠাকুরকে ধ্যানস্থ রেখে। দৌড়ে চলে যায় দামাল ছেলের পাগলী জননী। পরদিন এক এক করে সন্দেহের কাপড়চোপড় ভেসে ওঠে পুকুরের জলদূষণ সঙ্গী হয়ে। লিলি মরল । কেন মরল রাতের বেলার দুঃসাহসিনী । পিসিমাকে পর্যন্ত বোকা বানিয়ে দিল লিলি, কোন কারণ খুঁজে পেল না হঠাৎ মৃত্যুর ।

ছয়

কমলি গেল, লিলি গেল তাও সন্তানের আশা ছাড়ল না বিয়ে পাগলা চন্ডী। কমলিকে ভুলেছে। লিলির কথাটাই মনকে উতলা করে বেশি। ভাবের ঘোরে মাকে ডাকে। দিগম্বরী মায়ের মূর্তিতে তাকিয়ে ভাব হয় ঘন ঘন । ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকে একঠাঁই শান্তি পাওয়া ছেলের মত। মায়ের মুখ নাড়ে, —ওমা! পিসিমার শাপশাপান্তর সঙ্গে একবেলা হবিষ্য একবেলা উপোষ দিয়ে বেশ রোগাপটকা নির্ভার হয়ে যাচ্ছিল চন্ডী। পিসি লোক ডেকে দেখায় চন্ডীর নতুন ভাবমূর্তি। নকুলদানা বাতাসা আর জবাফুল জমে যায় প্রতিদিন। পুকুরপারের বাসিন্দারা ভক্তিতে আপ্লুত হয়। বড় ঠাকুরের প্রতিচ্ছায়া দেখে মানুষ খেপা চন্ডীতে। দর্শনার্থীর ভিড় বাড়ে। পাশাপাশির বস্তি থেকেও দুঃখী মানুষেরা আসে। কদিনেই চন্ডীর বিবর্তন হয় । বাবাজি বনে যায় চন্ডীঠাকুর। পড়শিরাও আর পাগলা খেপা বলার সাহস পায় না। কমলির বর বৌদির ভাই খোকা সামন্ত আবার এল চন্ডীর ঘরে। এবার একা। কমলি পর হয়ে গেলেও একটা দেখার বাসনা ওর থাকেই। সাধুঠাকুর হয়েও ভিতরমন থেকে পুরোপুরি মুছে ফেলতে পারেনি কমলি সামন্তকে। খোকাদা ওকে প্রলোভন দেয়। তোর পায়ের গোছ ঠিক করে দেব, নতুন পা লাগিয়ে দেব ভাইটি। খোকা সামন্তর ভীরু চোখে চেয়ে আবার ভাব হয় চন্ডীর । পিতাঠাকুর প্রকট হন চোখের উপর। বলেন, --মনুষ্যত্ব হারাবি না কালোয়া। মানুষকে শত্রু ভাববি না। তঞ্চকতা নয় প্রতিশোধ নয়। মায়ের কাছে একমনে চেয়ে এনে দিবি। খোকাদাকে দেখেও তার দয়া হল। মাকে ডেকে বলল, —দয়া করে দাও মা। এককালের গুন্ডা মস্তানকে বলল, অমাবস্যার রাতে এস। একশ আট জবাফুলের মালা আর কারণ এক শিশি। পিতাঠাকুরই বলেছিলেন, মাতৃপূজায় কারণ চাই । লিলি এসেছিল, ঘোরটা ঠিকমত লাগলই না, অঘটন হয়ে গেল।

খোকা সামন্তর কাজ হয়ে গেল। মিউনিসিপালিটির কাজ। দুই ইয়ারে রেষারেষি। আসলে

সুবীরদার নিকট দূরের উপর নির্ভর করছিল। মার দিস। খোকাদাই কাছের মানুষ। মেরে দিল লটারি। চন্ডীঠাকুরের কেরামতি বাড়ল। ওদিকে মন্দির দিঘীর পুরুত শিবুঠাকুর ও চাকরি পেয়ে গেল সরকারি হাসপাতালে। বৌদির দাদা ল্যাংড়া বেয়াইকে বসিয়ে দিল মন্দিরের কাজে। ল্যাংড়া ঠাকুর সকালে যায় ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে, দুপুরে ফেরে। সন্ধ্যারতির বেলা মন্দির খোলে আবার। বড় মন্দিরে সবাই যায়, বাড়ির মন্দিরে দিগম্বরী মায়ের কাছে বিশেষ দর্শনার্থী। বৌদির ভাই বাড়িতে আসে। বৌদি আসে না।

এল না ত এল না। অভিমানে আর চন্ডীঠাকুর শুকিয়ে মরে না। শংকর মাছের ঝোল নাই বা এল। পিসিমার হবিষ্যি আর মন্দিরের ফলমূলে চন্ডীর গায়ে আবার মাংস লাগল। শিষ্য সংখ্যাও দিন দিন বাড়ে। পরজীবী মিনমিনে মানুষে আর নেই নবীন ঠাকুর। কথার পিঠে কথা বলতে বলতে আত্মবিশ্বাস তার তুঙ্গে। সব সমস্যার সমাধান করে তৎপরতায়। বাবা ছেলেটা বাঁচবে ত। বাঁচবে রে বাঁচবে। সব সময় সরাসরি বলে না। ফুল পাঁপড়ি দুটো হাতে দিয়ে বলে, বাড়ি যা। বিয়ের ব্যাপারে সব জেনে নেয়। কার সঙ্গে কার। এক জাতি এক গোত্র কিনা। পারলে দুপক্ষের মতামত নিয়ে সিদ্ধান্ত জানায়। না মিললে উল্টে চোটপাট করে। পিতাঠাকুর এসবের বিপক্ষে ছিলেন। বলতেন, চালাকি দিয়ে মানুষের মঙ্গল হয় না। চন্ডীও অমঙ্গল চায় না। জাগ্রত মন্দিরের স্থায়িত্ব যে নির্ভর করে সেবাইতের উপর। মন্দির নির্ভর অনেকগুলো পরিবার। নইলে তার কী, লেজ নেই ধড় নেই। খাওয়ার খাওয়ানোর কেউ নেই। তবু সচ্ছলতায় লোভ বাড়ে। বিয়ের লোভ, সংসারী হওয়ার সন্তানের মুখ দেখাব। অহার্যে লোভ ছিল না কোনকালে। ইদানীং লক লক করে। পিসিমাকে একদিন বলেই ফেলে, পিসিমা গো শাক্তবাড়ির ছেলে আমি, বলির মুন্ডটাত পাই, নিই না, বলে দিই খাই না। মাংস রেঁধে দেবে পিসি? পিসি আঁৎকে ওঠে। ছি ছি ব্রাহ্মণের বালবিধবা আমি, মাংস রাঁধব। অচঞ্চল পুরুত চন্ডীঠাকুব জানে সাহস করে এগিয়ে যাওয়াটাই আসল। বলে ফেললেই হল। উপায় একটা হবেই। পিসিমার মন ভিজে যায়। স্নেহের জল না দুরভিসন্ধি বোঝে না চন্ডী। পিসি বলে, নিয়ে আসিস। মুন্ডু মাংস গেল পাশের ঘবে। বৌদিকে দেখে না, বৌদির হাতের মাংস পায় এক বাটি। দুপুরে পরিপাটি। দিগম্বরী মায়ের ভোগ না লাগিয়ে চন্ডীর প্রসাদ হয় না। দ্বিপ্রহরে এই একটা সময়ই ত নিরিবিলি মায়েপুয়ে কথা বলার সময়। মাতৃমূর্তির সামনে চন্ডী বুজরুকির ঘেরাটোপ খোলে। খোলে তার রক্তাম্বর, খোলে একশ আট পঞ্চমুখি রুদ্রাক্ষের মালা। মুছে নেয় তেল সিঁদুরের টিপ। একা ঘরে মাংসের বাটিতে হাত দেয়। মায়ের অনুমতি নেয়, --খাই মা? পাঁঠার মুন্ড চিবোতে চিবোতে মনটাও হয়ে ওঠে রসালো। বন্দিনী বৌদির প্রতি প্রণয়ে দুর্বল হয় মন। এমন সুন্দরীবৌ পেয়েও দাদার সুখ হল না। দাদা পর করে দিলে কী হবে, বৌদির জন্য দরদে মনটা তার আকুল থাকে। পিসিকে বলেছে দাদার ছেলেমেয়ে হল না পিসি। পিসি বলে, এই নিয়ে ওদের নিত্য ঝগড়া, তোর বৌদিও..........। কী বৌদিও, পিসিমা সেদিন চেপে গেল। বলল, সবার জন্য এত করিস, কিছু একটা পারিস না। মন্দিরদিঘীর সপ্রভিত সেবাইত পিসিমার চাপাচাপিতে সন্দিগ্ধ দুঃখে পিসিমার শেষ ইঙ্গিতটায় মনোযোগী হয়। চন্ডীঠাকুর সেবাইতের অনেক শিষ্য অনেক পোষ্য অনেক গুপ্তচর। পিসিমার চাপা কথার ঝাঁপি ভেঙে সর্বনাশা সত্যের মুখোমুখি করে দিল বড়ঠাকুরের বংশধরদের। দাদার উপর অভিযোগ এনে পালাতে চাইছে খোকা সামন্তর সহোদরা। পুরুষত্বহীনতার প্রমাণহীন

অভিযোগ। মাংসের ঝোলে রসাভাস বিনষ্ট হয়। ব্যাদিত বিস্বাদবদনে দিগম্বরী মায়ের পায়ে লুটিয়ে পড়ে চন্ডী। পরিত্যক্ত মাংসের বাটি সামনে রেখে ধ্যানস্থ হয়। অন্যায়ের প্রতিকার চেয়ে মাথা কোটে। খড়মাটির মায়ের পায়ে মাথা রাখে। বলে, আর কতদিন অবিচার সইতে হবে, মা। পিতার স্বপ্ন সাকার করে একটি অপাপবিদ্ধ সন্তান এনে দাও। পিতাঠাকুরের বংশ রক্ষার দায় তোমার নিতে হবে মা। ঠিক আছে, তুমি ত কাঠিমাটির পুতুল, কিছুই পারবে না, ল্যাংড়া খোঁড়া মানুষ আমিই যা করার করব। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুরুষত্বহীনতার অভিযোগ স্মরণ করে কিছুক্ষণেরর জন্য পাগলা ঠাকুর চন্ডী রাগী হয়ে উঠল। মাংসের ঝোল গড়ান মুন্ড চিবানো অবস্থায় শুদ্ধচারিণী শাকাহারী পিসিমার দাওয়া ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকল। —পিসিমা আমি বিয়ে করব, তুমি মেয়ে দেখ। পিসি পাগলের কথায় হেসে উঠেছিল। পিসির হাসির অর্থ যে বড় ভয়ঙ্কর। অর্থ যদি পঙ্গু মানুষকে নিয়ে কটাক্ষ থাকত চণ্ডী রাগত না। পিসির হাসিতে তার পৌরুষে ঘা লাগল। অজিতকৃষ্ণ ভট্টাচার্যর মাংসাশী পুত্র ভয়ানক হয়ে উঠল। পিসির কণ্ঠনালী চেপে ধরেছিল, —কেন রে বুড়ি, আমি বিয়ে করতে পারি না? আমি অক্ষম? মারতেই চেয়েছিল কিন্তু সর্বংসহ পিতৃদেব যে মানুষ মারতে শিখিয়ে যাননি। বেঁচে রইল পিসি। পিসির মুখের হাসি মিলিয়ে গেল না, রাগল না, পাড়া মাথায় করল না, দাদাকে পর্যন্ত বলল না।

সাত

ক্রোধের শিকার হয়ে যাওয়ায় দমে গেল চণ্ডী। পিতাঠাকুরের শিক্ষার অংশটুকুও আর রইল না। বিয়ের লোভ দমিয়ে ফেললেও ক্ষমা প্রার্থনার সান্নিধ্যটুকুত হয় না। পিতাঠাকুরের স্বপ্নের দায় থেকেও মুক্তি হয় না। স্বপ্নে পিতার দর্শন পেয়ে মাথা হেঁট করে থাকে। পিতার এক সুহৃদও এসেছিলেন অপুত্রকের পুত্র হওয়ার মন্ত্র নিয়ে। স্বপ্নের আদেশ নিয়ে কালোয়া গিয়েছিল কদমালি কাকার গ্রাম মেঘদুপুরে। নশ্বর পৃথিবীর গ্রামে তাকে খুঁজে পারনি চন্ডী কালোয়া। তিরিশ ঘর এক পুকুর পারে একদিন তার দেখা হয় অন্য এক খর্বকায় পুরুষের সঙ্গে। অনেকটা শৈশবপুরুষ অজিতকৃষ্ণ ভট্টাচার্যর মত। পথ আটকে দাঁড়ালেন স্বল্পদৈর্ঘের পুরুষ মানুষ। ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে চণ্ডী তখন চলেছে নাইতে। পরনে গামছা, উপবীত সদ্য খুলেছে কান থেকে। মাটিহাত, চান সারবে একসঙ্গে। বললেন পুরুষ,

আপনাকেই খুঁজছি।

একটু দাঁড়ান, চানটা সেরে নিই।

আমার যে এত সময় হবে না।

তাই? ল্যাংড়া চণ্ডী মারল ঝপাস জলে। শেওলা মেখে উঠেও এল মুহূর্তে। বলল,

চলুন। চিনলেন কী করে। ল্যাংড়া ঠাকুর না পাগলা চণ্ডী? পাবলিক চিনিয়ে দিল?

আরে না আপনাকে চিনতে লোক লাগবে কেন?

বুঝেছি।

বলুন ক্যামন দ্যাখতাছেন।

আরে বাস, বাঙাল কথা যে।

খাঁটি বাঙাল আমরা ।

তাই ত বলি, আমিও ভটচায আপনিও ভটচায।

আমি ভট্টাচার্য।

তাইত তাইত । আপনার গোত্র?

আমরা শাণ্ডিল্য। গোত্র এক হওয়ার ধন্দে পড়ে যায় চণ্ডী। তাহলে ত হল না। একগোত্র বিয়ে হয় না। গোত্রের কথায় পিসিমা ও দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে ।

ভটচাযবাবু, সরি ভট্টাচার্য মহাশয় এক গ্লাস জল খাওয়াবেন।

দিচ্ছি। পেতলের গ্লাসে খটখটাখট টিউবওয়েলের জীবন ঝরিয়ে আনল চণ্ডী।

মুখ লাগাবেন না, ওপর থেকে । পিসিমা মুঠো করে দুটো বাতাসা গুঁজে দিলেন ভদ্রলোকের হাতে।

ব্রাহ্মণের বাড়িতে দুপুরবেলা এসেছেন । শুধু হাতে জল দিতে নেই।

আমার পিসিমা। অপ্রস্তুত চণ্ডী সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েও প্রমাদ গোনে।

আরে পিসিমা । আপনাদের দ্যাশ কোথায় বলুন ত ।

আর দ্যাশ!

কেন পিসিমা । আমরাও ছেড়ে এসেছি কবে । ফরিদপুরের ভাষা ছাড়ি নাই।

আপনি কে বাবা?

আমি? বলছি। তা ভট্টাচার্য মহাশয় এই বাড়িটা আপনার?

না।

তবে? ভাড়া?

জবর দখল ।

সরকারের ?

না, আমার পিতার । কালীঠাকুর আমি আর এই ঘরে । দাদা বৌদি বড় ঘরে । পিসিমা আরো বড় ঘরে। চারজনের দখল আপাতত।

আর পিতা?

উপরে।

ও, বেশ মজা করেন ত।

করি।

হাতের কাজ জানেন কিছু।

জানি।

কীকী।

হাত দেখতে জানি ।

জানেন । দেখবেন আমার হাত । দেখে দিন না। মেয়েটার বিয়ে দিতে পারছি না।

পারবেন না।

কেন? কেন পারব না?

স্বগোত্র দেবেন?

দেব মশাই । পাত্র ভাল হলে আবার গোত্র কিসের । গোত্র পাল্টে ফেলব। কোষ্ঠী বিচার করেন?

করি। আজ করব না।

কেন?

আজ বাবার জন্মদিন।

ও। শুধু ভ্যাজর ভ্যাজরে কথাই বাড়িয়ে যাচ্ছে দুজনে । নতুন কথা বলতে শেখা চণ্ডীও চালিয়ে যাচ্ছে অনবরত । মানুষটা কিছুতেই সম্বন্ধের কথাটা পাড়ছে না আর চণ্ডীও কেমন সমানে সমানে মঙ্গল কাটাকাটি খেলে যাচ্ছে। পিসিমা মাঝবয়সী মানুষটাব পথ কেটে ঢুকে পড়েন।

যার সঙ্গে কথা বলছ বাবা, কালীমন্দিরের পুরুত, কিন্তু বংশও কম নয় । বাজপুবোহিত বংশ।

আপনাদের দ্যাশই বললেন না পিসিমা।

রাজশাহী বাবা।

আমি গেছি, রাজশাহী কোথায়?

নাটোব ।

চলন বিলের দ্যাশ ।

যাইনি, শুনেছি।

ও । তা ভট্টাচার্য মহাশয়, মধ্যাহ্নের অতিথিকে খেতে বললেন না?

বলব বইকি । রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে যে।

রাত পর্যন্ত কেন?

বললাম না। আজ শিবরাত্রি । সারাদিন উপবাস।

তাইত তাইত । আজ যে শিবরাত্রির ছুটি । তাহলে খালি পেটেই কাজের কথাটা সেরে নিই।

বলুন।

আপনাকে হাতের কাজের কথা বলেছিলুম।

আজ হবে না । কাল আসুন । হাত না ধুয়ে আসবেন।

হাত দেখবেন?

দেখে দেব।

আপনি ধূপকাঠি বানাতেন না?

বানাতাম।

এখন বানান না?

না। আমার গুরু নেই। সেই কাঠগুঁড়ো নেই কাঠি নেই । গোবর আর ভাতের মাড়ে সকড়ি কাঠি আমি বানাই না।

লোনের দরখাস্ত করেছিলেন?

পাঁছ বছর আগে । আপনি কাউন্সিলার? নতুন হয়েছেন ?

না। ব্যাঙ্ক ম্যানেজার । দশ হাজারের জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলেন পাঁচ বছর আগে । চাইলে কিছু বেশিও পেতে পারেন, নেবেন?

না । আমার চাই না।

ঠিক ত ।

ঠিক ।

আশ্চর্য লোক মশাই । লোভ নেই?

লোভের কী আছে । কাজ করতে পারব না । নিয়ে কী করব। দেখছেন না ল্যাংড়া মানুষ।

পঙ্গু বলেই ত নেবেন । ব্যাঙ্ক দিতে চায়। ভেবে দেখুন । পরে বলবেন ।

নমস্কার করে বিদায় দিল নির্লোভি চণ্ডী । পিতাঠাকুরের মত দেখতে মানুষটাকে তার মন্দ লাগল না।

আট

যার যেমন বুদ্ধি। পিসিমার উপর আর চোটপাট করে না চণ্ডী। তাই হেসেই ফেলল। --ব্যাংক ম্যানেজারের মেয়ে কনে আর ল্যাংড়া ভাইপো বর । --তা এমনকি ফেলনা হল। দশ হাজার টাকায় বিয়ে হয় না? টাকাটা নিয়ে নে কালোয়া। পিসিমার সম্বোধনে আবিষ্ট হয় বড়বেলার চণ্ডী। দূরাগত ধ্বনির মোহে জড়িয়ে পড়ে । পিতাঠাকুর গত হওয়ার পর কালোয়া নামে কেউ ডাকেনি। পিসির কণ্ঠে শৈশবের ডাক শুনে ভিজে গেল মন । নিকট জনের আন্তরিকতায় বলল, না গো পিসিমা নেব না । কী হবে?

'কী হবে' কথাটা না বললেই হত । একটা কথা থেকে অনেক কাটা ছেঁড়ার অর্থ বের করে পিসি । আর নীরবে কোপটি মারে । কাউকে ঠিকঠাক বাঁচতে দেয় না পিতার ভগিনী । ভ্রাতার পরিবারকে সবসময় একটা ধ্বংসমুখি ঝাঁকুনিতে গতিশীল রাখে মহিলা। চণ্ডী কালোয়ার না শুনে আর এল না পিসি। বৌদি এল । বৌদি এল ঘর, প্রদীপ তুলে ধর । সন্ধ্যার আঁধার যখন হালকা প্রলেপ ছড়িয়েছে চরাচরে। উলু উলু উলু। ঘরে ঘরে তখন উলুধ্বনি । জবরদখল ঘরে ত আর বিদ্যুৎ থাকে না। দিগম্বরী মায়ের প্রদীপের সলতে উস্কে দিয়ে আলো জ্বালল গৃহবধূ। পাঁচ বছর আগে যে বধূ এসেছিল তাদের দখলদারি ঘরে । পাগলাচণ্ডীকে উৎখাত করেছিল দেড়া খাটের

অংশীদারত্ব থেকে। অনেক অনেকদিন পর সন্ধ্যাপ্রদীপ আলোয় দেখল এক ভীষণ অপরিচিতাকে। এখনও তার বৌদি সমান উদ্দীপক। উদ্দীপনা তার মনে তার দেহে। পিসিমার সঙ্গে ঘটনার পর চণ্ডী শিখে নিয়েছে সংযম। বৌদিকে সে চেনে, বৌদিও বেছেছে মোক্ষম সময়। দাদা নেই বাড়িতে, বৌদির বন্ধুরা নেই। পিসিমা নিশ্চয় ওৎ পেতে আছে কোথাও। কুচক্রী মহিলারই দূতী হয়ে এসেছে তার নির্বোধ ভ্রাতৃবধূ। কাছ থেকে দেখা সুন্দরীতমাকে এত মলিন লাগে কেন চণ্ডীর! দেহের উচ্ছলতায় পুলক কমে না চণ্ডীর। জলভরা কলসীর মত ছলছলাৎ অন্য এক মানবী।--মা মাগো! দিগম্বরী মায়ের সামনে এসে মনকে শান্ত করে। শান্তি কোথায়! মাও ত মেয়ে। মলিন আলোয় সকল বদনই কী একাকার হয়ে যায়। মাতৃমূর্তিতে বিরসতা দেখে চণ্ডী দুঃখিত হয়।--এমন কেন মা। তোমার ভাঙা ছেলে জীবনে অন্যায় করেনি বলে কী পদে পদে দমিয়ে রাখবে। কেড়ে না নিলে উপোসী রাখবে? তোমার সংসারে কী আমার জন্য কিছুই থাকবে না? মানুষ হতে চাইলাম, পিতাঠাকুরকে নিয়ে গেলে অকালে। বিয়ে করতে চাইলাম, পা ভেঙে খোঁড়া করে দিলে। সন্তানের মুখ দেখতে চাইলাম, পিতার স্বপ্ন সম্ভব একটি অপাপবিদ্ধ সন্তান চাইলাম। নিজের ত চাইনি। এখন আমার চাই। তোমার সামনেই অনাচারে লিপ্ত হব। কড়া কথা বললেও কী চণ্ডী তেমন সন্তান মায়ের! চক্ষু মুদে ধ্যানস্থ হয়। বৌদিকে সাবধান করে দেয়। --কেন এসেছ, চলে যাও। --না।--কিসের না, মায়ের মন্দিরে অনর্থ ঘটিও না, চলে যাও। --না ঠাকুরপো ফিরিয়ে দিও না। আমাদের অবস্থা খুব খারাপ। তুমি লোনটা হাতছাড়া করো না। আমি তোমাকে ধূপকাঠি বানিয়ে দেব। যা চাও তাই দেব। খোকা সামন্তর বোন নয়, অন্য এক মানবী যেন। পুরনো দিনের মত ধ্যানস্থ চণ্ডীর হাত জড়িয়ে ধরে।--হ্যাঁ করে দাও লক্ষ্মীটি। পিসিমার ঘটনার পর চণ্ডী অনেক ধীরস্থির হয়েছে। সতর্কতায় কলসির কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দেয়, ছলকে ছলকে মধু উপচায়। বলে,--বৌদি, অনেকদিন তোমার হাতের মাংস খাইনি। অনেক মাংস এনে দেব, মুণ্ডু নয় শুধু মাংস। তেল মশলা দেব। রেঁধে দেবে? --দেব না কেন।--ছোট একটুকুনি বাটিতে একপিস না আলু না, শুধু মাংস। বেশি করে। তৃপ্ত মানবী আশায় বুক বাঁধে। ভাবে, দশহাজারি সিদ্ধান্তটা তারই হবে।

অমাবস্যার রাতে চণ্ডীর খাটাখাটুনি অনেক। সকালে বলি তাই বিকেলের ডিউটি ফ্রি। তারপর ত সারারাত পুজো, ভোগ। মুণ্ড নিল না, পুরোহিতের ভাগের মাংস চেয়ে নিল। বাক্সের প্রণামী তালাবন্ধ থাকে, খোলাপ্রণামী কুড়িয়ে নিল। তেলমশলার মূল্য। অচিরেই মশলার দূরাগত ঘ্রাণ সংকেত পড়শি ঘরের সেবাইতকে উতলা করে তোলে। শরীরকে উত্তেজক ঘ্রাণের কবল থেকে রক্ষা করতে পুকুরের শ্যাওলা জলে ডুব দেয় বারবার যতক্ষণ না রক্তের আলোড়ন স্বাভাবিক হচ্ছে। বেলা দ্বিপ্রহর গড়ায়। মাংসের পাত্র থেকে উত্তেজক বাষ্প অন্তর্হিত। পুকুর পারের পড়শিঘরে তখন দিবানিদ্রার প্রথম প্রহর। পানপাত্রে সস্তার কারণ গন্ধে মাতোয়ারা হয় শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ। অজিতকৃষ্ণ ভট্টাচার্যর কনিষ্ঠ পুত্র। মাতৃমূর্তিকে সাক্ষী রেখে আচমন করে চণ্ডীপাগলা। খোকা সামন্ত এনে দিয়েছিল পাঁইট। কখনও খায়নি চণ্ডী। খেতে মোটেই ভাল নয়। মাংসের চাট দিয়ে বিস্বাদ ঠেকাচ্ছে। কড়া ঝাঁঝ ভিতরে গিয়ে বদলে দিচ্ছে তার শিরা উপশিরা ধমনীর কারুকাজ। বিদ্যুচ্ছটা বেরচ্ছে মাতৃদেহ থেকে। মাতৃদৃষ্টিতেও রোষাগ্নি। অসময়ে চণ্ডীর অনাচারে অসন্তুষ্ট। তিনটে বেলা ত তার আহারের সময়। অসময় কেন হবে? --মা

মাগো, বৃথা কাজে কেন জনম যাবে মা। পিতাঠাকুরের একটা মাত্র স্বপ্নও সার্থক করতে পারলাম না মা। মাত্র একবার অনর্থ ঘটিয়ে শান্ত শুদ্ধাচারী হয়ে যাব। তোমার কোলের সন্তান হয়েই থাকব। পিতাঠাকুরের বিকল্প হতে পারি কিনা দেখিয়ে দেব। নিঃঝুম পুরী, দাদা বেরিয়ে গেছে ডিউটিতে, যদি ওৎ পেতে না থাকে তবে পিসিও ঘুমে, শুধু অন্য ঘরে চুড়ির রিনিঠিনি তার মগজতন্ত্রীকে বিভ্রান্ত করছে? মায়ের শ্যামা দেহে তাকিয়ে থাকতে পারে না চন্ডী। লোভচিকচিক সন্তানকে কি মা ঘেন্না করছে! দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য পাগল ভেজা গামছায় ঢেকে দেয় মায়ের ঊর্দ্ধাঙ্গ। বসন পরান হলেও মায়ের দৃষ্টি থেকে ত তার রক্ষা নেই। সম্পূর্ণ মুখটুকুও ঢেকে দিয়ে চোখ খোলে চণ্ডী। এবার নিশ্চিন্ত। মা কথা রেখেছে। এবার তার স্বপ্নের সিদ্ধি।

কদমালি কাকার কেরামতি চেয়ে পায়নি। পিতা মন্ত্রের সাধন শিখিয়ে দিলেন না। লিলি কমলি কেউই চণ্ডীকে সিদ্ধি এনে দিল না। এবার সিদ্ধি নিজের কাছে। হাঁসের পায়ের কালোয়া তার গৃহলক্ষ্মীকে বলে ঝাঁপি খুলে রাখতে। দশ হাজার টাকা দিয়ে সে কিনবে একটি অপাপবিদ্ধ সন্তান।

অমৃতলোক, ১৯৯৯

মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া

নিশীথে

টানা চার বৎসর প্রেমের পরিণতি যখন বিয়ে হয়, তার সাধবাসনার নির্দিষ্টরূপ থাকে। আবার সে নিয়ে কেউ আঁখি ঠারে কথা বললে পুরুষধর্মে লাগে। যেমন লাগে অম্বলের ব্যথা। সন্ধিবাতের চাপা কষ্ট। চারের পর কুড়ি বছর ত বেশ চলছিল ঝনঝনিয়ে ঠনঠনিয়ে বেলোয়ারি চুড়ির মত রিনিঝিনিয়েও চলেছে, যখন কাশ্মীর গেছে হানিমুনে। কিছুদিন আগেও গেছে একাডেমিতে নাটক দেখতে, গঙ্গার পারে ভেলপুরি খেতে।

তা, হঠাৎ এই ব্যথাবেদনার, লাগালাগির কী হল? এক কটাক্ষেই কাতর হয়ে গেল জীবনানন্দ! তেরছা কথা বলেছে তার স্ত্রী সুরঞ্জনা মাস্টারনি! যেমন বলে, বলেছে কুড়ি বছর আগে পহলগাম ফেরত।

বিয়ে করে একটা মানুষের সঙ্গে প্রেম করা গেল না। শুধু মাস্টারি আর মাস্টারি!

এই তো কথা, কিছু মনে করেনি সে। কচি বয়সের বিয়ে, বৌকে পাকাবুড়ি ভাবতে পারেনি, তাই লিডর ঝিলমের বহমান চরিত্র নিয়ে, উৎস, ভৌগোলিক অবস্থান বুঝিয়েছিল। কে জানত ফিরে এসেই সরকারি বিদ্যালয়ে ইতিহাসের দিদিমণি হয়ে যাবে তার বৌমণি। ভুল করেছিল।

আর আজ, একটু আগে টকঝাল এক চিকেন প্রিপারেশনের প্রশংসা করে বলেছিল কিছু রসানুভূতির কথা। আলুবোখারা একটু কম জায়ফল বেশি দিলে যদি রেসিপি পারফেক্ট হয়, সে কথা বলতেই দোষ হয়ে গেল! রান্নার সঙ্গে প্রেমের সরাসরি সম্পর্কের কথাটাই বুঝিয়েছিল। বুঝিয়েছিল জয়িত্রি কম থাকলেও মাংস মাত্রেই কামের উদ্দীপক। সুরঞ্জনার গায়েও মাংসের গন্ধ ছিল। আসল কথাটা ওই। দিন গড়িয়ে রাত হলেই এসব অবান্তর বিষয় নিয়ে ঠুকাঠুকি করত সে। কাছাকাছির ছোঁয়াছুঁয়ির শরীর থেকেও ওষ্ঠাধরের প্রতি কাঙালপনা থাকলে যা হয়। চুম্বন আদায়ের চিত্ততোষ আতিশয্যে তার সব কথা। রাতে সুরঞ্জনার পুলক হয় না। অধরের সুখ কোন রাতেই হয় না, প্রেমের কোমল আলো হয় বরফনীল। জোরাজুরি শেষে রাগে অপ্রেমে মাস্টারনী ঝাড়ে ডায়লগ একপিস।

মুখে মুখ লাগিয়ে এসব সাহেবি কায়দা আমার একদম ভাললাগে না। আহত পৌরুষ

থেকেও খুচরো সংলাপ ছিটকে ছড়াল এদিক ওদিক ।

হেল হয়ে গেল দজ্জাল মেয়েছেলেটার জন্য সব ফিনিস হয়ে গেল । শালার একটু সুখ আহ্লাদও নেই বাবলাগাছের জীবনে ।

আর কাব্যি করতে হবে না । কী না জীবন তার আবার কাহিনী । দোষারোপ করে লাভ নেই তোমার ফেলিওরের জন্য তুমিই দায়ী ।

কিসের ফেলিওর? তোমার সেক্স নেই এর জন্যও আমি দায়ী?

নেই নয় উজবুকের সঙ্গে থেকে থেকে ফুরিয়ে গেছে । আর কিছু ?

আলবৎ বলব । উজবুক, ফুরিয়ে গেছে? শুনিয়ে শুনিয়ে বলব শুচিবাই মেয়েছেলের কথা। বিছানায় পড়েও শালার বায়নাক্কা, মাস্টারনি মারাবে ।

এসব কী হচ্ছে । একদম বলবে না, চোখ রাঙাবে না । আমি তোমার বাঁদি নই । বিছানা! বিছানা ত না রেপ সিনের ভিলেন, বাজে কথার ভিয়েন ।

আমি ভিলেন! প্রেম জানি না? এখনও এই বয়সেও একডজন প্রেম করতে পারি। লাগি শর্ত!

আর সম্ভব নয়, মুরোদ জানা আছে ।

কিসের, মুরোদ দেখতে চাও?

খন্ডযুদ্ধ হয়েছে অনেক, চার বৎসর প্রেম, কুড়ি বছর বিয়ের পর এমন মহালড়াই হয়নি আর । প্রথম ভাগে জয়পরাজয় নয় এক বিনাকারণ সংকল্পের আভাস থামে না । প্রতিপক্ষের অভিসন্ধীহীন অভিযান অব্যাহত থাকে ।

উপরোক্ত সংলাপ সারাংশকে 'ঘাউড়ি' এক ধরলে নিম্নোক্ত অংশ অবধারিত ভাবে 'পৃথ্বি' দুই । চলল মেয়ে রণে চলল, যুগ্মকের দ্বিতীয় ভাগ শুরু হয় 'শারী'বাদি ভনিতা দিয়ে, শুকসংবাদের কনটিনিউইটি নিয়ে ।

মুরোদ, ত দেখেই চলেছি । চাকরি ছাড়া কী করেছ, দেশোদ্ধারের বকুনি কবেই উবে গেছে। সবাই টপকে গেল, কপালের চড়চড়ে ফোঁটা বয়ে বেড়াচ্ছি আমি । উচ্চাকাঙ্খাহীন আমার করুণাকরণী প্রতিদিন সেলিমের ব্যাগ কাঁধে এইট বি-র বাসে লাইন দেয় । আর আমি, বৌ, পার্সন্যাল প্রপার্টি, চাকরি করি, থোড়বড়ি রাঁধি, ছেলেমেয়ে মানুষ করি, ভিলেনি সহ্য করি ।

তাই? ভিলেনি সহ্য করি! এতসব ছিল তোমার মনে, বলোনি কেন, হিরো হয়ে দোল খেতাম তোমার মনের পিঞ্জরে । আহারে!

ন্যাকা!

আদর্শবাদি মাস্টারনির মনেও এত ভন্ডামি! হবে নাই বা কেন । কাঁচাখেকো বিপ্লবী ভাই যদি এম এল এ পর্যন্ত হতে পারে! ছিল রুমাল হয়ে গেল শুওর ।

অ্যাই একদম বাজে কথা বলবে না ।

কথা বাজে নয় মোটেই মাস্টারনি ম্যাডাম । তোমার ভাইই এম এল এ এম পি দের বলত।

আমার ভাইএর নখের যুগ্যি হওয়ার মুরোদ নেই তোমার ।

আমার মুরোদ? দেখতে চাও?

এ যুদ্ধেও কেউ জেতে না। প্রশ্নবোধক এক শপথের পর দুজনেরই পশ্চাৎদর্শন। ঘুরে শোয়। চলতা হ্যায়, বেডরুমদৃশ্য এবং সংলাপে সবই চলে। ওখানে মহান নেতা বিজয় সিং এর রক্ষিতা শেফালি আর পিজিটি শিক্ষিকা সুরঞ্জনার কোন ফারাক নেই। নেই জনপ্রিয় লেবার অফিসার জীবনানন্দ আর রাজনীতি ও মেয়েমানুষের দালাল কিরণকুমারে! তবে মাত্রাধিক্য দোষে চারের পর কুড়ি পেরনো সিলভার জুবিলি রাতে ব্যাটাছেলের পৌরুষে ঠোক্কর লাগল। মাষ্টারনি বৌকে শিক্ষা দিতে হবে। অর্থ ক্ষমতা আর মেয়েমানুষ, জোড়াশপথের কথা মনে রেখেই কি না কে জানে, উল্টোপাকে শুয়ে শুয়েই পরদিন অফিসে গিয়ে কান্ডটা ঘটানোর প্রস্তুতি নেয় জীবনানন্দ।

এক

রমার ঘটনায় রাজনীতি কোথাও ছিল না। খবরের কাগজের বিষয়। হাওলা সবে শুরু হয়েছে। কলকাতার অফিসে এমন আকছারই ঘটে। কাগজ কেনা হয় আটখানা, খবর নিয়ে ভাষ্য হয় একশ আট। কাগজকুলেও বর্ণাশ্রম আছে। 'দেশপ্রেমিক' ধর্মপ্রাণ 'কালপরশু' লালক্ষত্রিয়, 'এই সময়' তরমুজ, 'স্টেটমার্কেট' সর্বঘটে। দেশপ্রেমিক পড়ে রেগে গেল রমা।

শুধু একটা পার্টিকে খতম করার জন্য এ হল চাণক্য চাল। একদিন হিন্দু নামটাই মুছে যাবে দেশ থেকে।

সত্তর সালে চট্টগ্রাম ছেড়ে আসা সহকর্মির মন্তব্যে উত্তেজনা ছিল না উচ্চগ্রামে, প্ররোচনাও স্বল্প। সাদাসাপ্টা মনের ঘরসংসারে মানুষ, সাতখানা কাগজ পড়ার অ্যাক্সপার্টাইজ ফেলে কোথা? পুরনো স্বদেশস্মৃতি ভোলা যায় না। স্বামী দেবতাটিও নাকি মনে মনে ক্ষত্রিয়, লাল পার্টিকে ভোট দেয়। বুদ্ধিমতী গৃহশান্তি নষ্ট করার রিস্ক নেয় না। দপ্তরে বসে মনের দুঃখ লাঘব।

রমার মুখের চিলতে হাসিতে,তখন সুরঞ্জনা মাস্টারনির কটাক্ষ। রমার কথায় প্রতিবাদ। পালটে গেল সব, হঠাৎ রাগল। এমন সে করে না, ভালমানুষ মেয়েটাকে লুকিয়ে চুরিয়ে দেখে সারাদিন। সুরঞ্জনা রিলেটেড একটা আলাদা ভ্যালু খুঁজে পায়। নিরামিষ চোখে দেখার মাপ। সুরঞ্জনায় যা আছে, রমায় কতটুকু? ধারে ভারে এবং সাইজে। রমা শেষটায় তার স্লিম বৌকে পেছনে পেলে অনেক এগিয়ে। কালপরশুতে খেলার খবর দেয় বেশি! চাণক্য সংবাদ মাঠে মারা যাওয়ায় রমা খেলার খবর নিয়ে সরব হয়। সুরঞ্জনাও ই এস পি এনএ ক্রিকেট দেখে মতামত দেয়। রমাকে শুনিয়েছিল এক সরল মেয়ের জোক। চোখ ঢাকা সানগ্লাসে, হাত ল্যাপডগে, কান ওয়াকম্যান ভাষ্যে — বল সিলি মিড অন গলে বেরিয়ে গেল, চার! মহিলার আক্ষেপে ইডেনের কংক্রিট গ্যালারিও নাকি হেসে উঠেছিল ফিক করে। —মিড অনটা কী সিলি! রমাও হেসেছে, বলেছে খেলাধুলা মেয়েদের বিষয়ই নয়। টেঁটিয়া বৌ সুরঞ্জনা মানেনি। বলেছে নারীবিদ্বেষী।

আজাহারের ক্যাপ্টেন্সি, উৎপল বাদ, সৌরভ বাদ, বিতর্ক। বাংলার প্রতি বঞ্চনার স্বপক্ষে টুপটাপ যুক্তি জমা পড়ছে সূত্রধারিণীর কোলে।

পাকিস্তানের সঙ্গে খেলা থাকলেই শূন্য, কপিলকে বলই করতে দেয় না এমন অধিনায়ক!

শুরুতে প্রতিবাদ করেনি সঠিক সূত্র ধরিয়ে দিয়েছে ।

খেলা খেলাই ম্যাডাম ওখানে রাজনীতি কেন?

রমা উৎসাহিত হয়েছে ।

খেলা নয় স্যার, ওদের চেনেন না । আমি চিনি, দেখছি ।

কী দেখেছ?

দপ করে পারা চড়ে । কুড়ি বছর প্রতিবাদহীন জীবনের বিপ্রতীপে মাস্টারনির অবজ্ঞা মনে করায় তার প্রতিজ্ঞার কথা ।

রমা সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী এবং যুবতী ষোলআনা। চাকরি করতে করতে জেনে গেছে একটু ড্যাসিং পুসিং এবং ছল্লাবল্লার মিশেল দিলে অ্যাডভান্টেজ পাওয়া যায় । স্যারকে বললেই ঘন্টাখানেক আগে ছুটি পাওয়া যায় পেটি কেসে। অফিসকে পঞ্চাশটা নারকেল নাড়ুর প্রিমিয়াম দিলেই লক্ষ্মীপুজোর আগের দিন হাফডে থেকেও কম। এছাড়াও আছে বিভিন্ন রকম। মেয়ের দাঁতের ডাক্তার, চিফ মিনিস্টারকে দেখেন যে অনেক কষ্টে পাওয়া গেছে ডেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারের ডেট । দূর্বাদির বাড়ি গানের স্লট পাওয়া গেছে বিকেল চারটেয় । ট্যালেন্টেড মেয়েকে ময়দান উত্তর পাড়া ডোভার লেন ছুটি নিয়ে। সেদিন রাগের প্রশ্ন 'কী দেখেছ'র পারা নেমে যেত একটু সামনে এসে বসলে। যেমন বসে ছুটি চাওয়ার দরকারে, ফিসফিসিয়ে জানায় না গেলেই নয় এর সমাচার । সেও কী হারিয়ে যেত না বমার মুখে, মুখ থেকে বুকে, বাস্টলাইন এত সুন্দর হয় ওনলি বিমল জামার আগুনরঙে! না যেত না, কুড়ি বছরের পাল্‌টি খাওয়া বৌএর সঙ্গে সে রাতে মাংস নিয়ে একটা ঘটনায় জড়িয়ে না পড়লে রমাকে ওরকম কথাই বলত না । প্রয়োজন নেই তাই রমাও এল না ।

মাস্টারনির বিরুদ্ধে সংকল্প মাথায় রেখে, হারিয়ে যাওয়া রাগ এবং প্রশ্ন ফিরিয়ে আনতে রমাকে বলেছিল, সে গোমাংস খায় । ঔষধ কাজ করেছিল প্রত্যুত্তরে ।

ওসব খেয়ে গর্বভরে জানানোয় বীরত্ব নেই স্যার ।

সত্যি খায় ত খায়, জানাতে হবে কেন। সুরঞ্জনা খায়, কৃষ্ণা খায়, মেয়ে। ছেলে কিষাণও খেত। এখন খায় না, মেডকাউ এর পর ইউরোপের মানুষ নিরামিষাশী হয়ে গেছে পুলেরহাট, বেলডাঙা থেকে ফুলকপি বাঁধাকপি সয়াবিন এক্সপোর্ট হচ্চে বাকিংহাম প্যালেসে গোমাংস আর বিধর্মীর কথায় ঘৃণায় রমার রক্তচাপ বাড়ে ঝলকে ঝলকে। রাগলে মুখশ্রী অসুন্দরই দেখায় স্বাস্থ্যবতীর ।

আপনি স্যার আধা মুসলমান ।

ক্রোধের ভদ্রতায় নারীর শরীর দোলে । তালিবানরা যেদিন মেয়েদের অফিস যাওয়া বন্ধ করেছিল, বিশেষ ডিজাইনএর দমবন্ধ বোরখার ফতোয়া দিল, সেদিনও উল্লাসে রমার শরীর দুলেছিল ।

সেও রেগেছিল । মাস্টারনি বাহিত রাগ । কুড়ি বছর ঘর করার পর বলে কিনা সে তার বাঁদি নয়, তার মুখের গন্ধ সহ্য হয় না । রমার রাগের চোখ মুখ শরীর আভরণ তাকে রাগিয়ে

দিল আরো, কাল কাপড়ে ঢাকা একটা গম্বুজ বা ইগলুর মতো মুখোমুখি সহকর্মিণী তাকে বিরক্ত করল। কত আর সহ্য করা যায়, দু মুখো দুই নারী পুরুষের ধর্ম মাড়িয়ে যাচ্ছে বারবার। একটু সমীহ করছে না। লিঙ্গ ভেদের দুর্বলতা আর সংরক্ষণের সুযোগ নিচ্ছে রাতে এক নারী দিনে অন্য। রাতের শপথ স্মরণ করে স্থির করে নেয় ইতিকর্তব্য। প্রতিবাদহীন থাকলে চলবে না। মাস্টারনিকে দেখিয়ে দিতে হবে বীরভোগ্যা বসুন্ধরা প্রবাদের সত্যতা। সত্য যাচাই করতে সে রাগে।

তোমার ধর্মেও তোমাদের অবস্থান কোথায় ভেবে দেখেছ, একটা সৌন্দর্যের পেজেন্ট নিয়ে কী কান্ডটাই না হচ্চে। কে এক শঙ্করাচার্য ফতোয়া দিল বেদ পাঠের অধিকার নেই। এত যে নারীবাদ, কিছু করতে পারল মেয়েরা! তোমরা সব ভোগ্যপণ্য ম্যাডাম, সন্তান উৎপাদনের মেশিন, সম্ভোগের পাত্র, গাভীর মত।

যদিও অশ্বত্থামা নামের কুঞ্জর কথা বলেছিল শেষে। জুড়েছিল।

বলেছেন শাস্ত্রকারেরা।

ওসব বললে কী আর হয়। যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে, সবাই শুনেছে। মহিলা কর্মচাবির সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার জনিত মিসকন্ডাক্টের বিপক্ষে যুক্তিদর্শানোর দায় রইল তার উপর। সেক্স হ্যারাসম্যান্টের সাজা কম নয়। সময় দশ দিন। নাবী জাতির প্রতি তার বাণী বচন যাবা শুনেছে তারাও এ অপমান ভুলছে না ভুলবে না জানাল। হোমশিখায় মুহুর্মুহু আহুতি থেকে বক্ষা পাওয়ার কোন উপায় থাকে না জনপ্রিয় শ্রম আধিকারিকের। চার্জশিট আর আন্দোলনের প্রক্রিয়া চলল যুগপৎ।

দুই

ছাত্রজীবনে আন্দোলন দেখেছে নেতাও দেখেছে বাঘা বাঘা। দিগ্বিজয় সিং ছিল তার হিরো। আঠারো বছর বয়স যেমন চায়। মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে আই এলও জেনিভা হয়ে মার্ক টোয়েনের সমাধিতে বসেও তাকে মনে রেখেছে বিজয়দা। বিঠোফেনের সিম্ফনি এনে দিয়েছে পঁয়তাল্লিশ আর পি এম এর। বলেছে,

তোর মিউজিক সেন্সটা ভাল। এ জিনিষ এ দেশে পাবি না।

কী উন্মাদনার দিন ছিল, হারমোনিয়াম দাবড়ে সুর বের করত। তার সপ্তকে চড়ত গলা। তখন গানের দিন। মাঠের গীত, ক্ষেত খামার কলকারখানা আর মিছিলের গান। হেই সামালো ধান হো, সলিল চৌধুরী নজরুল রবসন হেমাঙ্গ বিশ্বাস। মাস্টারনি তার চড়া তারে গান গাওয়া পছন্দ করত না। সুবীর সেন আর তালাত মামুদের মিঠে সুরের ভক্ত ছিল। ব্যস, গানের গলা ভোগে।

ভাঙা রেকর্ড দুটো দেখলে এখনও ঘুষঘুষিয়ে ওঠে রাগের জ্বর। বিজয়কে দেখলেও উঠত। বাঙালি ইউরোপ আমেরিকা গেলেই বক্তৃতায় বিশ্বজয় করে। গান্ধিবাদি নেতা দেশে ফিরে আরো জ্বালাময়ী হয়ে উঠল। পশ্চিমের ভোগবিলাসের নগ্নতা আর ভারতবর্ষের কৌপীনবস্ত্র ত্যাগের বৈভব নিয়ে ভাষণ শুনতে কারখানার গেট উপচে পড়ে। যুবনেতার সামনে খোলা বিধানসভার গেট, হস্তগত রাষ্ট্রক্ষমতার এক সবখোল চাবি, যে কোন অন্ধকারকে খোলার অনবদ্য

ডিভাইস। গাড়ি আর ছুটারে আভাস পাওয়া যেত বিজয় মন্ত্রীর র‍্যালা।

আঠারো উনিশের বোকা বয়সের প্রেমিকা ছিল শেফালি আর দোস্ত কিরণকুমার। বিজয় সিংএর ল্যাজধরা ছিল কিরণ। কিছু এনে দেয়নি বিদেশ থেকে। সুন্দর দেখতে রেকর্ড দুটো নাড়াচাড়া করত, বাজালে বিরস বদনে শুনত। ডো রে মি র উল্টোপাল্টে বাজনায় বেজার হয়ে কিরণ বাজাত গঙ্গা যমুনার গান, দো হন্‌সো কা জোড়া। খুশিতে চেঁচিয়ে বৈজয়ন্তীমালাকে ডাকত, হেই ধন্নো। শেফালিকে বলত, গুরু তোমার ধন্নো। বলত, তোমার লাভার।

লাভারের বুকের কালো আধুলিটা যেদিন দেখল বিজয়দার হাতে, প্রথম প্রেমের সমাধি কড়কড় করে বাজল শ্যামল মিত্রের গলায়। দিগ্বিজয় সিংএর কোলে চানঘরে দেখা দেখল তার প্রথম প্রেম ধন্নোকে, ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের উপরও আর টানভক্তি থাকল না। প্লাস্টিকের রেকর্ড ভাঙার চেষ্টা করেছে দুমড়ে মুচড়ে। পারেনি, এখনও রয়েছে অকেজো।

ধন্নোর প্রেম শুধু। এছাড়া কোন দোষ ছিল না তার। তাই হয়ত সুরঞ্জনা দেখেছিল, স্পষ্ট করেছিল, টোকেন ফিরিয়ে ভাঙিয়ে এনেছিল দাদার দলে। ষোল বছর বয়স থেকেই যে মাস্টারনি। সিনেমা স্টাইলের হিরোইন, আদর্শবাদি নেতার সেয়ানা ছোটবোন। বিজয় সিং হিরো থেকে জিরো হয়ে যাওয়ায়, সর্বহারার নেতা আন্ডারগ্রাউন্ডের আতঙ্ক চিররঞ্জনের কাছে নাড়া বেঁধেছে তখন, সর্বনাশা সত্তর যখন। শখের বিপ্লবীর একমাত্র যোগ্যতা গান গেয়ে বেড়ানো। নিষিদ্ধ পার্টিতে তারও জায়গা নেই, বরং বিপজ্জনক। তবু চিররঞ্জন মন্ত্র দিয়েছে, ষোড়শী কনিষ্ঠার অনুমোদনে। পেকে ঝুনঝুনো ছিল মাস্টারনি। চামড়া সেঁকা দিনগুলোতে কেমন চন্দনের প্রলেপ হয়ে থাকত তার রূপকথার মায়াবিনী। পরের কুড়িবছরও কুহকে আবিষ্ট করে রেখেছিল ভানুমতি। আরো থাকত, ভালমানুষ হয়েই রিটায়ার করত নিশ্চিত। এক বিনাকারণ, মাংস নিয়ে বচসায় জড়িয়ে না পড়লে, আর মাস্টারনি দুম করে সোনার কাঠি রূপোর কাঠি ভেঙে না ফেললে।

কী সব দিন তখন। অ্যাকশনে বেরয়। পুলিশ খুঁজছে মাস্টারনির হিরোকে। গ্রামে জোতদার খুন দুই, শহরে আবগারী আধিকারিক, মোট তিনটে খুনের মার্ডারার খুঁজতে এসেছিল কোমরে শিকল ঝনঝনিয়ে অনেক রাইফেল আর এক পিস্তল। আদর্শবাদের সঙ্গে প্রেমের, জোতদার খুনের সঙ্গে লারেলাপ্পা গেঁয়ে চিনে বাদাম চিবোনোর যে সমান্তরাল কোন গল্প থাকতে পারে না সুরঞ্জনা জানত। তাই ধ্বংসকালীন অবস্থাকে তুড়ি মেরেও ঘাসপাতা দাঁতে কাটত। সংকেতস্থানে কোন গোপনীয় তথ্য বিনিময় নয়, চাকরি বাকরি ঘরসংসারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে দৌড়ে বেরত তাদের অশ্বমেধের ঘোড়া। শুকনো ছোঁয়াছুঁয়ির গোলগাপ্পা আলুকাবলি। এলাকা গরম হতে না হতেই সুরঞ্জনা পার করে দিল। এত কিছু করেও মাস্টারনি দেমাক দেখাল চল্লিশ বছর বয়সে! পালানোর বুদ্ধিটা দিয়েছিল বলেই এম এ পাশ, লেবার অফিসারের ধবধবে পোষাক। একদার ব্যারিকেড গড়া কমরেড, 'মজুদা' রাজনীতির হেভিওয়েট চিররঞ্জনের বোনকে পেল বৌ। সুখি সংসার কুড়ি বৎসর। হামারে দো দু বৎসরেই। পুলিশের গুলিতে যুবকের মৃত্যু লেখার স্পেসও তখন ছিল না কাগজওলাদের।

ভাল ছেলের রুটির টুকরো কখনও রাজনীতি নয়। তারও ছিল না। পাড়ার স্পটার কাম শ্রমিক নেতা বিজয় সিংএর সঙ্গে আদর্শবাদ আর ভন্ডামি নিয়ে বিতর্ক রোয়াকে। মনবিদ্রোহী না

হলে আকর্ষণ স্থায়ী হয় না। থিসিস কার্যকর করতে দিগ্বিজয় সিংএর পোষা হলো কিরণকুমার তাকে ন্যাচারেলি পাকার আগেই অনেক কিছু শিখিয়ে দিল । বগলের নিচে হঠাৎ গজানো রোমের আভাস দেখেই নেচে ওঠেছিল ।

তোর ... উঠেছেরে ছমছু ।

দু অক্ষরের কথাটা ছিল ব্রহ্মস্ত্র শব্দ । ছোট থেকে বড় হওয়ার সীমান্ত । বিদ্রোহ চারিদিকে বিদ্রোহ তখন । চিররঞ্জনের পার্টি গড়ে না উঠলেও সব ধরনের গান সে গাইত । বিজয়দা বলত, গণজাগরণের মন্ত্র কখনও ভুল হয় না । ওদিকে মনবিদ্রোহের বরাত পাওয়া কিরণকুমারও ম্যাঁও করে ঢুকে গেল তার শোওয়ার ঘরে । রাজনীতি আর যৌনতার ব্যাখ্যা দিয়ে মনকে ক্রিটিক্যাল করে তুলল। পড়ার ঘর শোওয়ার ঘর বলে আলাদা কিছু নেই, ভালবাসার ডুগি তবলা থেকে কষিখোলা আন্ডারপ্যান্ট সব একাক্কার । একঘরে । কিরণ বোঝাল, মা বাপের এক সন্তান, মাঝখানে শোওয়াকে রিস্কি ভেবে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে । বোকা ছিল, অনেক কিছু জানত না। এনাটমির ক্লাসও নেয় কে কুমার, জবা নামের এক পিসির শরীর নিয়ে তোলপাড় । সামাজিক অন্যায়, মা বাপের অবহেলা, আলাদা বিছানা সবই কিরণ শিখেছে বিজয়দার কাছে ।

বিগ বি অনেক কিছু জানে। রাজনীতিতে বিগ হতে হতে দিগ্বিজয় সিং চূড়ায় পৌঁছেও হড়কে গেল । সরকাবই থাকল না তো ক্ষমতা! সামলে নিয়েছে ক' বছরেই । তরমুজ রাজনীতির নিরাপদ সুখে আবার ফিরে পেয়েছে রাজ্যপাট । হার্টের অসুখ, রক্তশর্করা ফাউ । আপনভাই এর বিপরীতে খিস্তিবাজরা যার কথা বলে এ হল সেই । ওদিকে বউএর সত্যিকারের ভাই শালা চিররঞ্জনও আর সশস্ত্র নয় । জল কল দেখে নিন চিরদাকে ভোট দিন । পুরসভা দিয়ে শুরু করল, ধাপে ধাপে উঠছে তো উঠছেই ।

এতসব বৃহৎ মানবজীবনের পাশে সে, হরিদাস এক লেবার অফিসার । নেতারা ক্যাওড়া করবে আর তাকে গিয়ে সামলাতে হবে। সে যাই হোক, চারের পর কুড়ি বৎসরের ঘরসংসার ত সুখেই কাটল। ব্যাটবল প্যাড স্যাটসস্কোয়ারে ব্রিলিয়ান্ট ছেলে সাধের পাসপোর্ট নিয়ে বেরিয়ে গেল ট্রাফালগার বিজয়ে। বিলিতি ইঞ্জিনিয়ার হয়ে ফিরবে মায়ের ছেলে । মেয়েকে নিয়ে গেছে গ্রুপ থিয়েটারে শো করতে, প্রতিভাময়ী শিশুশিল্পী নাচ শেখে, ধরাধরি ছাড়া দূরদর্শনে অনুষ্ঠানও করেছে বাপের মেয়ে। মাস্টারনি বৌএর জন্য কিছু করেনি বলতে পারবে না ডাঁটিয়াল রমণী। কাঁথাফোঁড় কোটা ম্যাক্সি নাইটি, সুরুচি আহেলি বরদান দক্ষিণাপণ সবই করেছে, মধ্যবিত্ত যা করে। সেও নেগলেক্টেড পুরুষ ছিল না। টাই জুতো রেমন্ডস স্যুট, কোহিনুর পাঞ্জাবি কিনে দিয়েছে সুরঞ্জনা। মুখে মুখ লাগিয়ে প্রেমে তার অনীহা বরাবরই । সে রাতের সংলাপগুলো অহেতুক হয়ে গেলে চালিয়ে নেওয়া যেত আরো বছর কুড়ি। কুড়ি বছরের সংসার শেষে এখন তার হাতে ত শুধু একপিস পেন্সিল, সে নিজে । আর আলোহীন এক হ্যারিকেন, তার কপাল । মসৃণ পথে চলতে চলতে হঠাৎ হাম্প ।

সুরঞ্জনা জানত । নারী নয় অর্থ নয়, রাজনীতির মতো উত্তেজক কিছু নেই তার জীবনে । তাই দূরে সরিয়ে রেখেছে । রাজনীতির গান গায় বলে গানের জগতে তালা । স্বামী নষ্ট হওয়ার ভয়ে মাস্টারনির সাবধানী পদক্ষেপে সে মহার্ঘ হয়ে উঠেছে ভেবে সুখি ছিল । টিচারনির ছিল

ভয়, প্রভুত্বের আকাঙ্খা মানুষকে কোথায় নিয়ে যায় দেখেছে। বিগবিকে দেখেছে, দেখেছে দাদা চিররঞ্জনকে, প্রাক্তন মন্ত্রী আর হবু অন্যজন। একপাড়া দুই নেতা, সবুজের ভিতর লাল, লালের ভিতর সবকিছু। আসলে শত্রু মিত্র কিছু নয়, টেলিফোনে কথা হয়, বিয়ে বাড়িতে আড্ডা। দিল্লিতে বঙ্গভবনে পাশাপাশি ঘর নেয় দুই বন্ধু। নির্বাচন জিতে উল্টো গায়।

লাল হলে কী হবে, করাপটেড। ছেলের অ্যাডমিশন করে দিয়েছে সি এম কোটায়।

মাস্টারনির ভাইপোর মেরিট ভাল। চিররঞ্জনই রাজনীতির বাইরে রাখতে আদার স্টেটে পাঠিয়েছে ছেলেকে। বিজয় সিংএর ছেলের ভর্তি হত না নাগপুরে সি আর ঘুঁটি না নাড়লে। সিজার অ্যাপেনডিক্স অ্যাবরশনের নিরাপদ নার্সিংহোম এখন রমরমিয়ে চালাচ্ছে ডাক্তার ছেলে।

চারিদিকের এতসব ডামাডোলে সুরঞ্জনা মাস্টারনির রাজত্ব ত ভালই চলছিল। ছেলেকে লন্ডন পৌঁছাতে পি এফ কো অপ লোন ফরেক্স ঝামেলাকে কষ্টই মনে করেনি। মেয়েটার জন্য মা বাপের চাকরির টাকা থাকল না বলে একটা চাপা কষ্ট ছিল তাদের। এখন আর ওসব অর্থহীন সুখ কোথায় পাবে মাস্টারনি। এখন কার টাকা কে খায়! বিত্ত আর বৈভবের সুখ তার করায়ত্ত। অ্যাকস্ট্রা নারী? সেও আছে।

তিন

চার যোগ কুড়ির পর এক বৎসর প্রস্তুতির শেষে আন্দোলন যখন পুরোদমে তখন সে শুরু করল দ্বিতীয় অধ্যায়। ডিফেন্স মজবুত করতে চাকরি থেকে ইস্তফার সিদ্ধান্ত, এক। উপপাদ্য দুই, রমার সঙ্গে একটা শানদার ইনিংস। মাস্টারনিকে দেখিয়ে দেওয়া প্রেমের সহজ পাঠ তার অজানা নয়। প্রেমের শুচিবাই নয়, সব রকমের প্রেম। মাঠের চারধারে সব ইমপ্রোভাইজ্ড শট। রমাকে দিয়েই হোক প্রথম ফেন্সের বাইরে যাওয়া। টেঁটিয়া মেয়েমানুষ, গুগলি আর চায়নাম্যান যুগপৎ, বাড়িতে পোষা হাজব্যান্ড। রমার সঙ্গে খেলায়ই আসল চ্যালেঞ্জ। পিচে এত আনইভেন বাউন্স, ব্যাটিং ইনিংসে ডাক করলেও দেখিয়ে দেবে সে অলরাউন্ডার। পাকা কিপার হলে যা হয়, উইকেটের পিছন থেকে আওয়াজ দিতে থাকলে কত আর সামলে রাখবে, ক্রিজ ছেড়ে বেরবেই। গ্লাভস বল স্টাম্প সবই তার। সুপুরুষ বটে। ব্যক্তিত্ব আছে শত প্রতিশত, না পটার কারণ নেই।

তদন্ত চলেছে ঢিমেতালে, চার্জশিটের জবাব নেই, আন্দোলন সীমিত হয়েছে টিফিন টাইমে। রমা আবার 'কালপরশু' 'এইসময়' পড়ায় ব্যস্ত। থমথমে পরিবেশ ক্রমশ স্বাভাবিক হওয়ার পূর্বাবস্থা। পটু শ্রমিক শাসন করা অফিসারের বোতলবন্দিত্ব ঘুচছে। চাকরি ছেড়ে খোরপোষের বিকল্প ব্যবস্থাও পাকা। এতদিন যা করেছে নিরপেক্ষ, এবার নেতাদের স্বার্থে। মুঠোমুঠো টাকা খনি থেকে। সম্পাদ্য সফল, শপথের প্রথম টপকে দ্বিতীয়। রইল বাকি মুখে মুখ লাগানোর কেস। সকালের রমা থেকে দুপুরের, টিফিন টাইমের রমা আরো তেজি, অপ্রতিরোধ্য। মোক্ষম সময়, নির্বিকল্প বিষয়। 'দেশপ্রেমিক' এর প্রথম পাতার তিন কলাম জুড়ে খবর। ঠোঁটের কোন তার উর্দ্ধমুখী। মুচকি এবং বঙ্কিম। সুরঞ্জনা মাস্টারনির ছাত্র এবার চূড়ান্ত বিনিশ্চয় পথিক। লাগলে তুক নইলে তাক। ফেরার উপায় নেই।

দেখে যাও রমা।

পার্সোনেলিটি এমনই জিনিস, ভিটামিন প্রোটিন আইসনফিল ডিগজাম রেমন্ডস রেবেন এবং বিভিন্ন ব্র্যান্ড নিষিক্ত অকাট্য অদাহ্য পদার্থ খেয়ে অপ্রতিরোধ্য। শরীরের ঘ্রাণ নিয়ে রমা তার পিছনে। তৃতীয় পোষ্টে দর্শনীয় গোল। জয় এবং প্রতিজ্ঞা পূরণ।

দেখ কাগজগুলি আর খবর পায় না। আট আনা ঘুষ নিয়ে রেলকর্মি সাসপেন্ড!

খবরের দিকে নয়, সুপুরুষ মানুষটিকে অবাক দেখে সুন্দরি রমা। ঠোঁটের ভাঁজে স্বাস্থ্যবতি রমা অনেক হয়। ভাবে স্যার ডাকা মানুষটি তো মন্দ না। ভাবে, এত কান্ডের পরও ডাকল! ভাবে, দেখাই যাক না।

আমি তো সাসপেন্ডিং অফিসারকেই ডিসচার্জ করে দিতাম। তুমি বল, আজকের বাজারে আট আনা একটা এমাউন্ট হল?

রমার দৃষ্টি যত অন্তর্ভেদী হয়, ততই উৎসাহিত হয় সে।

হাজার কোটি টাকার স্ক্যাম এর বাজারে আধলা, কী ভাবছ, পাগলামি মনে হচ্চে, না?

না স্যার।

সুরঞ্জনা মাস্টারনির এমন ঠোঁট কাঁপানো লজ্জানতা অভিব্যক্তি দেখেনি জীবনে। থ্রি চিয়ার্স রমা। এবার জয়ের সময়, ধাপের পর ধাপ এগিয়ে যাওয়া শুধু।

আসলে তোমাকেই বলা যায় এমন কথা। আমাকে খুব ভাবায়, জান! কোনটা ঠিক বলত, হাওলা গাওলা না এই আধলা, বল?

ঠিকই ত। আসলে, স্যার .

থেমে যায়, হঠাৎ সচকিত প্রগলভার মনে পড়ে অতীত কথা, লাইন পেরলেই একশ টাকা! কথা থামে, ব্রীড়া বাড়ে। রমা আরো সুন্দরী হয়। জিতে যাওয়া পুরুষ স্মিত হাসি দিয়ে দেখে সম্পূর্ণ রমাকে, বুদ্ধিমতী রমা, স্বাস্থ্যবতী রমাকে। বুকের কাপড় এদিক থেকে ওদিকে। স্বল্প অনাবৃত বক্ষসম্পদে অবহিত হয়, মাপ দেখে, সুরঞ্জনা মাস্টারনিকে ছাপিয়ে যায় রমা, বুদ্ধিবৃত্তিতেও প্রাখর্যের দীপ্তি।

পার্সোনেলিটি পরীক্ষায় জিতে যাওয়ায়, একদার বিবদমানা রমাকে বিবশ করে সে অনেক সাহসী হয়েছে। দুই এবং এক যুগল সত্যরক্ষা করে সে বেপরোয়া। নো কম্প্রোমাইজ কথার মিথ্যেকেও ঢেকে ঢুকে রাখছে না আর। মাস্টারনির সঙ্গেও আর প্রাত্যাহিকতায়ও আবদ্ধ নেই, তা হলে কিসের রাখঢাক। চিররঞ্জনের সঙ্গে গোপন আঁতাত যত বাড়ছে, দেখছে ক্ষমতার লোভ একটা সৎ মানুষকে কোন অতলে নিয়ে যায়। দিগ্বিজয় শুরু থেকেই ভিন্ন মানুষ, তার কাছ থেকে চাক্কি ঝাঁকাতে কোন ভাবনা নেই। বিজয়দা তার শিক্ষাগুরু, পঁচিশ বছর আগে মনবিদ্রোহের মন্ত্র শিখিয়েছিল। আর তার শালা, সংসদীয় গণতন্ত্রে মানুষের মুক্তি নেই বলে দুখের শিশুদের যে খেপিয়েছিল এককালে এখন বিধানসভার একশ মিটারের ভিতর ঢুকে গেছে। পঁচিশের মহাসম্মেলন করে এবার নতুন শক্তিকেন্দ্র গড়ে তুলতে দুহাত উজাড় করে ঢেলে দিচ্ছে চার্জশিটপ্রাপ্ত শ্রম আধিকারিককে। সাধারণ নির্বাচন সম্মুখে। চা-রাজা পাটরাজা সব রাজা মহারাজাদের টাকা কাঁধ বদল করছে। মাষ্টারনিও জানে সব, ভাঙবে তবু মচকাবে না। দাদাকে নিয়ে আর গর্ব করে

না। মাস্টারনির সামনে লকার ভরতে ভরতে বলে—শালার টাকা।

চার

মহাসম্মেলনে দুইদল এক হবে। গান্ধিবাদ মার্কসবাদ ধর্মবাদ একাকার হয়ে যাবে, কাতারে কাতারে হ্যাচারির মাল নামবে লরিতে বাসে। পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা নগদ ভিজে ছোলা আর ট্যাঙ্কি ভর্তি পরিশোধিত জল। সময় তোদের ডাক দিয়েছে আয়রে ছুটে আয়। মিলেজুলে কাজ করাটাই এখন সময়ের ডাক। কালো চশমা আর লাল গেরুয়া সবুজ ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গবস্ত্রে সজ্জিত নেতারা নামবে টাটা সুমোয়। স্ট্যাটাস বাড়বে, পাবলিক খাবে। প্রেস আছে টেলিকাস্টের ব্যবস্থা আছে। সব করে রেখেছে। অপদস্থ লেবার অফিসারের বিরাট ভূমিকা। আন্ডার ওয়ার্লড অপারেটরদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার সুফল অনেক। শ্রম অসন্তোষ শুধু নেতা দিয়ে সমাধান হয় না, অনেক খুচরো ম্যানেজ করতে হয়!

নেতারা সব শালাই হয়। সে নিজের শালা চিররঞ্জনই হোক দিগ্বিজয় সিংই হোক। এতসব করেও দুপক্ষই চাইছে ওকে সাবাড় করতে। এত সোজা! শ্রীগণেশ ঘানির তেল মাখানো আছে তার গায়ে। এখন শুধু ল্যাজের খেলা, সি আর শালা তো আপনা আদমি। মাস্টারনির ভাই, আন্ডারপ্যান্টের ইলাস্টিক, যত টানবে লম্বা হবে। বিজয় সিংকে ধরলো তার ব্যক্তিত্বের টোপে। শালা, রাজনীতি আর সেক্স শিখিয়েছে বাল্যকালে। অনেক গুরুদক্ষিণা নিয়েছ গুরু, এবার যে কিছু ঝাড়তে হয়। নো প্রবলেম বস, ফেল কাঁড় মাখ তেল, আমি কী তোমার পর!

এখন ধুলোমুঠি সোনামুঠির সময়। কোটি ফুটি নয় ফার্স্ট কেসে ফিফটি থাউজন্ড নিল থ্রু ধম্লো। কুঁড় বছর পর প্রথম লাভারকে দেখল। মুটকি হয়েছে। বিজয় সিংএর কুট্টিনি এখনও বেশ নেশা ধরায়, পুরনো সম্পর্ক মাথায় রেখে কমিশন নেয়নি। ভোরের বেলার গল্প শোনাতে নিয়ে গেল কুমারি ভবনে। সেও পাশাপাশি বয়সের বুড়িকে বলল চব্বিশ বছর আগের কালো আধুলি দেখার সেন্টিমেন্টাল কাহিনী। সিধুর ঘোরে আরো কত কী বলল।

বিজয়দা শালা হেভি ইয়ে, এদিকের খাই ওদিকেরও কুড়াই। বাড়িতে বৌ বাইরে ছৌ!

ছৌ আবার কী?

ছৌ মানে পরমহংসো। ছৌ মানে জল ছাড়া ফিস। ছৌ মানে শেফালি। ছৌ মানে নোটের বান্ডিল।

টাকা পয়সা ও ছোঁয় না। ক্লিন।

পোস্তায় পুলিশেরও সহকারী থাকে ছবিওলাদের সামলাতে। তোমার ডিফেন্সও কম মজবুত নয় গুরু। চাকরি ছাড়ার হুমকি দিয়ে তো রেট বাড়িয়ে নিলে।

তাই?

নয়তো কী, মহাসম্মেলনে শ্রমজীবী সাপ্লাইএর এত হাই রেট যায়নি এর আগে। এবার একটা শেফালি ধর।

ধরেই ত আছি।

গুরু কৃপায় মিরাকল ঘটছে একের পর এক। মুঠো মুঠো ধুলো। ক্যাশ শুধু। এক বৎসরে

সারাজীবনের জানা হয়ে গেছে। লুট পড়েছে গুরু চরণে। গুরু কৃপাহি কেবলম। গুরু মাধ্যম. প্ল্যানচেটের মতো। গুরুর কাছে আসতে কোন বাধা নেই। সবাই আসেন, জীবিত উচ্চকোটির কারবারিরা নেমে আসেন। হুড়হুড়িয়ে। গুরু নির্দেশ দেন ইন্টারনেট-এ।

ত্রিকালদর্শী তো সবাই বলে তবে ইহকাল নিয়ে গুরুর প্রেডিকশন খুব কার্যকর। গুরুদেব কখনও নেগেটিভ বলেন না। সত্যজিৎ রায়ের ভক্ত। তবে কনসালটেন্সি ফিজএর ব্যাপারে ফেলুদা থেকেও উদার, নো অফেরৎ যোগ্য অ্যাডভান্স। বিজয়দা পাওয়ারে ফিরবে বলেছে, চিররঞ্জনের সঙ্গে মার্জারের মত অসম্ভবকেও ক্লিয়ারেন্স দিয়েছে গুরুবাক্য। গুরু সবই পারে. মাস্টারনির সঙ্গে একটা মিটমাট করাতে পারে না? টাকা হল, পরকিয়া হল, চ্যালেঞ্জ ছিল। মিটে গেছে। আর কেন? টেঁটিয়া মাস্টারনি ছাড়া সবই আছে তার। ধন্নোর সঙ্গে 'কুছ নাই' পার্টি। রমাকে নিয়ে তাজ অ্যাস্টর জিমির রান্নাঘরের নিভৃতে। বিজয়দার পার্টিও হয় শানদার। চিররঞ্জনের জন্মদিনেও আজকাল একটু আধটু মজা হয়, মাস্টারনির মুখ দেখলে সব কেটে যায়। বলেছিল এবার ভাইএর কপালে ফোঁটা দেওয়াবে রাজকীয়, মন্দ কী, একটু ধান্দা বিজনেস হয়ে যেত। কী হাই ভোল্টেজ কটাক্ষ চার্জ করল। ছেলেটা আসতে পারবে না। একটা উৎসব হোক বাড়িতে, ভেবেছিল। না, মেয়ে আই এস ডিতে ফোঁটা পাঠাবে সাগর পারে। আর সে একা একা ভেউ ভেউ করে কাঁদতেও পারে না। তার কেউ নেই কিছু নেই। ভাই নেই বোন নেই. চোটপাট করাব মাস্টারনিটাও নেই। সব পাল্টে গেছে, সীমিত রোজগারের টানাটানির সংসারও নেই। এখন সুরঞ্জনা নিজের আয়ে সংসার চালায়, ছেলের জন্য ডলার কেনে, মেয়েব ট্যুইশানির ফিস দেয়। তখন কিন্তু এমন ছিল না, দুজনের চাকবিতে মোটামুটি তো ছিল সঞ্চয়। ছেলেব ট্রাফালগার বিজয়ে বেরিয়ে গেল সব। সব খুইয়েও সুখ ছিল, ছেলে ফিরলে এখন বাপেব সুখে কী হবে? মা ক্যাপচার করবে সন্তান। একটা এখনও আছে তার। মেয়েটা ন্যাওটা আছে, সুন্দরী মায়ের মেয়ে আদুরি হয়েছে বাপের। মেয়ের বিয়ে দেবে ধুমধাম, প্রাণসুখে খরচ কববে। পাত্র যদি পাওয়া যায় বিজয়দার ছেলে: সব ঢেলে দেবে। মাস্টারনি যে মানবে না। মানবে না কেন, মানিয়ে নেবে। গুরু রয়েছে কী করতে। এক বৎসরে আয়রে আয় কবে যখন তাব 'তিজোবি' ভরেছে সোনাদানায়, কতবার ভেবেছে মিটমাটের কথা। ভেবেছে এবার বিবাহবার্ষিকীর পার্টি হোক তাজ এ। বলবে কে? ফোব ফর্টিতে সব কানেকশানই শর্ট সার্কিট হয়ে উড়ে যায়। ফুরফুরু কেয়ার করবে না দেবী চামুন্ডা।

গুরু তার নয়, শালাবাবুর। সাম্যবাদ মিশিয়ে দীক্ষা দেন। সবরকমের শিষ্য আছে, কৃষক মজুর রিক্সাপুলার, পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট মন্ত্রী এম এল এর মহাসাম্যবাদ। গুরুমুখি প্রডাকশন যন্ত্রের মেটেরিয়াল। মন্দিরে না ঢুকলে বুঝতেই পারত না অনেক কিছু। যতই এলেমদার অফিসার হোক তার পক্ষে সম্ভব নয় এ কর্মকান্ড। চাকরিজীবনে যত ধর্মঘট, শ্রমিক সমস্যার সমাধান করেছে, গুরুমন্ডলে ঢোকার পর মনে হয়েছে সে কিছুই করে নি। গুরু ইচ্ছে করেছেন, সমাধান হয়েছে। তাকে নয় তার জনপ্রিয়তাটুকু নিয়েছেন মহাপুরুষ। নেতাদের ফড়েদের সঙ্গে যোগাযোগ নষ্ট হওয়ার নয়। এছাড়া সহজে উঠিয়ে আনা যায় এমন কিছু জনসংখ্যার হালহদিশও দিয়েছেন। বলেছেন প্রয়োজনে নিষিদ্ধ বলে কোন এলাকা নেই।

পাঁচশের মহাসম্মেলনে এক লাখ লোকের যোগান দেওয়া কম কথা নয়। তার দায়িত্ব

ওয়ান ফোর্থ। দুদলের মিলনের ঘোষণায় রাজ্যজুড়ে উত্তেজনা টান টান। সে কোন পক্ষেরই নয়। দিন যতো এগোয় ধন্নোর ঠেকে আনাগোনা বাড়ে। টেনশন আছে না! উটের মত সেলুলারে মুখ গুঁজে বিজয়দাকে জানায়।

অল ক্লিয়ার।

চিররঞ্জনকে।

ও কে কমরেড।

শেফালির কর্ডলেস থেকে রমাকে,

চলে এসো, বাইক দেখে চিনতে পারবে।

এই বয়সেও বাইক দৌড়য় পক্ষীরাজের মত। এক বৎসরে অনেক কিছু হল। বাইক হল স্পন্ডেলাইসিস হল, গাড়ি কিনল মারুতি জেন। ঘাড় কোমরে ট্রাকশন ম্যাসাজ আর গুরুদেবের হিলিং স্পর্শে নিরাময়ও হল। গাড়ি গেল আশ্রমে।

সেও নিজে মুঠো করে না, ব্যাগ স্যুটকেস ছোঁয না। রমা থাকে সঙ্গে। রমা সঙ্গে থাকলে তার কাল ওয়ালেট খুলে ঝরে বিমল গার্ডেন পিসি চন্দ্র চাংওয়া মেঘলা দিনের খুশি। ওয়ালেটে থাকে কার্ড, ডাইনার, ভিসা। সব হোয়াইট।

জুনিয়র অফিসার রমা অবাক হয় বসের কেরামতি দেখে। শ্রম অসন্তোষে কাটাবাগান লেনের নাম কোথাও দেখেনি। ওখানেও স্যারের অবাধগতি। পঞ্চাশ পেরনো মণিমালা জৌলুসে একেবারে ভিক্টোরিয়ান লেডি। গালে ঠোনা মারা মাসি নয় পড়াশুনা জানে।

গুরু, লেলিনের নামে শপথ করছি, মহল্লাকে মহল্লা উঠিয়ে নে ঝাব। তবে গুরু রেটটা কম হয়ে গেল।

পপুলার ডিমান্ডে পাঁচ টাকা থেকে পঞ্চাশ পয়সা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে পার হেড। আর কত? মহাসম্মেলন বলে কথা। মসনদ নড়িয়ে দেবে দুই পার্টি এক হলে। তখন আট আনা কেউ মনে রাখবে না। সেলুলারে ঘুঘু ডাকে ভল্যুম কন্ট্রোলে। কালীঘাটের আকাই ফুনাই।

সব ঠিক আছে বস।

ট্যাংরার বস ফুটস্টপও রেডি।

তিলজলা পার্টি ছাড়া আমরা সবাইকে মাল সাপ্লাই করব ভাইজান।

গুড।

পূর্বপল্লীর রাজপথে মিনি প্রাইভেট বোঝাই বস্তা বস্তা হিমঘরের আলু সাপ্লাই হল। নেতাদের সুমোময় প্রসেশন এসে থামল অকুস্থলে। আলো শুধু আলো, ছবির ঝলকেই সভার সাফল্য। সাকসেসফুল মার্জার। নতুন দল নিয়ে প্রেস বিভিন্ন প্রতিবেদনে উপস্থাপিত করল তাদের পণ্য। উপচানো জনস্রোত, ক্যামেরার কারিগরিতে কেউ পঞ্চাশ হাজারে নিয়ে গেল। মিরাকল হয়েছে সত্যি, হাজার কুড়ি তো ছিলই। পাবলিসিটির লাখফাক ওসব ভড়কিবাজি। ইনকিলাব জিন্দাবাদ। আমার নেতা তোমার নেতা আকাশ কাঁপানো হাজার ডেসিবেলে। সব রং এক করে

বিজয়দা চিররঞ্জন এক এক হাজার নেতা সমর্থক সহ নতুন চাররঙা পতাকা উড়িয়ে দিল পূর্বপল্লীর মাঠে।

প্রভাতে

বিরতি। সাময়িক না পূর্ণ এ সিদ্ধান্ত একা জীবনানন্দের। সেলুলার ধর্ষণ বন্ধ। রমা ধস্নো কেউ খুঁজে পাচ্ছে না প্রিয়সখাকে। পূর্বপল্লীর বাঙ্কারে শুয়ে যুদ্ধ শেষের সাইরেন কী শোনে নি দুই নেতা। যুদ্ধই যদি শেষ তবে সে কেন এখনও চক্রব্যূহে বন্দী। মাস্টারনি যেমন যেমন উসকেছিল সবই ত করে দেখিয়েছে। শূন্য শয়নের উপলব্ধি তাকে পীড়িত করে। ঘর্মাক্ত কলেবর এক ধনুর্ধর দেখে সে একা নয়, পাশে বধূ শুয়ে আছে যে যুদ্ধ করেছিল পূর্বরাত্রে। অনেকক্ষণ পর ঠোটের কোন আবার উর্দ্ধমুখী হয়, স্মিত মুচকি। কুড়ি বৎসর আগে হলে কেমন হত ভাবতে ভাবতে সেলুলার কোলে বিকল্প সুখের সন্ধানে সে ভুলও করে।

হ্যালো সুরঞ্জনা।

তার কোন সেল ফোন নেই গাড়ি নেই চার যোগ কুড়ি ছাড়া জীবন নেই। এইট বি বাসে সে সেলিমের ব্যাগ কাঁধে অফিস যায়। সত্যির মধ্যে একটাই সত্যি, ছেলে তার বিলেতে, মেয়েও গান গায় নাচে। পড়াশোনায় দাদা থেকে কম। আর সে, জীবনানন্দ, স্ত্রীকে ভালবাসে, মাস্টারনি বলে খেপায়, দাম্পত্য কলহে মহাযুদ্ধের মহড়া দেয়, স্বপ্ন দেখে উদ্ভট। ভোরে উঠে স্ত্রীকে ডাকে।

হ্যালো সুরঞ্জনা।

সাহিত্য, ১৯৯৮

মোহনদাসের জন্মবৃত্তান্ত

আমানতকারীর নাম – শ্রীসুভাষচন্দ্র মিত্র (মাইনর)

পিতার নাম -- শ্রীগোপালদাস মিত্র (স্টাফ)

নাবালক হইলে জন্ম তারিখ – ২৩ শে জানুয়ারি, ১৯৬৩ ইং (বুধবার)

অনেক সময় নিয়ে গোটা গোটা অক্ষরে গর্বিত পিতা গোপাল রেকারিং ডিপজিটের ফর্ম ভর্তি করেছিল। ১৯৬৩ ইংরেজির ২৪ শে জানুয়ারি বৃহস্পতি বার সি আর বি আর সি স্যার জোর করে পাঁচ টাকা মাসিকের আর ডি খুলতে বাধ্য করেছিলেন। কেউ যদি বলে–তুমি না পার আমি দিয়ে দেব মাসে মাসে --না করা যায় ? প্রথম জমাটাও চিত্তবাবুই দিয়েছিলেন। গোপাল একবার কাঁই কুঁই করেছিল–আমি স্যার পিওন মানুষ, পাঁচ টাকা চলে গেলে খাব কি সারামাস? চিত্তরঞ্জনবাবু ধমকে ছিলেন, –পিওন কি হে, সাব স্টাফ। দুদিন পর স্টাফ, তার পর অফিসার। তখন তোমাকে কে পায়, কার টাকা কে খায়। তার উপর তোমার যা এলেম। স্যার! এলেমের কথায় গোপাল হাত কচলায় চৌধুরি স্যারের সামনে। পড়াশোনায় মন্দ ছিল না, পড়তে পাবল কই। জন্মাবধি অনাথ। রায়চৌধুরী স্যার বলেন – সেলফ মেড ম্যান। ওর জন্মের কথা মনে পড়ে। জন্মের কথা তো কিছুই মনে নেই, মামার কাছ থেকে শুনেছে। কনভেন্ট রোডের এদিকে বিশাল গির্জা ওদিকে রেলের কোয়ার্টার। বাজি পটকার দম্‌দমাদম্‌ শব্দের মধ্যে জন্ম হলো গোপালের। পঁচিশে ডিসেম্বর মধ্যরাতে গির্জার ঘন্টা তখন বেজে গেছে। সদাপ্রভু যিশুর জন্মের সঙ্গে তারও জন্ম। মামা নাম রেখেছিল যিশু। যিশুদাস মিত্র। গোপাল নিজেই নিজের নাম পাল্টে রাখল গোপালদাস। মা বাপ মরা ছেলেকে মামা ক্লাস সিক্স অব্দি পড়িয়েছিল। যথেষ্ট পড়িয়েছিল। আদ্যনাথ প্রামাণিক বিদ্যালয় থেকে ক্লাস এইটের সার্টিফিকেট বের করেছিল আট আনা খরচা করে। ডাক নামের যিশুর চাকরি হয়ে যায় গোপালদাস মিত্র নামে। ভৌমিক রায়চৌধুরি স্যার ঠাট্টা করে বললেও, সেলফমেড ম্যান, কথাটায় গোপালের শ্লাঘা হয়। বলে – স্যার!

বিশাল নামের অফিসার চিত্তরঞ্জন ভৌমিক রায়চৌধুরি আর গোপালদাস মিত্র সাবস্টাফ, এই দুজন মিলেই কুমিল্লা কর্পোরেশন ব্যাঙ্ক-এর শ্যামবাজার শাখার ক্লিয়ারিং সেকশন। কপয়সা আর বেতন ছিল। ন্যাশনালাইজ হয়নি। প্রাইভেট ব্যাঙ্ক। সিবিসি লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা

রায়চৌধুরিদের সঙ্গে আত্মীয়তার গর্ব খুব সি আর বি আর সি স্যারের। গোপালকে বলেন -- ব্যাঙ্ক আর ট্যাঙ্ক-এর শহর আমাদের কুমিল্লা জানতো। কে জি রায়চৌধুরি আমার দাদু, দাদুর আপন খুড়তুতো ভাই। ক্লিয়ারিং সেকশনে ক্লার্ক একজনও আছেন। গুরুদাস হোড়, জেনারেল ক্লার্ক। কাজ বলতে সকাল বেলার ঘন্টা দুয়েক। সই করা, হাতমুখ ধুয়ে চায়ের অপেক্ষায় বসে ভৌমিক স্যারের সাথে নাটক নিয়ে গল্প করা। মাঝে মধ্যে গোপালকে ধমকানো। ইচ্ছে হলো তো দুতিনখানা চেক রিসিভ করা। বাকি কাজ বাকি সময়ে। চেক রিসিভিং, এন্ট্রি, স্লিপ লাগানো, এসকোটা মেশিনে খট্‌খট্‌ টোটাল। সব গোপালদাস। পেয়িং স্লিপগুলোয় ক্লিয়ারিং সিল মেরে রেডি করে রাখার কাজও গোপালের। পয়সা আনার আলাদা হিসাব। বিখ্যাত অভিনেতা অভিনেত্রীদের পাশে অভিনয় করা গুরুদাসবাবুর নেশা যেমন, অনেকটা পেশাও বটে। ব্যাঙ্ক-এর চাকরিতে আর কপয়সা। বেলা তিনটে নাগাদ একবার থিয়েটার পাড়া ফেরৎ ইচ্ছে হলো তো ফেরা। তখন গোপালের ভাগ্যে আর একপ্রস্থ বকাঝকা--ধুর্‌ধুর্‌ পিওনকে দিয়ে কী কোন কাজ হয়, সবই যদি আমাকে করতে হবে। গোপালের করে রাখা গ্র্যান্ড টোটালটা ঝর্ণা কলম দিয়ে ইঙ্কআপ করা আর জি ডি হোড় নামের পাখি ওড়ানো সইটা মেরে রায়চৌধুরি স্যারকে হাত নেড়ে--আসি স্যার। হাওয়া। স্টারে বা রঙমহলে যেখানেই নাটক থাকুক বৃহস্পতিবার শোয়ের পাস একটা দুটো গোপালের জন্য বরাদ্দ থাকে। নইলে এত গালিগালাজ খেয়েও খাটবে কেন। আর কি নাটক সেসব! টিকিট নিয়ে কাড়াকাড়ি। একটাও দেখেনি কখনো গোপাল। পাসদুটো বিক্রি করে সপ্তাহে দুতিন টাকা আয় অ্যাকস্ট্রা।

ছেলের নাম সুভাষচন্দ্র রাখার কৃতিত্বও ভৌমিকবাবুর। ছেলের জন্ম বাড়িতেই, দাই এসে বলল বারটা কুঁড়িতে। গোপালদাস ছেলের কান্না শুনেছে বারটা পাঁচ-এ। রায়চৌধুরি স্যারই বললেন, --জন্ম বারোটাতেই হয়েছে, তোমার ঘড়ি দশমিনিট ফাস্ট ছিল। ছেলে তোমার বীরপুরুষ হবে। গোপালের থেকে বছর দশেকের ছোট চিত্ত স্যারের বুদ্ধি বড় পাকা। ডিরেক্ট অফিসারবা বড় ঘাঘু হয় দেখেছে। কলেজ ছেড়েই ঢুকে গেছে দাদুর ব্যাঙ্কে। কত আর হবে বয়স, উনিশ কী কুড়ি। এর মধ্যেই কত বুদ্ধি!

সুবুর জন্মের পর থেকেই আদুরি সুতিকায় অসুস্থ। এমনিতেই আদুরির শরীরের গড়ন-পিটন কিছুই ছিল না। ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া মাংসপিন্ড এদিকে কিছু ওদিকে কিছু। শ্যামলাতেও একটা লক্ষ্মীশ্রী থাকে, রূপের ঝলক থাকে। আদুরি ছিল আবলুস কাঠের যক্ষিণী। কাজ করতে পারত খুব। এক কামরার বস্তি ব্যারাক ঝকঝকে করে রাখত। সুতিকারোগীর হাজারো ঝামেলা। এই ব্যথা সারল তো, ঐ ব্যথা। সাদা রক্ত লাল রক্ত যখন তখন। শচীর মা, শঙ্কর সিনেমার চৌকিদারের বৌদি না থাকলে দুধের শিশু সুবুর কি হালই যে হতো! দিদি না থাকলে শচীই সুভাষচন্দ্রের দেখাশোনা, আদুরির দেখাশোনা করত। আদুরির ততদিনে গিঁটে বাত, নড়তে চড়তে পারে না। একেবারে অচল। পনের বৎসরের শচীই সুবুর দ্বিতীয় মা হয়ে গেল।

কুমিল্লার রায়চৌধুরিদের ব্যাঙ্ক-এর পিওন গোপাল, আদুরি বউ-এর চিকিৎসার খরচে জেরবার। কবিরাজি, হোমিপাথি, কবচ তাবিজ, ছেলের ব্রাহ্মণ শটি, গ্ল্যাক্সোর টিন কিনতে অনেক খরচ। মার শুকনো বুকে ছেলে তো বসতেই পারে না। শচীরানির সাজা মাতৃত্ব কখনও ছেলের কান্না থামিয়ে তো দেয়। ছেঁড়া তোষকের উপর চটাওঠা তেল কাপড়ে শুয়ে সুবুকে কাতুকুতু দিয়ে

হাসানোই অপিস ফেরতা গোপালের একমাত্র সুখ। আর সুখ, সুবুর তেল চিটচিটে সর্ষেভরা বালিশ থেকে লাল লাল বা ছোট সাদা ছারপোকা ধরে মারা। মেরে রক্তগন্ধ হাত শচীর নাকের কাছে নিয়ে যাওয়া। শচীর কিছুতেই আমোদ পুলক তেমন নেই। রাগ দুঃখও নেই। প্রথম প্রথম আদুরি খুব মজা পেতো, খিকখিকিয়ে হাসত। একঘেয়েমিতে মুখের হাসি ফিকে হয়ে গেছে।

এর মধ্যে একদিন গোপাল শচীকে প্রস্তাব দেয়। প্রস্তাব দেয় কাপড়ের ব্যবসা শুরু করার। ক্যানভাসার হবে শচী-বস্তির মেয়েদের ডেকে আনবে আদুরির কাছে। শাড়ির স্টক টাকা-পয়সার হিসেব আদুরির। সাহায্য করবে শচী। সাইকেল এ্যাডভান্স দেড়শো টাকা পুরো হাতে এলো না। ক্যাশমেমো পাওয়ার জন্য পনের টাকা দিতে হলো দালালকে। একশো পঁয়ত্রিশ টাকা দিয়ে বড়বাজার থেকে শাড়ি কিনল দশখানা। ভৌমিক স্যারকে বলেছিল তার ব্যবসার কথা। বললে, --মূল দামে ছেড়ে দাও, পারো তো এক টাকা করে কমিয়ে দাও। ঘাঘু বুদ্ধিমান মানুষের কথা ফেলতে পারল না। লস হয়ে গেল। একশ কুড়ি টাকা হলো। শাড়ি বাঁচল একখানা। কাদাপাড় পাতলা সবুজ জমির শাড়িটা কেউই নিল না। গোপালের মাথায় তখন রায়চৌধুরী স্যারের বুদ্ধির তারিফ। শচীর মা দিদিকে বলল, --শাড়িটা শচীর জন্য নিয়ে যেও। আদুরিকে শাড়ি পরানোর কথা ভাবতেই পারে না। এখনকার যেমন নাইটি, কাঁধ থেকে পা পর্যন্ত শেমিজ পরে থাকত আদুরি। ব্যবসা তার দাঁড়িয়ে গেল। এক আধবার লস হলো। তারপর শচীই দাঁড় করিয়ে দিল বস্তির ব্যবসা। কাদাপাড় শাড়িতে শচীকেও নতুন করে দেখতে শিখল গোপালদাস।

আবেদনকারীর নাম – শ্রী সুভাষচন্দ্র মিত্র।

পিতার নাম – শ্রীজি মিত্র, ব্যাঙ্ক অফিসার।

জন্ম তারিখ – ২৩ শে জানুয়ারি ১৯৬৮ ইং।

সি আর বি আর সি স্যার বি এস আর বি-র অফিসার এখন। ডেপুটেশন পোস্ট। সল্টলেকের বাড়িতে গোপালদাসকে বসিয়ে ব্যাঙ্ক ক্যাশিয়ারের ফর্ম ফিলাপ করিয়েছিলেন। –কি হে দিনটা যে ভুলে গেলে। মনে আছে ছেলের জন্মের পরদিন বুধবার পর্যন্ত লিখে দিয়েছিলে ব্র্যাকেটে। –স্যার। –চাকরি হয়ে যাবে, ছেলে আবার তোমার মতো করিতকর্মা পুরুষ হবে না তো? –স্যার। সি আর বি আর সি স্যারের প্রতি কৃতজ্ঞতা গোপালচন্দ্রের আজীবন। বয়সে ছোট লোকটির কাছে তার জীবন কৃতজ্ঞও। তাই, স্যারের কথায় দুঃখ পাওয়ার বদলে কৃতার্থ হয়। বলে, স্যার, ভাল আঁকতে পারত না বলে স্কুলে কখনও ফার্স্ট সেকেন্ড হতে পারল না ছেলেটা। কতবার কত প্রজেক্ট করিয়ে দিয়েছি মতি মাস্টারকে দিয়ে। ছেলে নিজে যা পেরেছে, তাই করে জমা দিয়েছে। স্যার, একটা কথা রাখবেন স্যার। চাকরিটা যে আপনি করিয়ে দিলেন ছেলেটা যেন জানতে না পারে স্যার। না, হে না, তুমি আমার যা উপকার করেছ। চা খাবে তো? হেনা, এই হেনা দেখে যাও, কে এসেছে। –না স্যার। –না কি, তুমি বললেই আমি মানব!

সি আর স্যারও গরীব ঘরের ছেলে। তবে গোপালদাসের মতো অশিক্ষিত পরিবার নয়। গোপাল আদ্যনাথ প্রামাণিক স্কুলের এইট পাসের সার্টিফিকেট ভরসা করে ম্যাট্রিক পর্যন্ত

করেছিল। তারপর সি আর বি স্যার বুদ্ধির দৌড় করিয়ে বিএ, সিএ আই আই বি ব্যাঙ্কের নিজস্ব সিএ পাস। সে তো স্বপ্নেও ভাবেনি ক্যাশিয়ার হবে, অফিসার হবে। অনেক সুখের মধ্যে একটা কাঁটা যে বুকে বিঁধে আছে, সে শুধু জানে, জানে আর একজন। আদুরি তো কিছুই জানল না, বুঝল না। এক বৎসরের কষ্টের জীবন পার করে, সুভাষচন্দ্রের দ্বিতীয় জন্মদিনে ছারপোকার বিষে বিষক্ষয় করল। বস্তির মানুষ যে এমন হিংস্র হয়ে উঠতে পারে, কল্পনাও করতে পারেনি গোপাল। গোপাল তার বউকে খুন করেছে, মিথ্যে অপবাদে তাকে বস্তি ছাড়া করল সবাই। আদুরি নড়তে চড়তে পারে না, বিষের শিশি এগিয়ে দিল কে? সুবু ঘরময় হামাগুড়ি দিয়ে বেড়ায়, তাই, গোপাল আদুরির বিছানার পাশে সরিয়ে রেখেছিল। কোন স্বামী স্ত্রীর না ঝগড়া হয়। অতিষ্ঠ উপেক্ষিত স্বামী হিসেবে সে বিষ খেয়ে মরে যাওয়ার কথা বলতেই পারে। এতে প্ররোচনার গন্ধ পায় কী করে প্রতিবেশীরা। বস্তির ঘরে কোনো কথাই বলা যায় না। সব পাঁচকান। আদুরি যখন মরল তখন তো গোপাল অফিসে! শ্যামবাজারে। বস্তির বাড়ি ছাড়তেই হলো গোপালকে। শঙ্কর সিনেমার চৌকিদারের বাড়িতে শচীর মার কাছে পাঁচ মাস থাকল সুভাষচন্দ্র।

গোপালচন্দ্রের দুঃখের জায়গাটা কেউই বোঝে না। সি আর বি আর সি স্যারও না। উনি বলেন, —তোমার মতো সুখি মানুষ কজন আছে হে। সি আর স্যারও তো সুখি মানুষ। পঞ্চাশ বৎসরেই সুখ উপচে পড়ছে। মেয়ে সিনেমা করছে। মন্ত্রীর ছেলের সঙ্গে বিয়েও পাকা। ছেলে নামী বিস্কুট কোম্পানির আধা মালিক। হেনাদিদি যখন আসতেন গাড়ি করে, চৌধুরী স্যার বেরিয়ে যেতেন। গুরুদাস বাবুরও থাকা না-থাকা সমান। তখন সি সি বি লিমিটেডের শ্যামবাজার শাখার ক্লিয়ারিং সেকশনের অফিসার, ক্লার্ক, পিওন সবই গোপাল সাবস্টাফ। ফার্ন রোডে বাড়ি হেনাদিদির। হাইকোর্টের উকিল ভবেশ সাহার সুন্দরী মেয়ে হেনাদিদির প্রেমে যখন সি আর স্যারের মতো ঘাঘু মানুষের বুদ্ধিভ্রংশ হয়, গোপাল পিওন তখন তার বুদ্ধিকে সামলে রেখেছে। স্যারের তখন অনেক টাকার দরকার। শেরখান আফগানও স্যারকে আর টাকা দিতে পারবে না, জবাব দিল। এদিকে আদুরির মৃত্যু, গোপালের ঠাঁইবদল, সুবুর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের হতাশার মধ্যে শচীর কাপড়ের ব্যবসাও ডুবতে বসেছে। হতবুদ্ধি গোপালকেও তার উচক্কা বুদ্ধি দিয়ে মাতিয়ে দিলেন। —ডু অর ডাই, গোপাল। এ আমাদের শেষ লড়াই। কেউ যাতে বুঝতে না পারে। একটা অচেনা নামের সেভিংস একাউন্ট খোলা হলো। রামনিধি ঘোষ-এর নামে ওপেনিং ফর্ম, স্পেসিমেন কার্ড, একটা উইথড্রয়াল ফর্ম সই করে দিল শচীরানি। গোপালের বড়শালা রামনিধি, বললে সেও সই করে দিত। হাবাগোবা ছেলেটি দিদির মৃত্যুর পরও ভাগ্নেকে দেখতে শঙ্কর সিনেমার চৌকিদারের বাড়ি যায় প্রায়ই। গোপাল নামটাই নিয়েছে, শ্বশুরবাড়ির ঠিকানাও দেয়নি। শচী ছোট ছোট চোখের দৃষ্টি দিয়ে ফর্মগুলি দেখেছে আর বড় বড় অক্ষরে গোপালের কথামতো লিখে দিয়েছে সব। গোপালের সব ব্যবসারই কমিশন এজেন্ট শচী। একখানা অবিক্রীত শাড়ি ছাড়া কোনো কমিশনই গোপাল তাকে দেয়নি কখনও।

নাম — শ্রীসুভাষচন্দ্র মিত্র।

সি আর বি আর সি স্যার গোপালচন্দ্রকে পিতার নাম লিখতে দিলেন না। —রোল নম্বরটা লিখে দাও শুধু। আর হ্যাঁ, ক্যাটাগরিটা। সি সি জি। খামে কাগজটা ঢুকিয়ে দাও। যথাস্থানে

পৌঁছে দেব। —স্যার, ছেলে যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে। বড় অভিমানী ছেলে স্যার। —হ্যাঁ, হ্যাঁ ওসব অভিমান একটু থাকে। —স্যার। এই একটি লোক গোপালচন্দ্রের জীবন ঘিরে সুখের সায়র। ছেলেকে নিয়ে তার সুখ, গর্ব ও দুঃখের কথা মুখ ফুটে জানাতে পারে না। মনে মনেই বলে স্যার, ছেলে আমার ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হতো কি না জানি না, কিন্তু জয়েন্ট এনট্রান্স-এর ফর্মে একটা ব্যাকডেট বসাতে পারবে না বলে এপ্লাই-ই করল না। এত সুখ সার্থকজীবন গোপালদাসের। তবু, রাগের মাথায় ছেলেকে বলে, ধর্মপুত্তুর।

সুভাষচন্দ্রের মা আদুরির অসুখেই গোপালের জীবনে ধর্মবোধের উদয় হলো প্রথম। শঙ্কর সিনেমার চৌকিদারের সুন্দরী কন্যা শচী আর বড়লোক উকিলের আগুনরূপসী হেনা দিদিই তার ধর্মপথের বড় বাধা হয়ে দেখা দিল। আদুরির মৃত্যু থেকে যতটুকু শান্তি সে পেয়েছে, যথেষ্ট। পঙ্গু হয়ে সারাজীবন বেঁচে থেকেকি লাভ? বেলেঘাটা রেললাইনের পাশে দু-কামরার ঘর মাত্র দুহাজার টাকায় পেয়ে গেল। কিন্তু, এত টাকা কোথায় গোপাল পিওনের। মাত্র কটা টাকার জন্যই সে লোভে পড়ল, প্রথম অধর্ম হলো। সি আর বি স্যারই তাকে আঠায় জড়ালেন। হেনা দিদিকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত যুবক অফিসার চিত্তবাবুর বিবাহেরও প্রধান প্রতিবন্ধক যে অর্থ সে কথা গোপালকে ঘুণাক্ষরেও জানতে দিলেন না। ঘাঘু অফিসার তার সঙ্কট সমাধানের প্রস্তাব দিলেন -- গোপাল বিয়ে করো। —স্যার, পিওন মানুষ, মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। —সব হবে হে। একটা চান্স নেবে? —স্যার! রায়চৌধুরি স্যারের যে কোন বুদ্ধিই ভগবানের নিদান। —একবার মাত্র। একটা চান্স নিই চলো। এ দুনিয়ায় —সব ব্যাটাই চোর, বুঝলে গোপাল। শুধু ধরা না পড়লেই হলো। ভৌমিক স্যার আঁটঘাট বেঁধেই তৈরি ছিলেন। ইনসিওরেন্স কোম্পানির দশ হাজার টাকার চেক জমা পড়ল রামনিধি ঘোষের এ্যাকাউন্টে। চিত্তরঞ্জন স্যারের বুদ্ধির কেরামতিতে শচীকে পাওয়ার শেষ ধাপে পৌঁছল গোপালদাস। লালপাড় শাড়ি একখানা চল্লিশ টাকা দিয়ে কিনেই নিল। শঙ্কর সিনেমার চৌকিদারের বৌ দিদির হাতে দিল না এবার। ছেলের গ্ল্যাক্সো, শটি, নিপল, গরমদিনের জামা, নতুন অয়েল ক্লথ যেমন, সবার সামনে পনের বছরের ছোট শচীকে শাড়িখানা ঘটা করে দিয়ে দিল।

চিত্ত স্যারের উন্নতি হলো। আট হাজার টাকায় হেনাদিদির সঙ্গে বিয়ে হলো। গোপালদাস দুহাজারে ভদ্রবস্তিতে দুকামরার ঘর পেয়ে গেল। চিত্ত স্যারের প্রমোশন হলো, গোপালও ক্যাশক্লার্ক হয়ে গেল। টাকা গোনায় গোপালের হাত চলত ফুরফুরিয়ে। টিফিনের আগেই কাউন্ট, সর্ট, স্টিচ হয়ে যায়। রাতে তো থাকতে পারে না, ছেলেকে দেখতে যাওয়ার টানেই তাড়াহুড়োয় কাজ শেষ করত। শচীর মা দিদিরও দয়ার শরীর, দুপুরের খাওয়াটা হয়ে যায়। গোপাল দাস কিছুই ফোকটে নেয় না। তখন তার হাতে বেশ টু পাইস। আমূল বাটারের প্যাকেট, দুশো গ্রাম সুবোধ ব্রাদার্সের চা, টেরিটি বাজার থেকে স্পেশাল গুড়াখু কিনে দেয় শচীর মা দিদিকে। এর মধ্যেই এক দুপুরে তার টাকাগোনা খাঁচায় এসে পড়ল পাঁচ হাজার টাকার বান্ডিল। ক্যাশ পিওন সতীশই দিয়ে গেল স্টিচ করে। আড়াইটা বেজে গেল। হিসেব তো মিলছে না। কার টাকা। কোত্থেকে এলো। এন্ট্রি হয়নি কোনো ভাউচার? বান্ডিলটা সরিয়ে রেখে পাশের কাউন্টারের শ্যামল সাহাকে দিয়ে গোনাল। ঠিকই আছে। তার মানে সতীশ কুমারই অন্য ক্যাশিয়ারের টাকা তার খাঁচায় দিয়ে গেছে সেলাই করে। গোপাল আর সময় নষ্ট করে না। বান্ডিলটা ব্যাগে ঢুকিয়ে বেরিয়ে

পড়ে। শঙ্কর সিনেমা। তখনও বিয়ে হয়নি। শচীর অনেক খদ্দের তখন, কাপড় বিক্রির ব্যবসা থেকে প্রচুর টাকা জমছে। গোপাল শচীর হাতে লুকিয়ে দিয়ে এলো টাকা।

অপরাধীর নাম – শ্রীগোপালদাস মিত্র

পিতা – ঈশ্বর বটকৃষ্ণ দত্ত।

উদ্ধারকর্তা ডি ডি ও সি আর বি আর সি স্যার। তিন অপরাধীর শেষোক্ত জন গোপালদাস। তিন জনেরই জামিন হলো এক ঘন্টার ভিতর। চিত্ত স্যারের এক কথা, কিছুতেই স্বীকার করবে না। পুলিশকে তো নয়ই, অফিসকেও না। গোপালদাসের মনে পড়ার অনেক পর সতীশ কুমারের মনে পড়ল ভুল কাউন্টারে টাকা দেওয়ার কথা। গোপাল ততক্ষণে বামাল নিয়ে হাওয়া। পুলিশ ভিজিলেন্স তো কম হলো না। গোপালকে কেউ ছুঁতেও পারল না। হেড অফিস ভিজিলেন্সের অফিসার রবীন মুখার্জিকেও যখন টপকে যেতে পারল, তখন তো জিতে গেছে অর্দ্ধেক রাজত্ব। শচীকেও জেরা করা হলো। শচীরানি জিতে গেল অগ্নিপরীক্ষায়। সব জেনে বিয়ে হয়ে গেল গোপালদাস মিত্র আর শঙ্কর সিনেমার চৌকিদারের মেয়ে শচীরানির। সুভাষচন্দ্রর মা, না পাঁচ হাজার টাকার মালিক গোপালদাসের বউ, কোনটা যে হতে চেয়েছে কমকথার মানুষ শচী, গোপাল বুঝে উঠতে পারেনি আজও।

সি আর বি আর সি স্যারের বন্ধু মানুষ এই মুখার্জি অফিসার। ডি ডি ওর চেম্বারে শেষ জেরা হলো গোপালদাসের। ঘড়েল মানুষ মুখার্জি। ঘড়েলরা সৎ হলে বড় ঠ্যাটা হয়। গোপালকে সে ঠিক চিনতে পেরেছিল। গোপালকে যখন কোনো আইনি উপায়েই ধরা গেল না, মনের দিক দিয়ে একবার মোচড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন। মোক্ষম প্যাঁচ।

–মিত্রবাবু, শুধু নিয়মরক্ষার খাতিরেই আপনাকে ডেকে আনা। জেরা করার কিছু নেই। শ্যামল সাহা সতীশকে টাকা দিয়েছে সে তার জবানবন্দিতেই বলেছে। সুতরাং শ্যামলবাবু নেয়নি, কারণ সতীশও বলেছে। সতীশ বলছে স্টিচ করে টাকা আপনাকে দিয়েছে, আপনি বলছেন পান নি, আপনার খাতাপত্রও পরিষ্কার। আসলে এ জেরা নয়, ধর্মের কাছে পরিষ্কার থাকা। অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার জন্যই সরকার আমাকে টাকা দেয়। আর সতীশ কুমারদের অপরাধের যে কোনো শাস্তিই কম। ওর পারিবারিক স্বাস্থ্যও ভাল নয়। এক ভাই সিনেমা হলের কাউন্টারে বসত। টাকা নিয়ে উধাও। জিতে যাওয়া ঘোড়সওয়ার গোপালদাস বিরক্ত হতে পারে না। আবার ভয়ে ঘেমে উঠে। রবীনবাবুর সম্মোহনী চোখ দুটো তাকে জরিপ করে চলেছে। একটু থেমে আবার শুরু করেন বেয়াড়া অফিসার। –আপনাকে আমার শেষ প্রশ্ন মিত্রবাবু। সতীশ কুমারের চাকরি তো যাবেই। আপনি টাকা নেন নি, শ্যামলবাবুও না। শ্যামলবাবুকে সে টাকা ফেরৎ দেয়নি, তার স্টেটমেন্ট থেকে পরিষ্কার। এখন আপনিই একমাত্র সত্য বলতে পারেন, সে অপরাধী কিনা। এক অপরাধীর না নিরপরাধীর শাস্তি হচ্চে সে আপনিই বলতে পারেন। আপনিই বলুন সতীশের শাস্তি হওয়া উচিত কিনা। –আমি কি বলব স্যার। মনে হয়েছে তখন তার গায়ে জ্বরের পরে ঘাম। গোপালদাস সি আর স্যারের মুখে তাকিয়ে সাহস নেয়। –বলুন, বলুন, হ্যাঁ কিংবা না। –আমি কি বলব স্যার, আপনি যা বুঝবেন। ঠিক তখনই

ঝপ করে মুখার্জি তাকে ছেড়ে দিলেন। — যান গোপালবাবু। সতীশের চাকরি যায়নি, মাসে মাসে কিস্তিতে টাকা শোধ দিয়েছে।

ছাত্রের নাম — শ্রীসুভাষচন্দ্র মিত্র।

পিতার নাম — শ্রীজি ডি মিত্র।

পেশা — ব্যাঙ্ক অফিসার।

নামী স্কুলে ভর্তির ফর্ম ভর্তি করে দিয়েছিলেন সি আর বি আর সি স্যার। গোপালদাস তখনও অফিসার হয়নি। অফিসারশিপ পরীক্ষায় বসেছে। চিত্ত স্যার বলেই দিয়েছেন, — তোমার প্রমোশন কে আটকায়। ক্লাস ফাইভের ছাত্র সুভাষচন্দ্র ফর্ম থেকে কখন যে ব্যাঙ্ক অফিসার শব্দটা কেটে দিয়েছিল বুঝতেও পারেনি গোপালদাস। ভর্তি তার হয়েছিল কিন্তু ফর্মে কাটাকাটির জন্য মহারাজের গালমন্দ খেতে হয়েছে গোপালদাসকে। শচী আর গোপালদাসের চরিত্রের অনেক অমিলের মাঝেও দুজনই চাইত ছেলেটা মানুষ হোক, বড় একটা কিছু হোক। শচী তাই কাপড় বিক্রির ব্যবসাটাকে আঁকড়ে থাকলো। মাস গেলে তিনশো চারশোও রোজগার হয়ে যেত। গোপালদাসের অল্পে সন্তুষ্টি রইল না।

হেড ক্যাশিয়ার হয়ে সোনারপুর বদলি হয়ে গেল গোপালদাস। হাউস বিল্ডিং লোন চল্লিশ হাজারে বাড়ি হলো বোসপুকুরে। বস্তি থেকে চলে আসায় শচীর ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেল। গোপালদাস লোন-এর টাকায় বাড়িও করল, কয়লার ডিপোও একটা খুলে দিল বাড়িতে। কয়লার ডিপো চালাতে অনেক খরচ। পেমেন্ট ক্যাশিয়ার রতিলালের সঙ্গে একটা পার্টনারশিপ রফা হয়ে গেল। সকালে টাকা বেরিয়ে গেল, বিকেলে আবার জলতল সমান। কখনও এক-দুদিন সময়ও লেগে যায়। অ্যাকাউন্টেন্টবাবুকে নিয়ে কোনো ঝামেলা নেই। সই আর দুটো চাবি ঘোরানোই কাজ। খবর গেল বাবার কানে, হেড অফিস থেকে পাঠানো লোক এলো ক্যাশ ভেরিফিকেশনে। ম্যানেজার নির্ঘাত চুকলি কেটেছে। গোনা-গোনতির যা নিয়ম পেমেন্ট ক্যাশিয়ারকে কুড়ি হাজার টাকা শর্ট দিয়ে কাউন্টারে পাঠিয়ে দিল। ভেতরে কাউন্টিং চলল বাইরে টাকা রিপ্লেনিশড। হেড অফিস পরদিনও আবার অন্য লোককে পাঠালো। মহাবিদ্যায় গোপালদাসের ভাগ্য তার বুদ্ধিকে কখনও টেক্কা দিতে পারেনি। সি আর স্যারও বলেছিলেন — জানতাম, গোপাল মিত্রকে ধরা বড় সহজ নয়।

আবেদনকারীর নাম — শ্রীগোপালদাস মিত্র।

পদের নাম — অফিসার গ্রেড থ্রি।

সি আর বি আর সি স্যারের আগ্রহেই অ্যাপ্লাই করেছিল গোপাল। এবং সোনারপুরের হেড ক্যাশিয়ার অফিসার হয়ে গেল। গোপালদাসের অর্থের অভাব নেই, কয়লার ব্যবসা থেকে আয় মন্দ না। তবু কেসটা তো করে বসল। চিত্তরঞ্জন স্যার বললেন — বুদ্ধি বটে গোপাল। তবে বুদ্ধির সঙ্গে সাহসটাও থাকা চাই, তোমার দুটোই আছে। —স্যার। এই একটি জায়গায়ই গোপাল মিত্র বিবশ হয়ে থাকে। —স্যার, আপনি বুঝলেন কি করে? —বোঝাবুঝির কি আছে, এতবড় একটা কান্ড, ভিজিলেন্স হলো, তুমিও আছো ব্রাঞ্চে। —স্যার, আমি তখন ছুটিতে

স্যার। —সেটাই তো সন্দেহের কারণ। স্পেসিমেন কার্ড সরিয়ে বানানো কার্ড রেখে চলে গেলে ছুটিতে। কাকে দিয়ে উইথড্র করালে? —স্যার, আমার শালা রামনিধি। —রামনিধি সই করেছিল? তোমার সাহস তো কম নয়। —না স্যার, সই করেছিল শচী। —গুড! স্পেশাল অ্যাসিস্টেন্ট বেচারি মরল। পনের হাজার টাকা মাত্র। এত কম কেস কেন তোমার? — স্যার। সত্যি কথাটাই বলে গোপালদাস — স্যার, সুভাষচন্দ্রের হোস্টেল খরচা হঠাৎ বেড়ে গেল। পেরে উঠছিলাম না স্যার। অফিসার হয়েও স্যার কম ঝকমারি হলো না। তিনজনের পরিবার, তিন অ্যাসটাব্লিশম্যান্ট।

বাবা ছেলের চাকরি হয়ে গেল একই ব্যাঙ্কে। ভিন্ন শাখায়। সুভাষচন্দ্র এক বৎসরেই শাখার নেতা। রাজ্য শাখা থেকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বেও চলে এলো। চরিত্রের দৃঢ়তা, গাম্ভীর্য, সততা আর বক্তৃতা করার সহজাত ক্ষমতায় শ্রমিক নেতা সুভাষচন্দ্র মিত্র মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়সেই এন এস রোড ট্রাফিক আইল্যান্ডে বক্তৃতা করল। ছেলে তো প্রায়ই বাড়ি ফেরে না, ইউনিয়ন অফিসেই থেকে যায়। গোপালদাস ছাড়া কেউই বোঝে না বাপ ছেলের টানাপোড়েন। স্যার বি এস আর বিতে থাকতে অনেকবার বলেছিল। —স্যার এক ব্যাঙ্কে দেবেন না। গোপালদাসের অতীত কি জানে সুভাষচন্দ্র? কি করে জানবে, ধরা তো পড়েনি কখনও?

গোপালদাসের ঘর করতে করতে শচী কথা বলতেই ভুলে গেছে। গোপাল তার চাকরি আর ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত। ছেলে তো শৈশব থেকেই কথা বলে না। সুবু চাকরি পাওয়ার পর গোপালকে বলল — ছেলের বিয়ে দাও। অনেকদিন ঘরে শিশুর কলবর নেই। গোপাল সুভাষচন্দ্রকে বলে। সুবু একদিন বলেই দিল গোপালদাসকে — বিয়ে করে এ বাড়িতে থাকব না। এইচ বি এল এ বাড়ি করব, বিয়ে করব। শচী অনেক কাঁদল। কোলে-পিঠে মানুষ করা স্নেহের পুত্তলি যে তার সঙ্গে কথাই বলে না। কি বোঝাবে? কাকে বোঝাবে? নিজের ছেলে তো নয়। গোপালদাসকে কুরে কুরে খায় অন্য চিন্তা, ছেলে বিয়ে করে থাকবে না কেন? কেউ কি তাকে বলেছে তার মার মৃত্যুর অস্বাভাবিকতা?

দেড়লাখ টাকার এইচ বি এল লোন পেল সুভাষচন্দ্র, ফ্ল্যাট কিনল চার লাখে। এদিক ওদিক ধার করল প্রচুর। বিয়ে করল তার পুরনো বস্তির চেনা মেয়েকে। শ্রমিক নেতা সুভাষচন্দ্রের বিয়েতে প্রচুর লোকসমাগম হলো। সুভাষচন্দ্র বাপের কাছ থেকে কিছুই নিল না। গোপালদাস শচীরানি ছেলের গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানে ভোরে উঠেই চলে গেল, সন্ধ্যেবেলা ফিরে এলো একা একা।

বিয়ে করে নতুন বাড়ি করে সুভাষচন্দ্র বেশ হাসিখুশি মানুষ হয়ে গেল। প্রায়ই বিকেলে আসে বউকে নিয়ে। শচীর সঙ্গে দেবকীর মিল খুব। সুভাষচন্দ্র থাকতে দেয় না, নইলে শচীকে ছাড়তে তার মন চায় না। সুভাষচন্দ্র এক সন্ধ্যায় বাপকে জানায় তার ব্যাঙ্কের নতুন সমাচার। সদ্য অবসরপ্রাপ্ত গোপালদাসের কাছে ব্যাঙ্কের যে কোনো খবরই বড় আপনার। ছেলে জানায় নতুন চেয়ারম্যান জয়েন করার খবর। অনেকদিন পর বাপ ছেলে এক হাসির বিষয় খুঁজে পায়। খুব হাসে। জয়েন করেই চেয়ারম্যানের দুর্দশা, চেয়ার ভেঙে মড়াৎ। কাগজেও বেরোল পরদিন। জয়েন করার খবর বেরোল। সুবুটা মজাও করতে পারে। পরদিন কাগজ খুলে বুকে ব্যথা অনুভব করে একষট্টি বছরের প্রৌঢ় গোপালদাস। ব্যাঙ্ক-এর ভল্টে টাকার বদলে সাদা কাগজের

বান্ডিল, ক্যাশিয়ার ধৃত। না, সুভাষচন্দ্র নয়। তবু গোপালদাসের বুকের ব্যথা কমে না।

শনিবার বউ নিয়ে বাড়ি এলো সুভাষচন্দ্র। শচীর কাছে দেবকীকে সঁপে দেয়। বাপকে বলে —ফ্ল্যাট বেচে দেব। দেবকীর বাচ্চা হবে। জেলেও যেতে পারি, ক্যাশ শর্ট আছে। গোপালদাসের বুক এবার টানটান, ব্যথা নেই। স্বাভাবিক স্বরে ছেলেকে প্রশ্ন করে — কত? —দুলাখ। —ডোন্ট ওরি, ভাবিস না।

আবেদনকারীর নাম পিতার নাম কিছুই লিখতে হয় না। সি আর বি আর. সি স্যারকে নাম না লেখা প্যাকেটটাই জমা দেয়। সুভাষচন্দ্রের রিজিওন্যাল ম্যানেজার চিত্তরঞ্জন ভৌমিক রায়চৌধুরী স্যার। বলে —স্যার, আপনি আমার ভগবান। দুলাখ থেকে অনেক বেশি টাকার মালিক এখন গোপালদাস। সুভাষচন্দ্র বাড়িতে ফিরে আসে, ফ্ল্যাট ভাড়া দেয় আড়াই হাজার টাকায়। গোপালদাসকে অবাক করে রাত দেড়টায় দেবকীর গর্ভে পুত্র সন্তান জন্মায়। ধাই ডেকে ঘরেই প্রসব হয়।

নাতি জন্মের খুশিতে বাইপাস দিয়ে সল্টলেকে সি আর বি আর সি স্যারের বাড়িতে যায়। সঙ্গে একটা রেকারিং ডিপজিটের ফর্ম। —স্যার! এই একটা জায়গায় সত্য ছাড়া কিছুই বলতে পারেনি গোপালদাস। —স্যার, নাতির জন্ম রাত দেড়টায়। —তোমার ঘড়ি দু ঘন্টা ফাস্ট ছিল বোকা। —স্যার! চিত্তরঞ্জন ভৌমিক রায়চৌধুরি স্যার বলে যান, কাঁপা কাঁপা হাতে গোপালদাস লিখে যায় —

নাম—শ্রীমোহনদাস মিত্র (মাইনর)

পিতার নাম—শ্রীসুভাষচন্দ্র মিত্র (স্টাফ)

নাবালক হইলে জন্ম তারিখ —২রা অক্টোবর ১৯৯২ (শুক্রবার)

অনুষ্টুপ, ১৯৯৫

ঘুঘুর ডাক

ঘুঘু ডাকে ঘু ঘু। ঘুঘুর ডাক মায়ের বুকে, ঘুঘুর ডাক ঘরের কোণে। ঘু-ঘু ঘুঘুর-ঘু। তিলুর ভয় এই ডাকে। এই বুঝি বাজে এই বুঝি ডাকে। ভয়ের তাড়ায় শোওয়ার ঘর ছেড়ে ছেলের ঘরে আশ্রয় নেয়। ওঘরেও কি শোওয়া যায়, আরো দ্রুত বাজতে থাকে ঘুঘুর-ঘু ঘুঘুর-ঘু। শেষ আশ্রয়ের খোঁজে বড় ঘরে রাজার চোখে অভিযোগের শূন্যদৃষ্টিতে কাটিয়ে দেয় রাত। রাতের পর রাত। ওগো বাঁচাও চিৎকারে কালো কোট খামচে ধরা তিলুর নিত্যি রাতের অভিসার। রাজার, রাজাজির কাঁধের ওপর প্রেমঘেরা মায়াময় চোখদুটিতে স্থির হয় তার অপলক চাউনি। ল্যামিনেশনের ঔজ্জ্বল্যে নিষ্কম্প চোখের তারায় জীবন হারানোর অসংবৃত দুঃখে পরিত্যক্ত স্বপ্নের বাসরসজ্জায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাটে রাত।

ওগো বাঁচাও চিৎকার সেরাতে শুনেছে পাড়াপড়শি। উত্তরা ঈশানী পূরবী উজ্জ্বলারা। কেউ দরজা খুলে কেউ জানলার আব্রু ঢেকে কেউ বা বেলোয়ারি আলো নিভিয়ে জ্বালিয়ে দেখেছে নাটক। রাজার কথায় নাটক নয় যাত্রা, বাপের গলায় শিকল দিয়ে মায়ের ভাঙে পিলা। ল্যামিনেশন দৃষ্টি যাই যতই বলুক তিলু জানে নাটক নয় যাত্রা নয় সিনেমাও নয় আজকের সন্তান। বোকা বৌ তিলুর দোষেই সন্তান সুখ হল না জীবনে। কচি বয়সের পোয়াতি কি জানত ঝাল খাওয়ার এই পরিণতি। টকঝাল তো সকলেই খায়। খেয়েছে বলে এমন হবে সন্তান? কিসের এত রাগ! রাগীর সুখ কোথাও নাই।

রাগী মানুষ কম দেখেনি তিলু। কুকাঠের জঙ্গলে রাজার মত চন্দনও তো ছিল। সদাহাস্যময় মানুষটি জীবনে রেগেছে খুব কম। রাগলেও মুহূর্তে মিলিয়ে গেছে, সতের রাগ জলের দাগ। ফর্সা রং আর কোপ কটাক্ষে মানুষ একেবারে পছন্দ করত না তিলু। ইলেকট্রিক সাপ্লাইর এক সাদাটিয়া ওভারসিয়ার এসেছিল তিলুকে দেখতে। সবাই বলেছিল শ্যামলা মেয়েকে পছন্দ করবে না। এমন চোখে লাগল যে দিনক্ষণ ঠিক হয়ে যায়। তিলু বেঁকে না বসলে কী আর কেল্টু চৌধুরির সঙ্গে তার বিয়ে হয়। চাল নেই চুলো নেই কিছু নেই একটা মানুষ। আছে শুধু কেলে রঙ আর সদাসঞ্চরমান দুটি চোখ। কোথায় বাড়ি, না বিহার। কী চাকরি, না ফিটার রেলের ওয়ার্কশপে। কিছু না মানুষটার সঙ্গেই তিরিশ বছর সুখের সংসার কাটিয়ে দিল তিলু ননীর পুতুল ওভারসিয়ারকে বিয়ে করলে কী হত তার, মামার দশা তো দেখেছে। ফকফকে সাদা মানুষ

অং বং পড়াশোনাও বিস্তর। মা বাপকে মান্যি করত না। মামী মরল গলায় দড়ি দিয়ে। দিদা বিধবা হয়ে মেয়ের বাড়িতেই কাটিয়ে গেল তিলুর সঙ্গে এক বিছানায়। মামার চোখ দুটোকে দিদা ভয় করত। আর তার ফিটার বাবুর চোখ দুটো যেন পুকুর পাড়ের দাড়কিনা মাছ, এই এখানে ঐ ওখানে সুখের সায়রে চিৎ সাঁতারে ডুব সাঁতারে সদাব্যস্ত। ফটো হয়েও তিলুর সঙ্গে লুকোচুরি খেলা চালিয়ে যাচ্ছে।

ফিটারবাবুর মা ছিল না। জন্মের পরই হারিয়েছে। মা বাবার যত্নে মানুষ করেছে রেল ওয়ার্কশপের হেডমিস্ত্রি তার ছেলেকে। যতই করুক মাতৃহীনের অভাব পূরণ করা কারো সাধ্যে নেই। তিলুও চেষ্টা করেছে, তাইতো বলত, তোমাকে যে এত আদর করি মান্য করি একি শুধু বউ বলে তুমি যে আমার মাও। কী কথার ছিরি পোড়ারমুখো মিন্‌সের! ওরকম কথা বলতে খুব সাধ হত তিলুর, মুখে আনেনি কোনদিন। তাও তার শেষ কপালে সুখ থাকল না। পিতাপুত্রের সংসার শ্বশুরবাড়িতে কোন দুঃখ ছিল না তিলুর। শ্বশুর তার ভালমানুষ ছিল না, কোপনস্বভাব, নেশাও করত। মদ খেয়ে পুত্রবধূর উপর চোটপাট করেছে। করুক, ছেলেকে তো ভালবাসে। রাজাকে তাই কখনও অনুযোগ করেনি। মানুষটা বুঝত সব, পটিয়ে ফেলত তাকে। বলত জানইতো এই মানুষটা ছাড়া আমার কেউ নেই। নেই তো নেই, তিলুর যেন রাগ হতে নেই, সে কী কেউ নয়। শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে শ্বশুরের মুখে গঙ্গাজল তো তিলুই দিয়েছিল। ফিটারবাবু তখন ওয়ার্কশপে নাইট ডিউটিতে। বন্ধুবান্ধব যোগাড় করে যখন ফিরল, মড়া আগলে বসে থাকা ভিতু তিলু মড়াবাড়ির শোক ভুলে হেসে ফেলেছিল। ফিটার মানুষের চোখদুটি সংসারের খুঁটিনাটি বিষয়কে স্বচ্ছতায় সহজ দেখত। অসহায় নারীর হঠাৎ নির্ভরতায় হেসে ওঠাকে অসংগত ভাবেনি। বাপের শেষযাত্রায় স্নান করিয়ে এসে বউকে যেকথা বলল, কেউ শুনলে বলত কী ছেলেরে বাবা! তিলু তো জানে, ছেলের মত ছেলেই ছিল রাজা চৌধুরী।

সেই বাপের ছেলে হল ইঞ্জিনিয়ার। তিলু ও রাজা চৌধুরীর একমাত্র সন্তান। বাপের চোখের সামনেই গলা চেপে ধরেছিল গর্ভধারিণীর। বাঁচাও বাঁচাও চিৎকার সে করেছিল সত্যি, তার সে কাতরতায় শুধুই বেঁচে থাকার আর্তি ছিল না। তার কোলপোঁছা সন্তানের শরীরের ঘ্রাণ, অনেকদিন ধরে যে ছেলেকে এত কাছে পায়নি, যে শরীরকে সে বয়ে এনেছে পৃথিবীতে। একদিনের জন্যও এমন লগ্ন হয়ে থাকেনি দশ বৎসর। একমাত্র সন্তানের প্রাণঘাতী আচরণে চিৎকার করেছে আবার জড়িয়েও ধরেছে প্রাণপণে। ছেলের বাপ দেখেছিল সেদিন, কুমাতার দুর্বলতা জানত একটাই মানুষ, মরে গেল। মার কণ্ঠনালী ছেড়ে বাপকে নিয়ে গেল হাসপাতাল। পুত্রের প্রতাপে আক্রান্ত হৃদয়ে জন্মদাতার গমন। শেষ যাওয়া তার সখের তিলোত্তমা ছেড়ে।

বউ-এর নামে বাড়ি করায় রাগ। ওরে কুলাঙ্গার, তিলোত্তমা যে তোর মায়েরও নাম। পেটের ভিতর রাগ হিংসে জেদ গজগজ করলে যা হয়। বুঝবে না কিছুই। ওর শুধু চাই। সব চাই, লকার চাবি সোনাদানা ব্যাঙ্কের কাগজ চাই, বাড়ি চাই বাড়ির নামও চাই। পঁচিশ বছরের নবীন বাস্তুকার আভ্যন্তরীণ সাজসজ্জার মনমতো নক্সা করেছিল। লোহার গেটে মায়ের নাম লেখা হতেই ভিতর বাড়ির সব ডিজাইন পরিকল্পনা পাল্টে ফেলল। গ্লেজড টাইল একপিস কমোড এনামেলপেইন্ট সেগুনকাঠের দরজা ওয়াড়ার ফ্লোর বেমানান হল স্মৃতিসৌধে।

রাজা চৌধুরীও বেহিসেবি ছিল না। ছেলে করল না বলে ফেলে রাখেনি তার বসতবাড়ির

অন্তরসাজ। পাড়াপড়শির রুচিবিকৃতির কারণ ঘটেনি, সে তার রাজাজির চোখের ঔজ্জ্বল্যে বুঝেছে। প্রতিবেশিও তাদের মন্দ ছিল না। প্লট করে বিক্রি করা জমির মালিক কাউকেই চিনত না। পরিযায়ী পাখির মতো উড়ে এসে বসে পড়ল তো পড়ল। নতুন আত্মীয় হল ডাইনে বায়ে সামনে পিছনে। বিটকেল মানুষ নামও দিত মজার মজার। উত্তরের বাড়ির চ্যাটার্জি গিন্নির নাম উত্তরা। কেউ পূরবী, বিনা কারণে দক্ষিণ বাড়ির বৌকে ডাকল উজ্জ্বলা। সিনেমাহলের নাম মিলিয়ে। ছেলেকে নিয়ে যখন নতুন করে বিব্রত তারা, উত্তরার বর চ্যাটার্জিদা কিন্তু ছেলের কোষ্ঠী বিচার করে তার গঠনপ্রকৃতি নিয়ে উদ্ভট সব প্রশ্ন করল। জজ ব্যারিস্টার অনেকে আসে উত্তরের বাড়িতে ভাগ্যবিচার করাতে। কেমন ধারা সব ধাঁধা।

চোখ নড়ে?

না।

জিভ নড়ে?

না।

আঙুল নড়ে?

নড়ে। ছেলের ছোটবেলা থেকে আঙুল নাড়ার অভ্যাস।

আর?

দাঁত কটকট শব্দ।

আপনি তো দেখেইছেন।

কানটা কি একটু বড়, খাঁড়া?

হ্যাঁ।

নাক?

নাকটাই ওর খুব সুন্দর, দীর্ঘ পুরুষালি। চ্যাটার্জিদা বলল না কিছু নিজে, উত্তরা ফেরৎ দিল কোষ্ঠী। ব্যবস্থা দিল, একটা দুইরতির গোমেদ আর প্রবাল যেন ধারণ করে রাজা। বাকি সব ঠিক আছে। সেই চ্যাটার্জি গিন্নিই তার রাজার শ্রাদ্ধের দিন বলে গেল আসর ভরে, সব জানত চ্যাটার্জি, ছেলের হাত থেকে বাঁচতে তাই বাপকে সাবধান করেছিল। দুটো আংটি ধারণ করলে এতবড় সর্বনাশ ঘটত না। জ্যোতিষের কেরামতি বাড়ল। খুনি ছেলের হাত থেকে বাঁচল না তিলুর জীবন সর্বস্ব। রাজা আর তিলুর মধ্যে অমিল একটাই, ধর্মকর্ম জ্যোতিষ গ্রহবস্তু মানত না রাজা, তিলু সব মানে।

দুটো আংটি পরাতে পারল না বলেই তার কপাল পুড়ল। পোড়ার কথা ছিল না, ছেলেকে বিয়ে করিয়েছিল বাপ কমবয়সে। সুখের মুখ দেখবে বলে কত সাত পাঁচ। গোঁয়ো বিহারি যখন কলকাতার উপকণ্ঠে উপনিবেশবাড়ির মালমশলা যোগাড় করল তখন হাতে দেড় লাখ টাকা, মাসে মাসে তিন হাজারি অবসর বৃত্তি। চোখে সোনার স্বপ্ন তাল তাল। আদর্শ পরিবারের দুই যোগ এক। মার সঙ্গে কথা বলে না ছেলে, এহয় নাকি? শোনেনি, দেখেনি কোথাও তিলু। মা ভাত বেড়ে দেয়, রান্না পছন্দ হল কি না, বাপের চোখ আর মায়ের মন দিয়ে বিচার করে তারা।

এ আর ভাল লাগে না, রাজা কতবার চেষ্টা করেছে মিটমাট করে দিতে, তিলু চায়নি । মায়ের গর্ব, মায়ের অভিমান বাধা দিয়েছে, মাতাপুত্রের সম্পর্কে মধ্যস্থতা কিসের ? হাহাকার বুকে নিয়ে জীবন কাটানোর শখও তাকে একবগ্গা করে তুলেছে । কে বলবে কী তার অপরাধ, মা হয়ে ছেলের প্রতি অন্ধ স্নেহই কী তার ঘাট ? শিক্ষিত সন্তানের মন পাওয়ার অন্য কোন তরতরিকা হয়ত আছে। পায়ে ধরে বলতে হবে ? মাপ করে দে বাপ অভাগিনী মাকে। কেন, কিসের অভাগিনী সে। রাজা তার পতি, যতদিন বেঁচে ছিল, সৌভাগ্যবতী সে। যা রেখে গেছে তাতে ছেলের মুখাপেক্ষি না থাকলেও চলবে ।

এত মজবুত ভিতের বাড়ি নেই কোন প্লটেই । রাজা বলত, ভিত মজবুত না হলে বাড়ি দাঁড়ায় না ।

দেখ, বাড়িটা হয়ে যাক, এখন ছেলেকে চটিও না, তোমার ছেলেকে তোমার কাছে দিয়ে চলে যাব একদিন ।

কোথায় যাবে?

কেন, তোমার কাছে ।

ও । এমন অলুক্ষুণে কথা কখনও বলবে না বলে দিচ্ছি ।

ঠিক আছে বাবা, বলব না । আমরা কিন্তু কোন ভুল করিনি তিলু ।

ভুল করিনি বললেই হল । ভুল কিছু হয়েছে বলেই না নতুন বাড়ি হয়ে ছেলের অবজ্ঞার মাত্রা বেড়ে গেল । ঘরের ভিতর সিগারেট । বাপকেও অমান্যি ।

তিলুর ওপর ছেলের রাগের একটা কারণ খুঁজে পেয়েছে । ঐ একবার মাত্র, কোল হারানোর ভয়ে স্বামীকে বলেছিল, হস্টেলে পাঠিও না । গরীবের ছেলে, এত পড়াশোনায় কী লাভ ।· ফিটারের ছেলে শুনেছিল গর্ভধারিণীব আপত্তি, পড়াশুনা শিখে শোধ তুলছে । কিন্তু বাপ? বাপ কী দোষ করেছিল ? বাপ তো ভেবেছিল তার মুখ, বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে । এখন পোড়াচ্ছে কেমন! পোড়ানোর কথা ছিল না এত তাড়াতাড়ি । সুখমুখি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ছেলেকে বিয়ে করিয়েছিল বাপ । বউটাও বেছেছিল ভাল, বিএ পাশ সুন্দরী, রংটা একটু চাপা । কালো বাপের গৌরবর্ণ ছেলে তাদের । বাপমায়ের পছন্দ বলে নম্রস্বভাব, মৃদুভাষী বউকে হেনস্থা মিছিমিছি । তিলু না দেখলে আগুনে পুড়েই মরত । মরত তো মরত, তোমার তাতে কি রাঁঢ়মাগী । তিলুর রাগ নিজের উপর । মানুষের আবডালে কথা তো শোনে । সেও জানে, ছেলে নেই মাগ নেই যার পোড়া কপাল তার । স্বামীহীনা পুত্রহীনা, ভরা সংসার থেকেও কিছু নেই যার তার কাছে কেন আসে প্রতিবেশিনীরা, জানে । রাজার প্রিয় রমণীরা, ঈশানী উত্তরা উজ্জ্বলা পূরবী। ওদের চোখের ধিক্কার বোঝে তিলু, চোখের ভাষা পড়তে শিখিয়ে গেছে একজন । ওরা বলে, সবতাতে ছেলের উপর দোষ চাপাও কেন দিদি । ছেলে আগে না ছেলের বউ । বোঝে, সবই বোঝে, সেও তো চায় ওদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে মাথা না গলাতে । ওরা বলে, ছেলে যত মন্দই হোক, বউ যখন একটা কপালে জুটেছে, ফেলে তো যায়নি, তখন কিসের চিন্তা । কিন্তু দিদি, মেয়েটা যে বড় মায়াধারী, মা বলে ডাকলে বুকটা হু হু করে ওঠে । তবে মর । পড়শি বললেই তিলু মরবে নাকি !

মরতেই তো যায়। এক কাপড়ে চলে যায় খাল পেরিয়ে। এপারে নিজের বাড়ি ওপারে ভাড়া বড়ি। ছেলের জেদ বাড়ে। বুড়ি তিলু পোয়াতি অবস্থায় লঙ্কা খেয়েছিল। ছেলের জেদ সামাল দিতে পারে না। অভিমান রাগ হয়ে বেরয়, চেঁচামেচিতে ছেলের মান সম্মান যায়। সরাসরি অপমান তো করছে না, অবজ্ঞা দেখিয়ে যাচ্ছে। নিজের বউকে অত্যাচার করব, মেরে ফেলব, তুমি কে বুড়ি ?

ছেলে কবে যে শেষ মা বলে ডেকেছে মনেও করতে পারে না তিলু। আর বউটা সারাক্ষণ মা মা করে ভরিয়ে তুলছে তার অপ্রাপ্য স্নেহক্ষুধা। মেয়েটা স্বামীকে ভয় করে যেমন, শ্বশুরশাশুড়ির কাছে পায় নির্ভরতা। রাজার সঙ্গে মিলে সুখ দিতে চেয়েছে উজাড় করে। তিলোত্তমায় যখন ছিল স্বামীর জন্য আব্দার করত তিলুর কাছে, –মা, তোমার কালো ছেলেব সবকটা সোয়েটারই অন্ধকার, উজ্জ্বল রঙের একটা বানিয়ে দাও না।

আমার ছেলে কালো হতে যাবে কেন রে মেয়ে ! কেউ কিছু আব্দার করলে বুক ভরে যায় তিলুর। ঈশানী বুড়ি পুরনো ডিজাইন করে, উজ্জ্বলার মেয়ে করে দিল সাদায় লালে। কিন্ত মারার ভাতার ব্যাগি সাইজের সুন্দর জামাটা ছুঁড়ে দিল বউযের মুখে। ভাগ্যিস বেচারি মুখ কবে না। সারা রাত একতরফা অশান্তির পর ভোর হয়। বউকে মেরে মাকে শাস্তি। এত অশান্তি, অপছন্দ, কালো বৌ, বোকা বৌ, বাপের পছন্দ করা বৌ। তাও তো ছেলে হল সেয়ানা ছেলের।

রেল ওয়ার্কশপের ফিটার রাজা চৌধুরির শখ ছেলেকে ফুটবলার বানাবে। পিকে অরুণ দের সঙ্গে এক মরশুমে খেলেছে কলকাতায়। মাঠের প্রথম বৎসরেই মালাইচাকি ঘুবে গেল। খেলা শেষ। ছেলেও তৈরি হয়েছিল, ট্যাকলিং পাসিং হেডিং শিখিযেছিল। ইঞ্জিনিযাব হতে রুরকি চলে না গেলে এখন ময়দান দাপাত। ছেলে ফুটবলার হয়নি বলে রাজার স্বপ্ন শেষ হযে যায়নি। স্বপ্নের মধ্যে বুড়ো রাজা চেঁচিয়ে উঠেছিল, আমার নাতি, আমার নাতি বলে। আমি শিখিয়েছি হেডিং করতে যে কোন দিক থেকে। তিলুকে বলেছিল, স্বপ্ন দেখলাম তোমাব নাতি বড় ফুটবলার হয়েছে, ধনরাজের মতো হেডিং-এ গোল দিচ্ছে। বলে দিলাম, আমার নাতিকে আমি শেখাব।

তাদের ছেলে হেডিং কাজে না লাগালে কী হল, পুলিশম্যান হয়েছিল। ফুটবলারের বউ তিলু অনেক নিয়ম কানুনই জানে। মাঠেও গেছে কয়েকবার। বিহারের বাড়িতে আত্মীয় বন্ধুজন আড়ালে বলত, রাজা চৌধুরি আদর দিয়ে বাঁদর গড়ছে। কারো সঙ্গে মিশত না, কথা না, পড়াশোনা নিয়েই থাকত। বাড়িতে মানুষ এলে চ্যাটাং চ্যাটাং কথা। এসব কেউ শেখায়নি। বাঁদর হয়েই জন্মেছিল। মা বাপের জীবনেও পুলিশম্যান! ঘাপটি মেরে শুয়ে থাকত মাঝখানে। কেউ একজন কারো গায়ে হাত ছোঁয়ালেই জেগে উঠে চোখ পাকাত। রাজাকে চুপিসাড়ে দেখে খুব মজা হত তিলুর, তারও কী ভাল লাগত, কারই বা ভাল লাগে, স্বামী স্ত্রীর জীবন চুরি করে কাটানোর জীবন হয়ে গেলে। পুরুষ রাজা মানতে চাইত না। মা তিলু ছেলেকে বুকে আঁকড়ে শুয়ে থাকত। রাজাজিও শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করল ছেলের জন্যই তাদের একের বেশি দুই হল না।

তিলু মৃত্যুকে ভয় করে। আসলে মৃত্যু নয়, অভ্যাসের ছেদ পীড়িত করে তাকে। যে কোন অভ্যাসই অনন্তকালীন নয় এ সত্য সে মানে না। তাই তার জীবনে বিচ্ছেদ এত দুরন্ত।

মা বলে ডাকে না ছেলে। হস্টেলে চলে যেতে গুমরে গুমরে মরেছে। স্বামী চলে গেল একেবারে। একলা নিজেকে নিয়ে অভ্যাসের দাঁড় টানতে ইচ্ছে হয় না। শুধু স্মৃতি আর ভাঙাহাটে যা আছে তা নিয়ে নতুন দুর্গ গড়ে তোলা। রাজার মতো মুখচ্ছবির নাতি, লক্ষ্মীপ্রতিমা বউমা আর মা না বলা ছেলের জন্য রবিবারের মাছ মাংস চাউমিনের কৌটো সাজিয়ে, গোলাঘাটার খাল পেরিয়ে সকাল সকাল পৌঁছে যায় অভ্যাসের মা ঠাকুমা শাশুড়ি। মাকে দেখল তো বাঁদর ছেলে ফটাস করে সিগারেট ধরিয়ে অনিচ্ছুক ছেলের হাত ধরে বেরিয়ে পড়ল বিডি মার্কেটে। কত আর সহ্য হয় স্নেহাতুর ঠাকুমার। অবাধ্য ছেলের হাত থেকে স্নেহের পুত্তলি কাড়তে গিয়েই হাতাহাতি হল। মার জেদ তো ছেলেতেও বর্তমান। হাত মুচড়ে ভেঙে ফেলল। ভাঙা হাত নিয়ে বেঁচে তো আছে, রাঁধচে খাচ্চে, আবার কৌটো ভরে নিয়ে যাচ্ছে খালপারের সব পেয়েছির দেশে।

তিলুর আজকাল খুব ভুলভালও হয়। নিজের খেয়ালে ঘটনা পরম্পরা সাজায়। হাতভাঙার ঘটনা তিলোত্তমায়, নিয়ে গেল খালপারে। অপরাধের পর ছেলের ছুতো হল, পাড়াপড়শি জেনে গেছে থাকবে না মায়ের বাড়ি। বাপকে মেরেও লজ্জা হল না, হাতভাঙায় হল। ধড়িবাজ ছেলে সব ঠিকঠাক করে পালাল। অভ্যাস ভাঙল আবার। মন পুড়ে পুড়ে আর মন বলে তো কিছু রইল না তিলুর। অপয়া বাড়িটাকে আবার ঝাড়পোঁছ, সাফসুতরো করল, রাজার ছবি বেলফুলের মালা দিয়ে সাজাল। রবিবার বিকেলে বেতার নাটক শুনল।

নাটক পাগল মানুষ ছিল রাজা। বিহারে শখের নাটক করত পুজোয়। সিরাজৌদ্দাল্লা শের আফগান করেছে। কালো হলে কী হবে, দেখতে ছিল রাজার মত। মিশরকুমারীতে বিচ্ছিরি সেজেছিল সামুন্দেশ। কালো মুখের উপর কালো রঙ। বাড়ি করার পর কালার টিভি কিনল, বুষ্টার লাগিয়ে বাংলাদেশের নাটক দেখত শুধু। বাপের সম্পত্তি টিভি ফ্রিজ কেড়ে নিয়েছে ছেলে। ঘরটাকে ন্যাড়া করে সব নিয়ে গেছে। রাজার স্মৃতি উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে ভিখারি বানাতে চায় পুত্র। সোফাসেট, একটা দোলনা ছিল বারান্দায়, খালপারের বাসায় ফেলে রেখেছে। ফিটারের সখ, বিকেলে দুলে দুলে সূর্যডোবা দেখবে আর চায়ে চুমুক দেবে দুজনে। দেখেছে দুলেছে খেয়েছে কদিন। দস্যি ছেলে লকারের চাবির জন্য হুজ্জতি করে গেছে, টিনের তোরঙ্গ ঘেটে লুটপাট করেছে। পায়নি শুধু সাতরাজার ধন মানিক, তার লকারকাঠি।

নাতিকে গল্প শোনায় তিলু ওপারে গিয়ে। হাঁউ মাঁউ খাঁউ, ডালিমকুমার সাতভাই চম্পা, রমুনা যমুনা মেয়ে দুটোর দুঃখের কথা শোনায়। আওলা খায় আলুনি খায়। নাতি ঠাকমাকে শুধায়, ঠাম্‌মা তুমি কি খাও? ঠাম্‌মা বলে, আমার দাদুর আদর খাই, ঢগর ঢগর পানি খাই। রূপকথা থামিয়ে পুত্রবধূ শাশুড়িকে বলে, তুমি আর এবাড়িতে এসো না মা। হতভাগি তিলুর অভ্যাসের ঠাঁই আবার নড়ল। সাধের বউমার আচমকা আঘাতে বুকের পাঁজর ভাঙে ঝনঝন ঝনাৎ। ভালই হল বউমা, মঙ্গল হল, তিলু কে তোমার সংসারে? স্বামী পুত্রের সংসারে এক অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশ। অপয়া এক বেওয়া রমণীর ছায়ায় অমঙ্গল হতেই পারে। সব মানে, সব জানে, জেনেও কী তার সংকটের নিরসন হয়? এসো না বললেই না এসে পারা যায়! অবাধ্য অপদার্থ দায়িত্বজ্ঞানহীন ছেলে স্যুটবুটে সেজেগুজে অফিসের গাড়িতে বেরিয়ে যায়। ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ হয় সাহেবের, রাতেরও হরেক রকম এখানে ওখানে। বউ বাচ্চা খেল না মরল খবর রাখে কে, এই হতভাগিনী ছাড়া। পাঁচ বৎসর পর পেনশনও অর্দ্ধেক, এক ফিটারের পাওনা কতই বা

ছিল। নিজে খায় একবেলা। গাঁটে টান পড়ায় সেদ্ধ চাল ছেড়ে রেশনের আতপ খায়, সাড়ে সাত টাকা কিলো। আর খায় ঢগর ঢগর পানি।

মুস্কিল আসান পক্ষীরাজ হীরামনের গল্প বলতে বলতে তিলুঠাকমার মাথায় দুষ্টবুদ্ধি খেলে। বলবে নাকি, সেই গল্পটা, ছেলে মা বাপকে মাটির বাসনে খেতে দেয় নিজে খায় সোনার থালায় রুপোর গেলাসে। তার যে ছেলে সে একদিন কচিকচি হাতে কাদার তাল মাখতে শুরু করে উঠোনে। কী করছ সোনাবাপ? ছেলে বাপকে বলে, তোমার জন্য থালা গড়ছি, বড়ো হলে খেতে দেব। তিলুর ভাল লাগে না, নিজের উপর বিরক্ত হয়, এমন কথা দাদুসোনাকে বলা যায় না, কচি মনটা যে বিষিয়ে যাবে।

বিষিয়ে কী যায়নি! শুধু তিলু বললেই দোষ! বউমাকে শাসিয়েছিল, কী করবে বেচারী সাদামনে শাশুড়িকে বারণ করল। ভয়ত্রস্ত সাতবছরের দাদুভাইটা হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল, তুমি এস না, বাপী তোমাকে মেরে ফেলবে ঠামমা। মা ছেলেতে ভয় পেয়েছে। আতঙ্ক ছড়িয়েছে তিলুর পেটের দুর্গন্ধ।

ঠিক আছে যাবে না। যায়নি তিলু তিন দিন। প্রতিদিনই একবার নৌকোয় উঠেছে ওপারে গেছে চলে এসেছে কুড়ি পয়সা পারানিকে দিয়ে। ওদের সংসারে ওরা থাকুক, তিলুর তাতে কী! কৌটোর তরকারি পচে দুর্গন্ধ হয়েছে, ফেলে দিয়েছে। দিন তো নয় কেটে গেল নৌকো নৌকো খেলায়। রাতের বেলা ঘুঘু ডাকে ঘুঘু। ঘুঘুর ডাকের টেলিফোনটা নিয়ে যায়নি বলে মাঝরাতে বেজে চলে ঘুঘুর ঘু। ঘুম আসে না। ঘুমঘোরে একটা মুখই ভেসে ওঠে। বউমা নয় স্নেহের পুত্তলি নাতিটাও নয়, এক অপদার্থ অকৃতজ্ঞ সন্তানের মুখ ভেসে ওঠে। তিন দিন তিন রাত্তির যেন অনেক দিন অনেক রাত, নতুন করে অবজ্ঞা করল না সারাজীবন মা না ডাকা সন্তান। এই তার সম্পর্ক, এই তার অভ্যাস। যাকে সে তিল তিল করে তৈরি করেছে। যে জীবনে তার মাকে মা বলে ডাকেনি, বাপের অকালমৃত্যুর কারণ হয়েছে। এখন তিলুকে মারবে বলে হুমকি দিচ্ছে। মধ্যরাতেই, মায়ের বুকে ডাক পড়ে ঘুঘুর ঘু। ঘুঘুর ডাকে আতঙ্কিত তিলু ভাবে তার অপরাধের কথা হাহাকার ভরা রিক্ত হৃদয়ের মাতৃস্নেহ কুপুত্রের অপরাধ আড়াল করে। অভিমান জমে জমে ছেলেটা তার পাথর হয়ে গেছে। বাপ থাকলে একটা মধ্যস্থতা করতে পারত। দুরন্ত টাকার মুখে ছেলেকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবেই কাটাল। শত অপরাধ ক্ষমা করেও মুখ ফুটে কিছু বলতে পারল না। স্নেহে আদরে কাছে ডাকলে কী ছেলেটা এমন হত?

ষাট বছরের বুড়ি মধ্যরাতে কিছুই বদলাতে পারে না। না তার স্বভাবের ত্রুটি না তার তীব্র স্নেহক্ষুধা। ওরা ভেবেছে এতবড় বাড়িটা আগলে রেখে সে ওদের প্রাপ্য কেড়ে নিচ্ছে। বাড়িটা দিয়ে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তবে আয় নিয়ে যা সব। ব্যাঙ্কের কাগজ, সোনাদানা বাড়ির দানপত্র। তোরই ছেলের ঘুনসিতে তাবিজ বানিয়ে দিয়েছিরে, চাবিটা খুলে নিস। মাতৃহত্যার পাপ তোকে লাগতে দেব না বাপ।

জ্যোতিষ দেখিয়ে ঘটা করে মস্ত বড় তাবিজ বানিয়েছে রুপোর, চাবিটা যে ঢুকিয়েছে কেউ জানে না। দাদুভাইকে রূপকথার গল্প শুনিয়েছে, রাজকন্যার প্রাণভোমরা কোথায় থাকে। সাতসাগর তের নদীর পারে রুপোর কৌটোয় রাখা আছে রাজকন্যার প্রাণ। দাদুভাই, আমার প্রাণভোমরাও লুকনো আছে তোমার কোমরের রুপোর কাঠিতে। বউমাকে

দিয়ে তিন সত্যি করে কথাটা বলেছে। এসেছিল, তার নাড়ির শত্তুর আবার এসেছিল। এবার কোন উপলক্ষে নয়। মাতা পুত্রের সম্পর্কে আর তো কোন অনাবিষ্কৃত অস্ত্র নেই যে উন্মোচিত হবে। নিয়ে যাওয়ার মতো কিছু পড়েও নেই মাতৃস্নেহ ছাড়া। একটা ভাঙা খাট টিন তোরঙ্গ ছেঁড়া কাপড়চোপড় ও কাঁথা। হাঁড়িকুড়ি কেরসিন স্টোভ। আর একটা সম্পত্তিও আছে, তার মধ্যরাতের শত্রু, ঘুঘুর ডাক। বড় বইটাতে রাজা চৌধুরীর নাম জ্বলজ্বল করে বলে পেনশনের টাকা থেকে দুমাস অন্তর দিয়ে যায় চারশ টাকা। তিলু কাউকে হ্যালো করে না। মাঝ রাত্তিরে তাকে ভয় দেখায়, কেউ একজন গালাগাল দেয় অকথ্য। ছেলে তার যত নিষ্ঠুরই হোক, ভীরু নয়।

এবার বিনা কারণেই লাগতে এল। তিনদিনের অদর্শন সইতে পারেনি, এসেছে এক অভিনব আব্দার নিয়ে। টেলিফোনটা চাই, কাগজও চাই। তিন দিন পর ছেলেকে দেখে চেঁচিয়ে উঠেছিল তিলু। চিৎকার করার ইচ্ছে হয়েছিল তাই গলায় আসুরিক শক্তি দিয়ে 'অ্যাঁ' বা ওরকমই কোন একটা ব্যাদন করেছিল। না করেনি, সে তো জানে তার ডাকাত ছেলের ইচ্ছেটাই শেষ কথা। দুঃখ হয়েছিল, শেষ অভ্যাসটুকুও কেড়ে নেবে? ঘুঘুর ডাকের টেলিফোন এনেছিল রাজা। ঠিক দুপুরবেলা বাইরে থেকে টেলিফোন করব, ঘুঘুর ঘু ঘুঘুর ঘু দারুণ দেখ! একা বাড়িতে কেমন উদাসী হয়ে যাবে মন, মন বিবাগী হলেই উঠিও, বলো হ্যালো। এখন মরা ভিটেয় একটাই ঘুঘু শুয়ে থাকে সারা দিনমান। মধ্যরাতে একবার জেগে উঠে ঘুঘুর ঘু ঘুঘুর ঘু ডাকে। মায়েব বুকেও বাজে একই ডাক। ভয় ভয় আর্তনাদ ওঠে শরীর জুড়ে। ওগো বাঁচাও, দৌড়ে যায় প্রেমঘেরা মায়াময় চোখদুটোর কাছে।

আওলা খায় আলুনি খায়

ঢগর ঢগর পানি খায়।

তিনদিন কিছুই খাওয়া হয়নি, আওলা আলুনি কিছুই না। রান্নাই হয়নি তো খাওয়া। ঢগর ঢগর পানি খাওয়ারও শক্তি নেই। অশক্ত শরীর বেয়ে শুধু শিরশিরানি মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা, ঘুর্ণন। কাতরানি। বাইরে ঝড়ের ফোঁসফোঁসানি, ভিতরে ঘুঘুর ডাক পাল্টে যায় ডাকটা। তিলুকে অবাক করে ঘুঘু ডাকে ক্রি রি রিং ক্রি রি রিং। হ্যালো, ঝড়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিকট হাসির শব্দ, তোর নাতির ঘুনসি থেকে তাবিজ হারিয়ে গেছে বুড়ি। হা হা হা। আবার তিলুর নিস্তেজ কণ্ঠস্বর বিভৎস চিৎকারে 'অ্যাঁ' করে জেগে ওঠে। বেঁচে আছে, বেঁচে থাকার চালিকাশক্তিতে ভর করে উঠে দাঁড়ায়। রাজাজির কালো কোটের উপর মাথার ভর রাখে। মাথা ঠুকে ঠুকে আশীর্বাদ নেওয়ার ভঙ্গিতে হাতজোড়ও করে একবার।

দরজা খোলে। পরিচিত পথের দিশা পাল্টায়, খালপারে নৌকো থাকবে না এত রাতে। ফুটব্রিজ ওঠা আর নামা, নিমেষেই সারা হয়। গন্তব্যে পৌঁছতেও সময় নষ্ট হয় না। দাদুভাই, দাদুভাই। দরজার শব্দ ঝড়ের শব্দ একাকার হয়ে এক তীব্র আলোর ঝলকানি তার জ্যোতিহীন চোখে। অশক্ত অভুক্ত শরীরেও তিলু বুঝতে পারে তার পরিচিত দেহঘ্রাণ, তার প্রাণশক্তি। ছেলেকে দেখে মা। অপদার্থ ছেলেটা একবার হয়তো হতভম্ব হয়ে যায়। মাকে দেখে পুত্র, দীর্ঘ আঁচল টেনে টেনে উঠে দাঁড়াচ্ছে জন্মদাত্রী। দরজা বন্ধ হয়ে যায় তার বিছানো সিক্ত আঁচলের উপর, আজ বৃষ্টির পরশে শীতল হয় মাতৃহৃদয়।

ফেরা। ফুটব্রিজের মাঝামাঝি বিদ্যুৎ চমক। খালের জলকে ভরসা হয় না তিলুর। তীব্র আকাঙ্খায় জলকে উপেক্ষা করে নেমে আসে তিলোত্তমায়। আঁচল তো বিছিয়েছিল ছেলের সামনে। যা পারেনি জীবনে, ছেলের কাছে ভিখারি সাজতেই গেছিল। আঁচলের খুঁটে ছিল দরজার চাবি। এখন নেই। নিজের ঘরের দরজায় দুমদুমিয়ে দাপায়। রাজা দরজা খোল, দরজা খোল রাজা। বন্ধ ঘরের ভিতর ঘুঘুর ডাক শুনতে শুনতে ভিজে কাপড়ে ঘুমিয়ে পড়ে তিলু।

অমৃতলোক ১৯৯৭

ফুলমালার সংসার

নিতু মাকে বলত, —জান মা, মাছেদের সংসারেও বাবা মা ভাই আছে। বৈরাগীমঠ বাজারের গোবিন্দ টিনের ট্রেতে মৃগেল কাতলা চারাপোনা তেলাপিয়া সাবান জলে জিইয়ে রাখে। তোলার রসিদ সাঁটতে সাঁটতে চোখ আটকে বসে থাকত নিতু। বাড়ি ফিরে মার কোলে খুশির ফরফরানি, —গোবিন্দদার টিনপুকুরের মাছগুলি কী সুন্দর গো মা! পেটমোটা আমেরিকান রুই ভুসভুসিয়ে কথা বলে। মুখ উল্টে ভুসভুসানো দেখাত আর মাছেদের ভাষায় কত কথা, —মাছেরা ওরকম কথা বলে। বলে, আমরা ভাল আছি। তুমি? আমি ভাল নেই মা! কাগজ সাঁটতে ভালো লাগে না। নিতুর দুঃখের কথা বোঝে তার মা। —কাটা পুকুরের জল দেখেছ মা, গোবিন্দদার সাবানগোলা জলও এত পরিষ্কার না। টলটলে জলে কত রকমের মাছ! লাল নীল হলদে সবজে বেগুনি রঙের মাছেদের কত কথা! আকাশের সাথে কথা, ডালিম ফুলের সাথে, করঞ্চা, আমলকী, বট, পাকুড়, কতরকম ফুল ফল পাতাদের সাথে কথা। —আর তোর সাথে? —হ্যাঁ, আমার সাথেও বলে, আমি তো নেমে যাই জলে। —জলে নামিস? যাসনে বাবা কাটাপুকুর! কাতর অনুনয়ে ছেলের মাথায় হাত বুলোত মা। কাটাপুকুরের জলকে বড় ভয় নিতুর মার। সে কতদিন হল, নিতু কি তখন পেটে? চোখের সামনে ঝপাং, হাট্টাগাট্টা ছেলেটি ডুবে গেল জলে। দোজবরে বিয়ে হয়ে নিতুর মার কত সুখ তখন। নিত্য হনিমুন। কাটাপুকুর পারে। ইভিনিং শো শুরুর পর খাওয়া হত ফুচকা। দু আনায় চারটে আর দুটো ফাউ দিত বন্ধু রামাধারী। শুধু কী হনিমুন, আরো অনেক ইংলিশ কথা শিখিয়েছে ফুলমালার ছোট ছেলে আর তাদের বাপ।

নিমু মাকে ডাকত —হাই মাম্মি! আজকাল মুখের হাসিটুকুও দেখিয়ে যায় না। হাই ডার্লিং বলে বৌকে। মা ফুলমালা হেসেছে প্রথম প্রথম, কানাকানি করেছে দুজনে, —আমরাও এমন করেছি, করোনি বল? তুমি তো ডায়লগ ঝাড়তে বাজে বাজে। প্রাণ, অজিতের গলা নকল করে ডেকেছ, মোনা ডার্লিং। হেসেছে দুজনে। নিমাই মাকে আরো অনেক শিখিয়েছে। কপিলদেবের ছবি দেওয়া বইটা পুরো মুখস্থ নিমুর। নিমাই মাধ্যমিকে না বসেও ফটর ফটর ইংলিশ বলে, হিসেব কষে ইংলিশে। বড় ভাই দুবার গোল্লা মারায় ক্লাস এইটেই দোকানে ঢুকে গেল নিমু। আদ্যানাথের হেডমাষ্টার ঠাট্টা করে বলেছিলেন, —স্পোকেন ইংলিশ শিখিয়ে দাও ছেলেকে, ব্যবসায় ইংরেজি জানাটা দরকার। ম্যাট্রিক পাশ করতে অনেক পড়াশোনা। ছেলে মায়ের উপর

শিক্ষা ঝালিয়ে নিত। পড়া ধরত। ধাঁধা বলত, --লাইফ প্লাস ফ্লাওয়ার, ফ্লাওয়ার প্লাস লাইফ। ফুলমালা আটকে গেল প্লাসে। হাসপাতালের চিহ্ন এঁকে দেখানোয়, ছেলের পিঠে চাপড় মেরেছিল, --বদমাশ! লাইফ মানে প্রাণ, ফ্লাওয়ার মানে ফুল, ফুলমালা। দেশে থাকতে বড়দার বন্ধু লিখেছিল বিশালাক্ষ্মা মন্দিরের গায়ে। শিবু যোগ ফুলি। চকখড়ির দাগ মুছতেও প্রাণ চায়নি আবার ধুকপুকুনিও ছিল অনেক দিন। দাঙ্গা মাঙ্গা হল, দেশ ছেড়ে কলকাতা। বিয়ে হল দোজবরে, লাইফ। প্রাণগোপাল পোদ্দার ফুলমালার জীবনকে খুশির সুখে ভরে দিল। হল নিতু নিমুর মা। মাম্মি ডার্লিং। স্পোকেন বইটা মুখস্থ হওয়ার পর ফুলমালা জানল ছেলের তার শিক্ষা হয়েছে। নিতু, নিমুর মার বড় সুখ ছিল।

ফুলমালার শিক্ষিত ছেলে খোলাদিনে দোকান বন্ধ করে চলে গেল। চাবিও দিয়ে গেল না। বাপকে বলল না। বৌ কুন্তি বিবরণ দিল শাশুড়িকে, মামাতো বোনকে দেখতে আসবে, শ্যামনগর যাচ্ছে। এত বড় মিথ্যে কথা বলতে বাধল না বৌটার। ছেলেও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল। ফুলমালাকে বোকা পেয়েছে! দুটো ছেলে ধরেছে পেটে, বোঝে কিসে কী হয়। ডাক্তার দেখাতে যাচ্ছে বললে কি বাধা দিত? নাতি পুতির শখ তো তাদেরও আছে। ডায়লগ ফুলমালারও জানা আছে, শাশ ভি কভি বহু থি। বুড়ো হয়েছি বলে কী বেটি, কিছু বুঝি না? মার্ফি রেডিওর মুখেআঙুল বাচ্চার ছবিটা শখ করে বাঁধিয়ে রেখেছিল নিতু তার ঘরে। বড় ভাইকে তো দুর ছাই ছাড়া কিছু করলি না জীবনে। দাদার শখের জিনিসটা নিয়ে রাখলি নিজের বিছানার উপর। বোঝে না কেউ? হাতের শাঁখা খুলে কেউ যায় মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে, অষ্টধাতুর আংটিটাও নতুন, পোয়াতি ছাড়া পরে? দিনে বারবার বাথরুম যেতে দেখে ধরেছিল শাশুড়ি। বলেছিল, পেটখারাপ হয়েছে কাছিমের মাংস খেয়ে। সেখানেও দোষ ফুলমালার। কচ্ছপের ডিম, কাছিমের মাংস পছন্দ বলে এনেছিল শ্বশুর। সেকী জানত তার পুত্রবধূ গর্ভবতী? লুকিয়ে শিকড় মাটি খেতে দেখে ফুলমালা হাসিমুখে কাছে গিয়েছিল। আমলই দিল না। নিমুর বাপকে বলেছিল। নাতি নাতনির স্বপ্ন যে মানুষটাকে আনন্দে উদ্বেল করত, সেই মানুষই রাতে মদ খেয়ে এসে বলল, --কুছ পরোয়া নেই ডার্লিং, আমরা আবার সংসার পাতব। এবার তোমার কথাই থাকবে, মেয়ে হবে। একা দুপুর বেলা তাই ফুলমালা তার প্রাণের মানুষকে জব্দ করার নতুন ফন্দি ভাবে। দশদিন পেরিয়ে যাবে আজ। পঁয়তাল্লিশ বছরের বুড়ির সব জারিজুরি শেষ। মাসের শেষের উৎকণ্ঠার অবসান। ফুলমালা তো জানে রহস্য, গৌতমীর বাবা কী অতসব বোঝে?

ফুলমালা এত বড় মানুষটিকে প্রাণ বলেই ডাকে। জীবনের সব সুখ আহ্লাদেও যেমন, দুঃখ বিষাদেও এই একটি নাম ও মানুষ ছাড়া কিছু নেই তার। বৈরাগী মঠের একশ'ষাট ঘর মানুষের, যুবা বৃদ্ধ শিশু সবাই প্রাণকে কজনইবা জানত প্রাণগোপাল পোদ্দার নামে। মাথায় টুপি হাতে ছড়ি সেই পরাক্রান্ত ভিলেন আবার হয়ে গেল গোপালদা। ফুলমালা তো আর ও নামে ডাকতে পারে না। তার কাছে প্রাণই তার নিজের মানুষ। ফুলমালার হিরো প্রাণ। অমরদীপ আই মিঙ্গন কে বেলা জিস দেশ মে গঙ্গা বহতি হ্যায় রাম আউর শ্যাম এর ভিলেন প্রাণ। নিতাই নিমাই এর বাপ প্রাণ মনোজকুমারের উপকার দেখে এল চিত্রবাণীতে। বেড়ে ওঠা বাচ্চা দুটো ঘুমিয়ে পড়লে ফুলমালার প্রাণের মানুষ বলেছিল, --জানিস ফুলি, এতদিন জানতাম না, প্রাণের মতো কায়দা করতাম। সিনেমা হলের গেটম্যানকে বিদ্রূপ করে বৈরাগী মঠের মানুষ। ছেলেদুটো বড় হচ্ছে,

বাপ ভিলেনকে নকল করছে দেখলে বিগড়ে যাবে। বলেই টুপি আর ছুঁড় ছেড়ে দাড়ি রাখতে শুরু করল ডাকাবুকো মস্তান মানুষটি। দাড়িওলা মানুষকে প্রাণ ডাকলে রাগ করে। প্রাণগোপালও কেউ ডাকেনি। নিতাই নিমাই এর বয়েসীরা গোপালকাকুকেই চেনে। বয়স্করা কেউ কেউ হঠাৎ ভুল করে। সদাহাস্যময় মানুষটি রেগে গম্ভীর হয়ে যায়। রাগ দেখলে ফুলমালাও একটু চোপা করে, —দাড়ি রাখলেই হিরো হওয়া যায় না, তোম্বা ফোলানো গোবিন্দার বাপকে মানুষ ভিলেনই বলবে। ব্যস, মাখন গলে ঘি, মাটির মানুষ আবার। —তুই আবার রাগিস কেন ফুলি। —রাগব না? এ কোন ডাক হল, ফুলি ফুলি ফুলি, দাদ হাজা ছুলি। একটু ভাল করে ডাকতেও পার না। এই ফুলি ফুলি করে এলে কিচ্ছুটি হবে না, পাবেও না। কে কার কথা শোনে, দাড়ির ফাঁকে বোকা হাসি দিয়ে ফুলমালাকে পটিয়ে ডাকবে, —ফুলি। কতদিন বলেছে, বল ফুল বল মালা। ওয়াশিং পাউডার ডিসপ্লে প্রাইজের টিভি বাড়িতে আসতে ডাকল, —মালা ডি। কানে কানে।

গৌতমীর বাপ ভয় পেয়েছে জোর। মৌলালি ছাড়িয়ে বেকবাগান না কোথায় নিয়ে যাবে ডাক্তার দেখাতে। কম করেও পঞ্চাশ বছরের বুড়ো মেয়ের বাপ হবে। শখ কত। তিনটে বাজতে না বাজতেই, ম্যাটিনি চালু করে দিয়েই চলে আসবে। ডাক্তার কী বলবে? যে পেটে ধরবে সে জানবে না, জানবে ডাক্তার! ডাক্তার বলবে, স্যরি। ফুলমালা কী হাবে ভাবে কম বুঝিয়েছে, স্যরি মিষ্টার স্যরি! এবার উল্টো বলুক, স্যরি ম্যাডাম স্যরি। ফুলমালা বলেছিল, হলে গিয়ে কাজ নেই আজ। বুলু বনিকের ম্যানেজার সুবল সামন্ত শো শুরু না করিয়ে ছাড়বে না। ওস্তাদ গেটম্যান। নিতুর বাপের প্রমোশন হয়েছে, নিচুতলার ফ্রন্ট রিয়ার স্পেশাল থেকে এখন ডিসি ব্যালকনিতে। উপরেই হোক নিচেই হোক সব সিট মুখস্থ। টর্চের আলো সঠিক সিটে গিয়ে পড়বেই নির্ভুল। মুখেও খই ফুটবে,—দুটো ছেড়ে তিনটে, ডি সি ওদিকে। আলোর দন্ডে ঠিক দিকনির্দেশ। পাশ-এর টিকিটে পর্যন্ত ফুলমালাকে বলে দিল চলে যান চারটে ছেড়ে। আপনি আজ্ঞে করতে দেখে একটা জোর চিমটি কাটার ইচ্ছে হয়েছিল। ভয়ে কাটেনি, যা সরল সিধে মানুষ হয়তো হলের ভিতরই হইচই জুড়ে দিল। তখন আর হুঁশ থাকবে না, বউএর চিমটি না পদ্মা খান্নার! এবার ভয়ে নয় আনন্দের আশঙ্কায় ভুল করবে। সময় পেরিয়ে যাওয়ার ঘটনা এর আগেও ঘটেছে। একবার পনের দিন। তখন মানুষটার কী ভয়! টর্চ চালাতে ভুল, মুখেও ভুল। তিনটের জায়গায় সাতটা ছেড়ে। উল্টোপাল্টা সিটে বসিয়ে দর্শকের প্যাক আর ম্যানেজারের ধাতানি। নিমু কত ছোট তখন, নিতু নিমু দু'ভাই-এর সংসারে উৎপাতের ভয় ছিল বাপের।

এবার ভয়ডর নেই একেবারে, আমি কারো খাই না পরি! লজ্জা কিসের? লজ্জা ফজ্জার ধার ধারে না গোপাল পোদ্দার। দশ তারিখের পর দশ দিন পেরিয়ে গেল। বাড়ি ফিরে একই প্রশ্ন, হয়েছে? হয়নি শুনে কী খুশি মানুষ! এর আগে এরকম হলে বাড়ি মাথায় তুলত। মন খারাপ, চোটপাট। যেন সব দোষ ফুলমালার। তেঁতুল গোলা খাইয়েছে দিনরাত। ঠাকুরপুকুর ছাড়িয়ে গেছে বড়ো কাছারিখানে। কাদামাটি এনে খাইয়েছে। কাদা খেয়ে কী বমি! বমির সঙ্গে গোল্লাছুট! ফুলমালা একবার হাসি মুখে ওয়াক করল। সুখি মানুষটার জীবনে এত দুঃখ কেন? ভাল লাগে না তারও। প্রাণের মানুষ সুখে থাকলে তারও সুখ। আলোওলা এক মিচ্‌কে মানুষের আনন্দে সওয়ার হয়ে ফুলমালার দুঃখ চাপা পড়ে থাকল তো থাকলই। একাকি সময়ের বিষাদকে আবার ওয়াক শব্দে ভাঙে ফুলমালা।

দুঃখ পেলেই মানুষটি শুধু স্বপ্ন দেখে। অসম্ভব সব স্বপ্ন। কল্পনা ভাবনাকে জীবনে টেনে আনে হিঁচড়ে হিঁচড়ে। নতুন জীবনের খোয়াবনামা। গুনগুনিয়ে গান গায়, নান্‌হা সা গুল খিলেগা অঙ্গনা। বাংলা সিনেমার গানের সুরে দুঃখিত হয়, আজ সাগরের ঢেউ দিয়া মুছিয়া দিলাম। সব মুছে দেওয়া যায় না বাবুমশাই। পাগলামিরও একটা সীমা থাকে। লজ্জার একশেষ! শাশুড়ি বৌ একসঙ্গে আঁতুড়ে চ্যাঁ ম্যাঁ সামলাচ্ছে এক কাঁথায়! আবার শখ কত? চ্যাঁর নাম রাখবে গোবিন্দা নয় শারুখ। নাতির নাম রাখার অধিকার কি থাকবে ঠাকুমা দাদুর? তাই যেমন ইচ্ছে নাম রাখছে দুজনে। দাদুর পছন্দ গোবিন্দা। ভেলপুলি খা রহা থা, লেড়কি ঘুমা রহা থা। ঠাক্‌মার হিরো শারুখ, দাদুভাই দাদুভাই দেখতে, ছোট খাটো। আর ম্যাঁর নাম? সেও ঠিক হয়ে আছে, গৌতমী। সিনেমার নাম। মানুষটির ভাবনা নিয়ে খেলতে বড় কষ্ট হয় ফুলমালার। বলি বলি করেও বলা হয় না। ওরে মানুষ, এই বয়সে এসব হওয়ার নয়। এখন তো শেষের সময়। উল্টোপাল্টা হয়ই! ডাক্তার তোমাকে কাঁচকলা খাওয়াবে।

ফুলমালা জানে না, হারিয়ে যাওয়া ছেলের দুঃখ মানুষটিকে কতটা পোড়ায়। তবে যেটা রয়েছে, মায়ের নামে দোকান চালাচ্ছে রমরমিয়ে, সেই নিমুর বদলে যাওয়ায় কেমন একগুঁয়ে হয়ে আছে তার বাপ। ছোট ছেলেকে ভালবাসতে গিয়ে আদরের বড়টিকে অবজ্ঞা করে হারাল। নিতুকে হারানোর দুঃখ আছে তার, ফুলমালার সামনে লজ্জায় বলে না। একদিন মাত্র কেঁদেছিল হাউহাউ করে যেদিন নিমু বৌকে নিয়ে সিনেমা দেখতে গেল খোলাদিনে। বাপকে দোকানের চাবিও দিয়ে গেল না।

ফুলমালা স্টোর্স কেনা হয়েছিল দু'ভাই এর কথা ভেবেই। দুই ছেলের মা বলেছিল, দু'ভাই এর নামে করে দাও দোকান। মানুষটার কাছে বৌ এর বেশি কেউ নেই কিছু নেই। সন্তানও না। হলমালিক বুলু বণিকের ভাই দুলুদার প্রমোটারি বিজনেস। ফ্ল্যাটবাড়ির নিচে দোকানঘর দিয়ে দিল পাঁচ হাজারে। ইছাপুরে দিদির কাছ থেকে এক হাজার আনিয়ে দিল ফুলমালা। এদিক ওদিক ধার হ'ল। মুদিখানা একদিনে দাঁড়ালো না। ছেলে দুটো বড় হওয়ার পর বাপ ছেলে তিন ভাই মিলে পরিশ্রম করে দাঁড় করালো। ধারের কড়ি শোধ করতে প্রাণের পাঁইট সাপ্লাই এর ব্যবসায় প্রফিট বেড়ে গেল।

চিত্রবাণীর গেটম্যান গোপালদার মাল সাপ্লাই এর ব্যবসা সবাই জানে। দুই ছেলে বৌ এর সংসারে খরচ অনেক। বৌএর জন্যে ভিলেন মানুষের খরচের বহর ছিল বড় মাপের। ভালই ছিল, সুখ ছিল। কী যে হঠাৎ হ'ল মানুষটার। আরো টাকার নেশায় পেয়ে গেল। দোকান হবে, বাড়ি হবে দোতলা। গাড়ি কেনার সখও পুষে রাখে সিনেমা হলের গেটম্যান।

টাকার নেশায় পনের বৎসরের ছেলেকে হকারিতে ঢুকিয়ে দিল। সকালে দুঘন্টা মাত্র ডিউটি ভাল ইনকাম। প্রমোটার দুলু বণিকের কাগজের এজেন্সি। লোকেল লিডারের ইলেকশন এজেন্ট তার হকার বাহিনী। হকারদের ক্লাস নেয় দুলুদা। হাসতে শেখায়, পেপার দেরিতে এলে গালাগালি হজম করতে শেখায়। নিতু পাঁচ তলায় দড়ি বেঁধে কাগজ ছুঁড়তে পারে না, দেরি হয়ে যায়। গালি খায়, হজম করে। মার উপর রাগ ঝাড়ে। ফুলমালা প্রমাদ গোনে। কাজ ভাল লাগে না ছেলের, মায়ের কোলে মাথা গুঁজে থাকে। ছেলের বাপকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। এমন ছেলেকে নিয়ে কী করে বাপ! পড়াশোনায় মাথা নেই, মুদির কারবারেও মনোযোগ কম। আড়াইশ বললে আড়াই

কেজি দেয়। ক্যাশ বাক্স থেকে টাকা সরিয়ে মার জন্য লক্ষ্মী ঠাকুরের পট কেনে, ভাইকে কিনে দেয় রচনা রাজকন্যা। ভাইকে বিদ্যাসাগর করার লক্ষ্যে রুক্মিণী স্যারের মাসকাবারিতে সব কিছুই ওজনে বেশি যায়। স্যারের সুপারিশেই শ্রীমা ইলেকট্রিকেল-এ দুমাস যোগাল্দি খাটল। সাধনদার সন্তরাজ মিস্ত্রির ঠকঠক চালিয়ে এক হপ্তায় বাড়ির পুরো লাইন কনসিলড করে টাইফয়েডে পড়ল দুমাস। ফুলমালা ছেলের বিছানায় বসে অঝোরে কাঁদল। মাকে কাঁদিয়ে প্রলাপ বকল নিতু, অলৌকিক প্রিয়জনের সঙ্গে কথা বলল, —দাঁড়াও আসছি। কখনও একা একা সিদ্ধান্ত —চলেই যাব, মাকেও নিয়ে যাব। ভাই যাবি? প্রলাপে বাপের কথা একবারও বলেনি। মাকে, ভাইকে চোখের আড়াল করতে চায়নি অসুখের দিনগুলিতে। সুস্থ হয়ে মার কোলে মাথা রেখে আবার কাঁদল নিতু। কাগজ ফিরি করার কাজ আমি করব না। লোক ঠকানোর কাজ করবে না নিতু। দুলু বণিক কাগজ ফিরিয়ে আনতে বলে। বিক্রি হয়নি বলে ফেরৎ দেবে। মা ফুলমালা প্রাণকে জানালো ছেলের ভীতি, জানালো আতঙ্কিত হওয়ার মতো প্রলাপের কথা।

বাপ্ছেলের মিল না হওয়াই আতান্তর ফুলমালার। নিতুকে বুঝিয়ে বলে, —যা বাপের সঙ্গে মাসের সদায় দিয়ে আয় গ্রাহক বাড়ি। গেছে, কিছু একটা অনর্থও বাঁধিয়েছে। এবাড়ির স্লিপ ওবাড়ি লাগিয়েছে, মাল উল্টোপাল্টা করেছে। নিতুর বাপ বলে, ধড়িবাজ ছেলে ইচ্ছে করেই করে। ফুলমালা বিশ্বাস করে না। বলে, —হকারিটা ছাড়িয়ে দাও, দোকানে মন বসবে। দুলুদাকে বলে হকারি ছাড়িয়ে বাজার কমিটিতে লাগিয়ে দিল। সকালের বাজার, হকারির মতো দৌড়নর কাজ নয়। পাঁচতলা দু'তলা দৌড়নো নয়। কমিটির স্লিপ স্যাঁট স্যাঁট ছিঁড়ে লাগিয়ে দাও পেঁপের আঠায়, জল-ছিটানো বেগুনের গায় আর বোয়ালের মাথায়, কাটা পোনার গাদায়। পয়সা নিয়ে খেঁচাখেঁচি একটু হয়।

বাপ ছেলের যতই অমিল হোক, নিতুকে যত দূরছাই করুক বাপ, নিতু ছিল তার বিবেক, বুদ্ধি। ছোটখাটো বড় ছেলেটাকে ভয় করত বাপ। নিতুই ছাড়িয়ে দিল পাপের ব্যবসা। বড় সৎ পথে চলতো তাদের প্রথম সন্তান। বাপের পাপ কেন যে সন্তানকে বইতে হয়। বড় হওয়ার পর নিতুকে বন্ধুরা বুড়ো বলে ডাকতে শুরু করল। প্রথম কিছুদিন রাগে ফুঁসেছিল নিতু। তারপর তো নিতু হারিয়ে বুড়োই হয়ে গেল। ফুলমালা কখনও ডাকেনি। বন্ধুদের সঙ্গে নৈতিকতার লড়াই করত সতের বছরের ছেলে। সঙ্গের সাথিরা সব পাকা ঝুনো। নিতুর মুখ থেকে মিথ্যা না বলার পরামর্শ শুনলে, সিগারেট গাঁজার নেশা না করার উপদেশ শুনলে রাগত। ডাকত ওল্ড মঙ্ক। বুড়ো সন্ন্যাসী। বাপের পাঁইট সাপ্লাইএর অনৈতিকতাকে কটাক্ষ করে। বুড়ো নামের উৎস কথা মাকে বলেছিল নিতু। দু একটা ছাড়া নিতুর বন্ধুর সংখ্যাও কমে গেল একে একে। নিমুর স্বভাব চরিত্র দাদার উল্টো। একটা স্বভাব নরম হাসি খুশি ছড়িয়ে থাকে মুখমন্ডলে। কাউকে দুঃখিত করার কথা বলে না নিমু। নৈতিকতার লেকচারও দেয় না। ফুলমালার দুই ছেলের দোকান নিমুর পরিশ্রম একাগ্রতা ও ব্যবহারের গুণে দাঁড়িয়ে গেল। ছোটখাটো জিনিস সে আন্ডার রেটে যেমন বিক্রি করে, দামী জিনিসে অ্যাকস্ট্রা লাগায়। নামী চা কোম্পানিকে দিয়ে দোকান রং করিয়ে নেয়, শাম্পু সাবানে ভরে দেয় শোকেস। সাইন বোর্ডে মার নাম উঠিয়ে নিমাই স্টোর্স করায় খুব মর্মাহত হয়েছে প্রিয় ছেলের বাপ। দুঃখিত বাপকে সান্ত্বনা দিতে গলার স্বর রুদ্ধ হতে দেয়নি ফুলমালা। বলেছে, —এখন তো ওরই সব।

ফুলমালা একা বাড়িতে সময় মেলায়, সময় নিয়ে খেলে। নিমুর মতো ইংলিশ না জানলেও পাকচক্কুবে স্বভাব ছিল না নিতুর। নিতাইও বাপের মতো নামের রহস্যে জড়িয়ে গেল জন্মের পর। প্রথম সন্তান নিয়ে ফুলমালা আর প্রাণের লড়াই ছিল প্রতিরাতের। প্রতিদিন স্ফীত থেকে স্ফীতকায় স্ত্রীর গর্ভে কান পেতে শুনত সন্তানের ডাক, –বাবা! ভিলেন মানুষটাও কেমন বাপ হয়ে জবাব দিত, –বাবারে! ফুলমালা সোহাগে প্রাণের চুল টেনে মাথা সরিয়ে ডাকত, –মামণি! বাবারে আর মামণির ছদ্ম লড়াই হত প্রতিরাতে। গভীর রাতে ভিলেনদের নামে ছেলের নাম রাখত। বলত, –শালা, ভিলেনই হোক ছোকরা! অজিতের মতো ভিলেন পাবে দুটো? মোনা ডার্লিং, বলে আদর করত বৌকে। ফুলমালা নাম রাখত, সুচিত্রা নার্গিস মধুবালা। নিতুর জন্মের পর গর্বিত বাপ তাকে মোক্ষম খোঁচা দিয়ে ডাকল এন আর এস এর ফিমেল ওয়ার্ডে –কি গো নিতু সিংকি মাম্মি? ভর্তি হওয়ার আগে নিতু সিং ঋষি কাপুরের রফু চক্কর দেখে এসেছিল দুজনে। খোঁচাখুঁচি করলে কি হবে, গুরুঠাকুর ঠিকই শুনেছিলেন ফুলমালার মনের কথা। গুরুদেব নাম রাখলেন নিত্যানন্দ। মায়ের আদরে হয়ে গেল নিতু। ছেলের জন্মের আগে পরে দুটো মানুষ হয়ে গেল ফুলমালার প্রাণ। যে সন্তানের জন্য এত আকুলতা, প্রতিরাতের ছদ্মলড়াই, সব ভুলে কেমন একা হয়ে গেল। ফুলমালা জানে মানুষটির দুঃখের ঠিকানা, তাই ছেলে মানুষ করেও আলাদা সময় রাখে ছেলের বাপের। মানুষটি ভাবত ছেলে তার প্রতিদ্বন্দ্বী। নইলে, প্রথম সন্তানকে নিয়ে মানুষের যে ব্যাকুলতা, আহ্লাদ তা থেকে কেন বঞ্চিত করল নিতুকে? এক হারাই হারাই ভীতি সারাজীবনের। এক বউ হারিয়ে দোজবরে মানুষটি বউ হারানোর ভয়ে ফুলমালাকে সুখের সায়রে ভাসিয়ে রেখেছে। মানুষের মনটা বড় জটিল দুঃখে ভরা। জট ছাড়াতে ফুলমালার সুখই তো হয়। পেটে নিতুকে আদর করতে করতে উদাস হয়ে দেখত! গুরুদেবকে ডাকত,–রক্ষা কর, রক্ষা কর গুরুদেব! কাকে রক্ষা, ফুলমালা না পেটের সন্তান? ফুলমালার বয়স তখন কত, বড়জোর কুড়ি? জেনেছিল তার পতির এ ব্যগ্র অসহায়তা তাকে ঘিরেই। আশ্বাস দিত, –তুমি ভয় পেও না, আমার কিছু হবে না। সন্তান পেটে নিয়েই না দিদি মরল আর জ্বি করে। ফুলমালার সতিন দিদি। নিতুর জন্মের পরই মানুষটি প্রতিজ্ঞা করল, আর নয়।

ভিলেনের প্রতিজ্ঞা আর জলের দাগ! আর নয় করেও নিমুর জন্ম হল। ফুলমালা আর প্রাণগোপাল ছাড়া কেউ জানে না, ওরা নিজেরাই ভুলে গিয়েছিল নিষেধের দিন। ভুল করেছিল। দ্বিতীয় সন্তান চায়নি প্রাণ বৌ হারানোর ভয়ে। ফুলমালা একদিনে দু'ঘটি তেঁতুল গোলা খেয়েছে, বমি করেছে হড়হড়িয়ে; সোদপুরের পাহাড়িবাবার অব্যর্থ মাদুলির আশ্চর্য ফল দুমাসে দুরন্ত হয়ে উঠল। দুপায়ের লাথি এদিক ওদিক ঝাড়তে ঝাড়তে জঠর ফুঁড়ে বেরল টিয়ে এন আর এস এর ফিমেল ওয়ার্ডে। বাইশ বছরের নিমাই আজ বৌকে নিয়ে বেরিয়ে গেল চুপচাপ। ঘরের লেচলক লাগাল খটাং করে। ঘরের ভিতর ঘর করেছে নিমু। আলাদা তালা তাদের ঘরে। দোকানের চাবিও আজকাল নিজের কাছে রাখছে। বৃহস্পতিবার দোকান বন্ধ, আজ তো খোলা দিন। বাপকে চাবি দিয়ে গেলে সময় করে দোকান খুলতে পারত। দুটাকা বেশি বিক্রি হত। সিনেমা হল তো বন্ধ হয় না। প্রাণেরও কোন ছুটি নেই, তবু সময় বের করে। কষ্ট করেই গেল সারাটি জীবন। ওভারটাইম করেছে সংসার চালাতে। মুদির দোকান করতে, দুকাঠার ঘর তুলতে। বিলাতি বোতল সাপ্লাই দিতে।

এখনও পুরোটাই ভার। দুভাই যখন ছিল তখনও ফুলমালার মাতৃস্নেহের ভার থাকত নিতুতে ঘিরেই। যদিও নিমুর অভিযোগ অমূলক করে মাছের মুড়োটি পেত নিমু। মাংস হলে মেটের ভাগ নিমুর। দুটোই নিতুর পছন্দ নয়। নিতুর ভাগে থাকত সব হেলাফেলার খাবার, পুঁইডাটার চচ্চড়ি, তেতো পলতের বড়া, ফেলা সব্জির নুড়নুড়ি আর দিনে দুবার মায়ের কোল। এই তার মায়ের স্বার্থপরতা। বাজার কমিটির চাকরি নিয়ে মাছ মাংস দুটোই ছেড়ে দিল। তাও দুর্বল ছেলেকে আদর করত লুকিয়ে। নিতুকে আদর করলে মানুষটি ভাবত নিমুর ভাগে কম পড়ল। বলত, ইতনা স্বোয়ার্থি না বনো বেগম। কারেন্ট ফিলিমের ডায়লগ মারত। মা ছাড়া ছেলেটার ছিলই বা কে? বাপ প্রথম সন্তানকে অবহেলা করল। নিমু বাপের হিরো। নিমুকে নিয়ে যায় ওয়াশিং পাউডার ডিসপ্লের লটারিতে। আন্দোলন করে আদায় করা লিভারিজের কাপড় দিয়ে নিমুকে ব্লেজার বানিয়ে দেয়। নিতুকে কিনে দেয় হাফ পাঞ্জাবি পনের টাকায়। নিতু ভাইকে পরতে দেয়। মাকে যেমন, ভাইএর জন্যও দাদার প্রাণ কাঁদত। বাপের দেখাদেখি ভাইও অবজ্ঞা করত। বলত-হাবা। নিতু বই কিনে দিয়ে, রুক্মিণী স্যারকে খোসামোদ করেও ভাইকে মাধ্যমিকে বসাতে পারল না। দাদাকে ফি বছর মুখ গোমড়া করে ফিরতে দেখেই সিদ্ধান্ত নিমুর। তিন বছর মাধ্যমিকে বসেছিল নিতু।

কী করে যে কী হয়ে গেল। প্রথম সন্তান হারানোর দুঃখ ফুলমালার যাওয়ার নয়। একা থাকায় সময় যে তারই একার। প্রাণ সদাই ভিড়ের মানুষ। হলের ভিতরে বাইরে বিভিন্ন বয়সী বন্ধুরা, বাদাম পেপসি চপ চাওলা থেকে ব্ল্যাকার বা ফুচকাওলা রামাধারী আর বাড়ি ফিরে ফুলমালা। বৌএর দুঃখে মানুষটার প্রাণ কাঁদে। ছেলের বিয়ের দিন বলল, --নাও এনে দিলাম ছেলের বৌ, আর একা থাকতে হবে না। রূপোর মোহর দিয়ে পুত্রবধূর মুখ দেখে কেঁদেই ফেলল। হাউহাউ করে বলেছিল, --আমাদের বুড়ো বুড়িকে দেখে রাখিস মা, আমাদের আর কেউ নেই দুনিয়ায়। ফুলমালা পরে বলেছিল, --কাঁদলে কেন অমন? বোকা মানুষ বলেছিল, --বা, আমার নিমুর বৌ না? ফুলমালার মনটা আবার ভেঙেছিল। ভেঙে দু টুকরো। সন্তান তাদের দুজনের হল না। নিমু তার বাপের। ছেলের বৌ নিয়েও সুখ হল না শাশুড়ির। তারই হয়তো দোষ ছিল। চেষ্টার তো ত্রুটি ছিল না। বাচ্চা মেয়ের কষ্ট হবে বলে কোন কাজ করতে দেয়নি। চুল বেঁধে দিয়েছে, চা করে খাইয়েছে। রান্নাঘরে ঢুকতে দেয়নি আদরের পুত্রবধূকে। বাইশ বছরের ছেলের কত বড় বৌ হবে! সতের বছরের কচি মেয়েকে এনেছিল মনের মতো সাজাবে বলে। অন্য জন্মের পাপ ছিল নইলে এমন হবে কেন! প্রাণের সংসারে তালাচাবির বালাই ছিল না। কুন্তি বৌ হয়ে আসার পর ঘরের ভিতর ঘর হল। নিমুর মনটা কী খারাপ ছিল? নিতুর রাগ জেদ আহ্লাদিপনা পছন্দ করত না। নিমুর হাসিমুখে দেবশিশুর সারল্য। নিমু সিদ্ধান্তে পাকা, রাগে না কারো উপর। দুভাই এর মধ্যে স্বার্থপরতাও দেখেনি ফুলমালা। মা বাবাকে অবজ্ঞা করার কথা ভাবতেও পারত না। আজকাল সব পাল্টে যাচ্ছে। কী জানি সাতকাহন গায় বৌ তার ছেলের কাছে। মাছ সব্জির হিসাব চায় আবাগির বেটি! ফুলমালা একে একে সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছে। প্রাণ কিছুই জানে না, জানলে যে দক্ষযজ্ঞ! ছেলে ছেলের বৌকে ঘাড় ধরে বের করে দেবে। যা রাগী মানুষ।

রাগী মানুষ রাগ করেছিল ফুলমালার ওপর। সেও নিতুর জন্য। ছেলে মার কাছে দুঃখ

করে বলেছিল, মাছের দোকানি গোবিন্দদা তোলা দেয় না। টিনের পুকুর বানিয়ে মাছ বিক্রি করে। জায়গা থাকলেও নতুন মাছওলা বসতে দেয় না। দুলুদার বাড়িতে মাছ পাঠায় নিতুকে দিয়ে। ওসব কাজ ছেলের ভাল লাগে না। ফুলমালা ছেলের হয়ে সুপারিশ করেছিল প্রাণকে। প্রাণ রেগেছিল। নিতুকে সামনে দেখে রাগের তেজ বেড়েছিল। কাজ করে খেতে না পারলে ছেলেকে ঘাড় ধরে বের করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিল। বাপের ধমক ছেলের সহ্য হল না। প্রাণ রাজি হয়েছিল, মাথা ঠান্ডা হলে ফুলমালাকে বলেছিল ছাড়িয়ে নিয়ে আসবে। ছেলের বিয়ে দেওয়ার কথাও ভেবেছিল দুজনে। ইছাপুরে মেয়ে দেখতে যাওয়া পর্যন্ত ঠিকঠাক। সময় দিল না অভিমানী ছেলে। কুড়ি বছরের ছেলেকে দশ বছরের ভাবল বাপ!

নিতু নিমু যে বড় হয়েছে ভাবেনি কখনও সুখি মাতাপিতা। ভাবলেই মন ভারি। মার কোল ঘেঁসে থাকলেও একটা দূরত্বে চলে গিয়েছিল এগাব পেরনোর পর। চান ঘরে একা ঢুকল। মা বাবার সামনে ন্যাংটো হওয়া বন্ধ হয়ে গেল। হাফ প্যান্ট, ইজের ছেড়ে লুঙ্গি, পাজামা। খাওয়া ছাড়া যা নির্ভরতা অনেকটা কমল তার কমজোরি ছেলের। ফুলমালা নিতুর প্রতিটি পরিবর্তন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে। নিমুও বড় ভাই এর অনুগামী। ছেলে বড় হওয়ায় ফুলমালার কাজ কমে গেল অনেক। বিশ্রামই বিশ্রাম। কেউ নেই কিছু নেই করার। স্ত্রীব বিমর্ষতা কাটাতে প্রাণ অনেক রকম প্রস্তাব দেয়। বলে, সিনেমা দেখে আসি চল। —না গো ভাল লাগে না। সিনেমা তো দেখিই। সিনেমা দেখে কি দুঃখ মেটে? প্রাণ অবাক হয়ে বলে, —মানুষের কী সন্তান বড় হবে না, সব বাচ্চাই দুধেরটি থাকবে? তোর সারাজীবনের দুধের বাচ্চা একটিই রে ফুলি। গোপাল পোদ্দার ছাড়া তোকে কেউ বুঝবে না। মন খারাপের মধ্যেই ফুলমালা প্রাণকে প্রস্তাব দিয়েছিল একটি দুধের বাচ্চার। ফুলমালার প্রস্তাব ছিল তার নিজের। সাদাসিধে মানুষটি ভাবল ভিন্ন। নিতুর নিমুর বিয়ে, নাতি নাতনির স্বপ্নে বিভোর হয়ে গেল। ফুলমালাব বয়স তখন কত, বড়জোর চল্লিশ। তখনও শরীরে মনে সক্ষম ছিল প্রাণের বৌ। কোল হারানোর সর্বনাশ ঘটে যাওয়ার পর ফুলমালার মন বলে কিছুই আর রইল না।

ইছাপুরে যে মেয়ে দেখার কথা ছিল নিতুর জন্য, পাকা কথা হল না। ছোট ছেলের পাত্রী তো কবেই ঠিক। প্রিয় পুত্রের বাপের উৎসাহ ছিল তাই ফুলমালা দুঃখিত হয়েছিল যখন নিমুর জন্য পাকা দেখা দেখে এল প্রাণ। বড় ভাই এর কী খুশি, ছোট ভাইকে কোলে করে ঘুরে নিল তিন পাক। প্রাণের উপর জীবনে কোন অভিযোগ করেনি ফুলমালা, নিমুর বিয়ে নিয়ে তাড়াহুড়োয় দুঃখ পেয়েছে। প্রাণগোপাল শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছিল। দুটো বিয়েই একসঙ্গে করতে চেয়েছিল! নিমাই নিতাই দুজনেরই দোকান, আয় তো নিমুর একার নয়। তবু বাপের সংশয় হাবা ছেলে বৌকে খাওয়াবে কী? হাবা ছেলে হাবা ছেলে শুনলে দুঃখ হয় মার প্রাণে। প্রাণকে মুখ ফুটে বলেনি। বলেই কী হবে, ছেলে হারিয়ে যাওয়ার দুঃখ এক বৎসরেই ভুলে গেল। ঘটা করে ছোট ছেলের বিয়ে দিল।

বৈরাগীমঠ জুড়ে হৈ চৈ হল নিতুর হারিয়ে যাওয়া নিয়ে। কোথায় যে উবে গেল ছেলেটা! উবেই গেল। একজন মাত্র প্রত্যক্ষদর্শী নিতুর হারিয়ে যাওয়ার। সে ভজা পাগলা। নিতুর বন্ধু! ভজা হকারি করত নিতুর সঙ্গে। সাঁই সাঁই ছুঁড়ে মারত কাগজ চারতলা ছ'তলায়। নিতুর সঙ্গে সেও ঢুকে গেল বাজার কমিটিতে, আড়বোয়ালের মাথায়, রুই এর পেটিতে স্লিপ

লাগাতে। দুই বন্ধু বিকেলে কাটাপুকুর পাড়ে বেড়াতে যেত। সেদিন খুব দুঃখের কথা বলল নিতু। গোপালকাকুর দুঃখ। বাপকে সাহায্য করতে পারে না বলে কষ্ট। এসব বলতে বলতে চিচিং ফাঁক কাটাপুকুরের জল ভ্যানিস। কত রকমের মাছ দেখালো নিতু। লাল নীল হলদে আকাশি বেগনি সবজে। মাছের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হাওয়া জলের উপর হেঁটে গিয়ে হারিয়ে গেল নিতু। পাগলা বলে ভজার কথা কেউ বিশ্বাস করল না। ফুলমালা ভজাকে ডেকে আনে দুপুরবেলা। ভজাকে খাওয়ায় পুঁই ডাটার চচ্চড়ি, তেতো পলতার বড়া, ফেলা সব্জির নুড়নুড়ি দিয়ে ভাত। ভাত খেতে খেতে ভজা নিতুর কথা বলে, জলের উপর দিয়ে হেঁটে গেল বুড়ো, আর মাসীমা ভ্যানিস! যাওয়ার আগে নিতু ফুলমালাকে বলেছিল, —মা, আমি চলে যাব তোমাদের ছেড়ে। নিতু এ জগতের মানুষ ছিল না। কারো উপর রাগ দুঃখ ছিল না, তবু চলে গেল। কোথায় গেল কেউ বলতে পারে না। মায়ের মন কুডাক ডাকলেও মানতে পারেনি ফুলমালা। ভজা বলেছে, হাসতে হাসতে গেছে নিতু। বেঁচে থাকলে কত দুঃখে আছে কে জানে? মার কোলে মাথা না গুঁজে কী করে কাটাচ্ছে দিন!

প্রাণ তাকে সান্ত্বনা দেয়, আবার থানায় গিয়ে খোঁজও নেয়। মানুষটা চাপা, দেখে কিছু মনে হওয়ার জো নেই। ছেলে হারানোর দুঃখ ওকে কাবু করেনি, এমন পাষাণ! বলে সবাই, বৈরাগী মঠের মানুষ। নিতু পরদিন ডিউটি করেছে টর্চ হাতে। রাতে ফিরেছে মদ খেয়ে। ফুলমালার হারিয়ে যাওয়ার উপর চোটপাট করেছে। দোষ দিয়েছে, তোমার জন্যেই, তোমার আদরে এমন হ'ল। কাঁদলও আবার। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল,—আমার হাবা ছেলে! মদের বোতল সাপ্লাই করে যে মানুষ, খেয়েছে খুব কম। এরপর থানা থেকে ফিরেছে প্রতিরাতে আকণ্ঠ খেয়ে। চুরচুর নেশায়ও আদর করে বৌকে। নিতুর নাম নিয়ে কাঁদে।

ফুলমালার হৃদয়ের শূন্যতা প্রাণ কিছুতেই ভরাট করতে পারে না। বুকে ব্যথা হয়, মাথা ঘোরে। স্বামীকে বলে না। বললে দুঃখ দিয়ে গড়া মানুষটার সুখ যে নষ্ট হয়ে যায়! যার যাতে সুখ। দুঃখ ভুলতে প্রাণ যদি ক'টা দিন অসম্ভবের ভাবনায় বিভোর থাকে ক্ষতি কী? দু দুটো দুঃখ, একটা মানুষের জীবন সইতে ভিলেনের প্রাণ চাই। এক ছেলে বাপ ভাই এর দূরছাই সয়ে হারিয়ে গেল, আর এক ছেলে থেকেও ভ্যানিস। নিমুর উপর ভরসা ছিল মানুষটার। তাই শেলেটের লেখা মুছে দিয়ে নতুন করে সন্তানের জন্ম সম্ভাবনায় বিভোর হয়ে আছে। ফুলমালা তার শরীর মনের বাড়তি কষ্টের কথা জানালে ভয় পেয়ে যাবে ভীতু মানুষ। বলবে, —আমার কিছু চাইনে। ছেলে চাইনে মেয়ে চাইনে কিছু চাইনে। শুধু তোকে চাই ফুলি! ফুলি ফুলি ফুলি দাদ হাজা ছুলি শুনতে শুনতে রাগ হয় মানুষটার উপর!

খুশিতে দৌড়তে দৌড়তে আসবে মানুষ ম্যাটিনি উঠিয়ে, তিনটেয়। ডাক্তার দেখাবে বুড়ি বৌকে। বুড়ি বৌ এর বাচ্চা না হাতি! সব শেষের বাঁশি বেজে গেছে। তবু খুশি। বুড়ো ভিলেনের আবার হিরো হওয়ার শখ হয়েছে। রোজ এসেই ফিসফিস করে, —হয়েছে? হয়নি শুনেই আনন্দ। বলেছে, —মেয়েই হবে। জীবন কাটিয়ে দেব মেয়ে মানুষ করে। সুখমুখে দুঃখও হয়, যখন বলে, —মরার সময় হয়ে যাবে মেয়ে বিয়ে দিতে। মেয়ে হওয়াই ভাল, জানিস তো, শেষ ঘরে হয় মেয়ে, ঘি পড়ে শিকে বেয়ে। খুঁচিয়েছে ফুলমালা, মেয়ের নাম ঠিক করেছ? মাধুরী কাজল, জুহি না শিবা? —নানা ওসব নয়, ওরা সব ঘর ভাঙানিয়া। ত্রিমূর্তিতে এক নতুন

হিরোইন এসেছে, গৌতমী । নামটাও সুন্দর, দেখতে মিস্টি । বলেই মানুষটা তার পেটে মাথা রাখে । ফুলমালা দিয়েছে জোর চিমটি । চিমটি খেয়ে ডায়লগ ঝেড়েছে পঁচিশ বছর আগের প্রাণ, —যব কোই লেড়কি মুঝে চিমটি কাটতা হ্যায়, ম্যায় কুছ নাহি বোলতা, ডাইরি সে নোট কর লেতা । খুশিতে পুরনো ছবির পোজও দেয় মোক্ষম ।

হাসিখুশি মজা করা মানুষকে নিয়ে কোন প্রবলেম নেই ফুলমালার । দোজবরে মানুষটিকে নিজের মতো চালিয়েছে । সমস্যা দেখা দিলেই দিশেহারা । তখন আর নিজের বুদ্ধি খাটে না। ছেলের যেমন ছিল, ছেলের বাপও ফুলমালার কোলে মাথা রেখে বুদ্ধি চায়। অভিযোগ করে । সব অভিযোগ তার জ্যেষ্ঠ পুত্র ঘিরে । নিতুটা তার মনমতো হল না বলে দুঃখ করে কী লাভ, সে কার দোষে? ছোটবেলা থেকেই, হয় আদর নয় কিল চড় । নাম ধরে ডাকলে কখনও? মাকড়া ডাকলে কখনও ছেলে মানুষ হয়? বাঁদর ডাকলে ছেলের বাড়বাড়ন্ত কমে যায়! বাপই যদি এসব করে! নিতুটার জেদ আছে একটু । সেও তো বাপের আদরে । প্রথম সন্তান জন্মের পর ফিরতো তো রাত বারটায় । ঘুমন্ত ছেলেকে আদর করত কে? কতবার বলেছে ফুলমালা ওরকম করতে নেই, জেদ বেড়ে যাবে । শুনেছে কেউ ? একবার হয়েছিল তার দোষে, আঁচল লেগেছিল। খায়না দায়না ছেলে, শুকিয়ে, কাঠ । দু'সের দুধে চান করিয়ে ছেলেকে সুস্থ করে তুলল । ছেলে যত বড় হচ্ছিল বাপ ছেলের অমিল বাড়ছিল । মিল করানোর অনেক চেষ্টা করেছে ফুলমালা । পাহাড়ি বাবা, বড়কাচারির মানতেও কিছু হল না । বাপ ছেলে দুজনেই ভালবাসে মাছের মুড়ো । এই নিয়ে তর্কাতর্কি । মা হয়ে ছেলের মাছ খাওয়াই ছাড়িয়ে দিল ফুলমালা । পাহাড়ি বাবাকে দিয়ে বলিয়ে নিদান । দেবদ্বিজে ভক্তি ছেলেটার । এরপর মাছ দেখলেই বিকার হয়ে যেত । কাটা মাছ রান্না মাছ সহ্য করতে পারত না । বাজারে গিয়ে বসে থাকত গোবিন্দর টিনের গামলার পাশে । জ্যান্ত মাছের সঙ্গে কথা বলত । বাজারে স্লিপ লাগানোর কাজে যে টিকবে না সে জানত। সেই তো ফুলমালার সর্বনাশের শুরু ।

প্রাণের মানুষ দুঃখিত হলে ফুলমালা দিশেহারা হয়ে যায় । সময়ের টিকটিক শুনতে শুনতে বুকের শব্দ দ্রুত হয় । একা বাড়িতে শৈশবের হামাগুড়ি ফুলমালাকে বিবশ করে । ঢং শব্দে দুপুর । বুকের মাঝখানে দ্রুত হাত বুলোয় । বিছানায় এলায়, চোখ বুঁজে । নিতুর বিছানার ওপরের ছবিটা, আঙুল তুলে চোপ করে । মার্ফিরেডিওর ক্যালেন্ডার । ঠোটের ওপর আঙুল তুলে এখন বৌমার বিছানার ওপর । বৌমা নাতিপুতি দেবে প্রাণগোপাল পোদ্দারকে । নিমুর একটা ফুটফুটে মেয়ে হলে গৌতমীর দুঃখ ভুলে যাবে মানুষ । মানুষটাকে পটিয়ে সত্য জানাতে হবে—ওসব হয় না গো । আমার এখন শুকনো বেলা । আর কিছু হওয়ার নয় । আমরা এত স্বার্থপরই বা কেন হব? নিমু কুন্তিতো আমাদেরই পুত্র পুত্রবধূ । বৌমাকে খুব আদর করব আমরা । মুখঝামটা যতই দিক, হাসব । নিমুর সংসার, ধীরে ধীরে তুলে দেব বৌমার হাতে । বৌমা হয়তো লজ্জাই পাচ্ছে, তারই উচিত এগিয়ে যাওয়া । ডাক্তার ফাক্তার গিয়ে লাভ নেই । মানুষটাকে পটাতে না হয় আর একটা চিমটিই কাটবে । বলবে, চল যাই বেড়িয়ে আসি কোথাও। —বল, কোথায়? —চল যাই ভিক্টোরিয়া । —ও ছুঁড়ি ! আবার বলবে ফুলমালা, —চল না যাই কোথাও, কোথায় যাই বলতো? এরকম করবে, মিথ্যে রাগ দেখাবে । মানুষ বলবে, —খুব অস্, না? ঠোনা মারবে গালে, শ্যামবাজার হাতিবাগান যাওয়ার কথা মনে এলেও মুখে বলবে

না। কিছু নরম ছিট কাপড় দেখে কিনবে, উল কিনবে কয়েক গুলি। বদলির দিদিভাই গৌতমীকে আদরে আদরে ভাসিয়ে দিতে হবে। ঘটা করে সাধ দেবে বৌমাকে, সোনার গয়না কিনে দিতে বলবে প্রাণকে। সেসব পরের কথা, আপাতত প্রাণকে নিয়ে যাবে পুরনো সুখের সায়রে। বলবে, —চল যাই হনিমুনে। হনিমুন তাদের সংকেত স্থান। শুধু উস্কে দিলেই হল বুড়ো ভিলেনকে, কতদিন তোমার রামাধারী বন্ধুর ফুচকা খাওয়াও না। দু আনায় চারটে, দুটো ফ্রি। ফুলমালা যাবে সুখসায়রে দুঃখ খুঁজতে। যাবে মাছ দেখতে। লাল নীল হলুদ বেগুনি আকাশী সবজে মাছ। নিতু বলত কথা বলা মাছের গল্প, পাগলা ভজাও বলে নিতু মাছেদের সঙ্গে বুড়বুড়িয়ে কথা বলত।

ফুলমালা জলের দেশের মেয়ে। সাঁতার না জানলেও পূর্ববাংলার মেয়ে জলকে ভয় পায় না। বিশালাক্ষ্যার পাড়ে বাড়ি, জলও ওখানে অনেক রকমের। শরতের জল পানি, বয়ে যাওয়ার শান্ত নিস্তরঙ্গ। জল হল বর্ষার, ঘোলা কাদাগোলা জলের নাম জীবন। জীবনের জটিলতা যেমন, জীবনের সুন্দরও। বয়ে যাওয়া নদীর জলে তখন ঘুর্ণি বয়ে পাতালতা কাঠ বাঁশ কুচো মাছ আর ছন্দহীন নৌকো। শীতের জল টলটলে সাদা কালো কখনওবা নীলে নীল। ভাটিয়ালির সুরে উদাস। ফুলমালার প্রাণ যখন উদাস করা দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকায়, দেখে চোখের ঠিক মাঝখানে ওরকম নীল। তাদের সংকেতস্থান কাটাপুকুর তো আর বিশালাক্ষ্যার মতো ভগবানের দান নয়। পুকুর কেটে মানুষ ভিত গড়েছে, বৈরাগীমঠের দেড়শ'খানা ভিটে। পুকুরের জলে একটা পাগলপারা ভাব আছে। নিতুর চোখের টলটলে সুন্দর তার মায়ের গাছকোমর বয়সের নদীকেও হার মানায়। মার চোখে তাকিয়ে কেঁদে ফেললে যেমন সব ঝাপসা হয়ে যায়, আবার স্বচ্ছ। কাটাপুকুরের জল নিয়ে ফুলমালার তেমন খেলা। ভজা বলেছিল,—জলের ভিতর পথ করে চলে গেল বুড়ো।

পথ কোথায়? এ যে মাছের রাজ্য! মাছ শুধু মাছ, বিভিন্ন রঙের মাছ ঝিলিক দিচ্ছে, ছটা ছড়াচ্ছে বিভিন্ন রঙে। লাল নীল সবজে হলদে আকাশী বেগনি। গাছ আছে কত রকমের। আমলকীর পাতা নিয়ে বুড়বুড়ি খেলছে কচি কচি মাছেরা। শিরিষ পাকুড় করঞ্জা কদম। জলের কালো রঙ থেকে বর্ণালি ছোটে। মনপবনের নাও থেকে দূরাগত ডাক ফুলমালাকে বিবশ করে। সুন্দর শিশু মাছটি ঘাই দিতেই ফুলমালা শুনতে পায় টুকি—মা মাছের বাচ্চা বারবার বুড়বুড়িয়ে উঠছিল ডুবছিল। দূর থেকে খেলা। ফুলমালার সঙ্গে। খেলায় ডাকছে। পুকুরের চারপাশে তাকায় আনন্দময়ী মা। উপরে সারিবদ্ধ মেঘের দল রামধনু বেয়ে নামছে কাটাপুকুরের জলে। মাছেদের নিমন্ত্রণে ফুলমালাও নামে। সময়ের ঘন্টা বাজে দূরে ঢং ঢং ঢং। দ্বিপ্রহর গড়ায়। বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে টুপ টুপ টুপ। ফুলমালার শরীরজলের ফোঁটা ডাকে টুপ টাপ টাপ। টুপটাপ সইতে সইতে কাটাপুকুরের জলে পথও খুঁজে পায় মা ফুলমালা, ভজা যেমন বলেছিল। রঙিন মাছটির কোমল স্পর্শে বুকের ব্যথা নিরাময় হয়। বুক চেপে রাখে ফুলমালা। পিটাপিটিয়ে তাকায় মীন সন্তান তার চোখে। বৃষ্টির জলের তুমুল আর রঙিন মাছের দল ফুলমালাকে ঘিরে জল সইতে সইতে গায় গান,

কাৎলা মেঘের হড়ুম দুড়ুম, সিদঁরী মেঘের পানি গো।

সেই পানিতে ভেজে মোর জননী মার ডুলি গো।

খুশির আবেশে ফুলমালা খোঁজে তার প্রাণের মানুষকে। বৃষ্টির জলে চোখের জলে আনন্দ শুধু। বুক ভাঙা জলের উপর আঁজলা ভরে ধরে রাখা মাছ শিশু ফরফরায় সুখে। সুখপুকুরে ফুলমালার শরীরময় শিহরণ। ফুটফুটে রঙিন মাছ তার বুকে আঁশ পাখনা জড়িয়ে বুড়বুড়িয়ে ডাকে, —মা! ফুলমালার নিঃশ্বাসে অফুরন্ত বাতাস। জলের ভিতর জীবন নড়ে, কথা বলে। পাড়ে দাঁড়ানো প্রাণের মানুষকে ডাকে ফুলমালা, —এসো গো! দেখে যাও মাছের সংসার। একটা অনেক রঙের মাছ আমাকে ছাড়ছে না কিছুতেই। জল ছেড়ে বেরিয়ে আসতে দিচ্ছে না। ডাকছে,—মা। উপরে বেঞ্চিতে বসা প্রাণের আকুলি বিকুলি দেখে ফুলমালা। নিতুর জন্মের আগে যেমন ফুলমালার স্ফীত উদরে মাথা রেখে ডাকত। ডাকে, বাবারে! ফুলমালা ডাকে—এসো নিতুর বাবা, জলের জীবন, মাছের জীবনের সুখ সয়ে যাও। এখানে তোমার নিতুর কোন দুঃখ নেই। তোমারও থাকবে না, ছেলের বৌএর গঞ্জনা থাকবে না, ছেলে দোকানের নাম পাল্টে কষ্টে ফেলবে না। মদের বোতল বিক্রি করার দুঃখ সইতে হবে না। মনের কষ্টে নেশা করতে হবে না। তোমার দোজবরে বৌটার অসুখও দেখতে হবে না, কী নিয়ে থাকে বল তো সারাদিন! একটামাত্র স্নেহের পুত্তলি, সেও মাছেদের সংসারে কেমন সুখে মাকে ভুলে আছে দেখ!

অমৃতলোক, ১৯৯৬

লবণহ্রদের সীমানা

ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত শেষে পি সি সরকারের জাদুতে প্রলয় পাঞ্চালীর গেরস্থালির লোপাট হতে সময় লাগল পাঁচ বৎসর। খাল পেরিয়েই এম বাইপাস দিয়ে ছুটে গেল লরিভর্তি সংসার। অলীক আবাস মুকুন্দপুরের গন্তব্যে। বিগত পাঁচ বৎসরে খালের জলে অনেক কিউসেক জল ময়লা পরিস্রুত হতে দেখেছে অবাক দম্পতি ।লবণহ্রদ লাগোয়াখালের আববাহিকায় ছিল তাদের বাসাবাড়ি। এখন রিক্ত । বিলুপ্ত সংসার । আশ্বিনের অকাল প্লাবনে নিরঞ্জন। চরাচর জুড়ে জল আর জল। এক চিলতে মাঠ শুধু বেঁচে আছে পায়ের তলায়। তাই জলতল জীবনের আলটপকা উপমা। সুপ্রযুক্ত হোক, না হোক শুরু করাটাই আসল। প্রক্ষিপ্তা উপমা দিয়েই তাই বোকাদম্পতির জীবনঝাঁককির উন্মোচন হোক। তারপর তরতরিয়ে পৌঁছবে সমাপ্তে। দি এণ্ড-এর চৌকো বা আভূমি রেখাচিহ্ন। শেষ হয়েও পাঠকমন সিক্ত হবে বেহাগসুরের জলীয়তায়। হইবে না শেষ।

প্রলয় পাঞ্চালীর শূন্যভিতের সংসার লোপাট হওয়ার ঘটনা জানতে হলে শুধু উপমা নয়, ঘটনার প্রক্ষেপণও অবশ্যম্ভাবী ।জোড়া বোকামানুষের পার্থিব সুখ আদায়ের চাতুরিকথা রচনায় আছে রকমারি প্রক্রিয়া। পাঁচ বৎসরের গ্রাফচিত্রের সিয়েট রেটিং-এ ওরা এক নম্বর জুটি। সৌরভ-রাহুল। ছক্কার পর ছক্কা। মাঝখানের নির্মম মেডেন ওভারে উইকেটও গেছে একটা। প্রারম্ভিক বল্লেবাজ তাদের একমাত্র সন্তান লাবণি। কে জানত জেতা ম্যাচ এমন পরিত্যক্ত হবে। কে জানত জীবন আর ক্রিকেট মিলেমিশে মহান অনিশ্চয়তার সত্যে সুখের গেরস্থালি ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। সুপার সাইক্লোনের তবু একটা পূর্বাভাস ছিল। পুলিশ দাদুর ভোজবাজিতে প্রলয় সংসার লোপাট হল নিমেষে।

জলের উপমা প্রিয় প্রলয়ের । দশ পয়সার খাল পেরতে অনেকবার জল পরিশোধনের গল্প বলেছে, পাঞ্চালীকে । ডুবেও ডোবে না ময়ূরপঙ্খী ডায়েট পেপসিব ক্যান বা হাগিস হুইসপারের শূন্য খোলে শৈশব যৌবনের বর্জ্য বাহিনীকে দেখিয়ে বলেছে, পতিতোদ্ধারিণী। কুকুর বেড়ালের মড়া, পূজার ফুলপাতার ক্যারিব্যাগ, ফিল্টার সিগারেট আর দমদম বিড়ির সিক্ত বিজ্ঞাপন দেখিয়েও বলেছে পতিতোদ্ধারিণী। মাল্টি-ন্যাশনেল আর সর্বহারারা না তেলাপিয়ার অন দৃত ফসলে আধফর্সা খাল। আররএকটু এগোও, ভেড়ি সাম্রাজ্যে, অ্যাকোয়াগার্ড পরিস্রুত, চারা পোনা বাটা তপসের আঁতুড়ঘর। প্রিয় শিষ্যা প্রশ্ন করেছে, তাপর ? তারপর নদী বিদ্যাধরী। তারপর? সগর রাজার

এলাকা, গঙ্গাসাগর। তারপর ? বৌ প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত স্বামী জানায়, তারপর াবার কী? বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর। শুধু জল আর জল। শুধু জল আর জল। এ কেমন গেরো, তাহলে ত ফুড়ুৎ-এর গল্প বলতে হয়। তারপর? ফুড়ুৎ! আসলে প্রলয় কী সব জানে। সবজান্তা সহকর্মী উদ্ধারকানিণী। পরিবেশ বিষয়ে অমনোযোগী ছাত্রী সহধর্মিণীকে বলেছে, এই দেখছ নোংরা জলের অন্তঃ স্রোতা, মাইল দুতিনেক এগালে চিতেই পারবে ভূজ্ঞানী স্বামীকে ধর্মসংগীত গেয়ে শুনিয়েছিল পাঞ্চালী বুদ্ধিমতী । মাটির বুকের মাঝে বন্দী যে জল মিশিয়ে থাকে । রবীন্দ্রগানে পারঙ্গমা স্ত্রীর জল বিষয়ক শিক্ষার সেই শুরু।

বৃক্ষতলে বসে পাঁচ বৎসরের লবণহ্রু জীবন নিয়ে ওলটপালট ভাবনায় জড়াচ্ছিল ভাবছিল প্রলয়। প্রলয় সাধুখাঁ । মফস্বলের অখ্যাত জহুরি প্রতাপ সাধুখাঁর বি এ পাশ ছেলে । পাশে বসা একদার নবরসে রঙ্গিনী নায়িকা। স্ত্রী পাঞ্চালী । বন্যার পর ঘরে ফেবার অনিশ্চয়তায় উদ্‌ভ্রান্ত ঝড়ের পাখি। উদাসীন বিষণ্ণ মুখাবয়বে উপনিষদের দ্বিতীয় পক্ষীর দার্শনিকতা । খাচ্চে কিন্তু গিলছে না। পাঁচ বৎসর আগে এমন ছিল না। এই পার্কের সবুজ বাতাস আর উদার আকাশ দেখে পুচ্ছ তুলে নেচেছিল ময়ুরী। আতিশয্য করেছিল কবিতায়। দাদুর বাড়ির বাগানবিলাসকে বলেছিল আনন্দ ভৈরবী ।এই মাঠের দণ্ডকলসকেও কী যেন একটা নাম দিয়েছিল। বিনা পাগড়ি বিনা কিচ্ছু লবণহ্রদে দুই কামরার ভাড়াবাড়ি পেয়ে যাওয়ার চিত্তসুখ। এক হাজার বর্গফুট এক হাজারে । বৌভাগ্যে গর্বিত বর বলেছিল, তোমার জন্যই হল। বাড়ি পেতে বুড়ো পুলিশ দাদুকে ধাপ্পা দিতে মন খারাপ হয়নি বিন্দুমাত্র। মহানাগরিক চালাকি। খেলার শুরু সেই হাপিস খেলার লাভঅল।

কে জানত গেম পয়েন্টে দাঁড় করিয়ে এমন ব্যাকহ্যাণ্ড স্ম্যাশ খেলবে বুড়ো। আশি পুলিশ তাদের চাতুরি সজ্জিত গেরস্থালি ভাঙবে এমন মটাশ। পার্থিব সুখ দুর্বুদ্ধিতে করায়ত্ত করার বাসনা যখন পেয়ে বসে, সতর্কতা কে মনে রাখে? ওরাও রাখেনি লোপাটবাড়ির কথায় একটি বাসাবাড়ির বিলরসিদ চাই । সেটাই ওরা জোগাড় করেছিল মিথ্যা দিয়ে। ধাপ্পা দিয়ে। পটানো কথার নূরজাহান পাঞ্চালী বলেছিল, ডালের বরফি! প্রলয় মনে এখন, এতদিন পর এক প্রিয় কবিতার পংক্তি , জল যায়রে এমন দিনে, চাঁচর মুখপানে।

সেদিনও বিজয়িনী বসেছিল এই মাঠে । গর্বিত পুরুষও বলেছিল, তোমার বুদ্ধিতেই হল। কী দারুণ উপস্থিত বুদ্ধি! আক্কেল ব্যাপারটাই নেই প্রলয়ের । প্রলয় বুদ্ধি যে টিউবলাইট সে ঠাট্টাপাঞ্চালী যখন তখন করে ।স্বামীর প্রশংসা হজম করে পাঞ্চালী তাকিয়েছিল আকাশে। আকাশ খুজে হয়রান চোখে তখন খুশির ঝিলিক। পাতার ফাঁকে খণ্ড খণ্ড অভ্র জ্যোতি দেখে বলেছিল, এত সবুজ জীবনে দেখিনি। সুবজে আর অম্বরে কী লুকোচুরি খেলা!

প্রলয়ের খুশি অন্য খেলায় ।বেমক্কা এক স্কোয়ার ড্রাইভেএই স্কুলের জানালা ভেঙে চুরমার। এই মাঠময় তখন ধবলসাজ শৈশব তিনকাঠির স্বপ্নময় খেলায় মগ্ন। প্রলয়ও খেলেছে কাশ্মীরি উইলোয়, তবে এমন দ্রোণাচার্য পায়নি। পরিভাষার এমন অনুবাদ কেউ শেখায়নি। আচার্য অম্বর রায়ের শিক্ষার জবাবে লাগোয়া বিদ্যাবাড়ির অলিন্দ গবাক্ষ ঝনঝনিয়ে ভাঙতেই আনন্দময়ী স্ত্রীর খুশিতে মিশে যায় প্রলয়। পুলকে পুলক মেশে, পাঞ্চালীর চোখ বেয়ে পাতাবাহার খণ্ডিত আকাশ দেখে। ঝনঝনানো ক্রিকেট পুলকে বলে ওঠে, দারুণ!

বুদ্ধি করে কথা বলার ধাত নেই প্রলয়পাতির । বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যখন যায়, বিভ্রান্তি রেখে যায়। পাতার ফাঁকে স্ত্রীর গর্বিত দৃষ্টি না বিখ্যাত ক্রীড়াবিদের দুর্লভ প্রদর্শন ? স্বামীর পুলকিত উচ্ছ্বাসের অর্থ খুঁজে পায় না পাঞ্চালী। একই স্বরভঙ্গিতে উচ্চারিত দারুণ ছাড়া যে খুশির অন্য পরিভাষা নেই প্রলয় ভাণ্ডারে। কথা বলা পুরুষ যে তার বোরিং সে মুখেও বলে অনর্গল কথা বলা নারী। বলে, তোমার লিমিটেড ভোকাবলারি। যুবা প্রলয় চোখের কথামালায় কাত হয়েছিল বারান্দাঘরের যুবতি। চোখের ভাষা তার প্রসাধনী। আর্দ্রকারী আরক হরিচন্দন অঞ্জন সানস্ক্রিন। কথা সাজানোর দুর্বলতা দূরীকরণ আয়ুধ।

প্রলয় পুরোদস্তুর চালাক যেমন নয়, বোকাও নয়। চলনসই । পুলকভরা এই মাঠের পাতা চেরা আকাশ আর লালবল ছক্কার প্রলোভন থেকে বেছে নেয় তার কাঙ্খিত । পরম্পরা ধরে শহুরে বৌয়ের কপাল তোলা রোদ চশমায়। বৌভাগ্যে বঙ্গলক্ষ্মী সুপার জেতার আনন্দে ডগমগিয়ে ওঠে। সচিব সখির স্তাবকতায় হয় মুখর।

প্রলয় অভিমানের আরকজলে প্রশ্ন ছিল পঞ্চানন গুহনিয়োগীকে নিয়ে। কে এই দাদু পুলিশ ? এমন পুলিশ অফিসার দুর কথা পাঞ্চালী বলেনি একদিনও। প্রলয় তেমন পড়ুয়াও নয়। তাই পঞ্চাগুহর নাম শোনে নি। তবে বাড়িওলা বুড়ো আর পাঞ্চালীর কথোপকথনে বুঝেছে তাদের ভাড়াবাড়ি ভাগ্যের মাধ্যম এক অশরীরী পুলিশ লেখক। লালবাজারের সেই দুঁদে পুলিশ পঞ্চাননের সহকর্মী লবণহ্রদের লোলচর্ম বাড়িওলা। সহকর্মীর সপরিবার সকন্যা জামাতার মৃত্যুজনিত সহমর্মিতায় কাতর বৃদ্ধ। দুর্ঘটনায় মৃত সহকর্মীর একমাত্র উত্তরাধিকারিণীকে সহজ শর্তে বাড়ি ভাড়া দেওয়ার সিদ্ধান্তে যুগপৎ পুলকিত এবং বিভ্রান্ত প্রলয়। রহস্য এবং গরমিল। লবণহ্রদ বাসাবাড়ির গুপ্তধন। হিসেবের শূন্য কোথায় বসবে । ডাইনে না বাঁয়ে? হ্রাসবৃদ্ধির দোলাচলে প্রলয় ভুবন ঢেকেছিল ক্ষণিক মেঘে। জয়ের দিনে মেঘবৃষ্টির অকারণ বিষাদ কেন মানবে প্রলয়ের ঘরহীন ঘরহিন। আকাশ থেকে জাদুকরীর মুদ্রায় সবুজচেরা এক ঝিলিক আলো টেনে নামায় । জয়মুকুটের হীরে। বলে, — পঞ্চাদাদুকে নিয়ে ভাবনার কিছু নেই। বলিনি আগে এখন ত বললাম। পাঁচ বৎসর আগে সম্রাজ্ঞী নূরজাহান যে এই ভূখণ্ডে শাসন করতেন অল্পমতি প্রলয়শাহকেতাই, হিরের ছোঁয়ায় মিটে গেল ধন্দ।

এই বাড়ি এই বাজার এই জলাধার এই গোলচক্কর এই মাঠ । লবণহ্রদের এই এলাকা হল প্রলয় পাঞ্চালীর সুবামনসব। খণ্ড বিভক্ত লবণহ্রদ সব সময়ই প্রলয়ের কাছে রহস্যের আধার। ইংরেজি জোড়া বর্ণমালার বঙ্গীকৃত উচ্চারণে বিরক্ত হয় বুদ্ধিমতী স্ত্রী। বলে, বলে দেখো রাওলা অটওলাকে, খগেন সাধুখাঁর বাড়ি পৌঁছে দেবে। বাপের নামে গালাগালের কী ব্যবহার! বৌবুদ্ধিতে প্রলয়ের গর্ব। ভাবে কী করে পারে? এমন উপস্থিত বুদ্ধি ত তার নেই । এ আর ই যোগ করে দ্ব্যর্থক 'এই' শব্দ ব্যবহার করতে কম গলদঘর্ম হতে হয়নি তাকে । পাঞ্চালী সহজেই পারে। বাপের নাম তুলে কথা বলায়ও রাগে না প্রলয়। পাঞ্চালী ওরকমই তা উপর সদ্য বিয়ে করা বৌ। পাঁচ বছরের বুড়ি হতে অনেক দেরি।

পাঁচ বৎসর পরের চিত্রনাট্যে হেরফের সামান্য । ক্যামেরার কাঁচে মৃদু ফিল্টার । জলমগ্ন মাঠে ন্যাড়া ঘাসমুঠি। শতাব্দীর শেষ বন্যায় ভাসি! ঘাস জলের চোরপুলিশে বিপর্যস্ত দুজোড়া পা। পাতা বাঁচাতে পিছন জলে ডোবে গোড়ালি । ঘাসজল আর কাদা মৃত্তিকার লকআপে দুই যুদ্ধবন্দীর

মুখে ধূসর প্রসাধন। দু এক ফোঁটা আকাশি জলের মুক্তোবিন্দুতে ভারসাম্য শুধু। জীবনের প্রথম গ্রন্থিত যুদ্ধে অখ্যাত পুলিশ হিমুর হাতে পরাজিত প্রলয় দি গ্রেট। পাঁচ বৎসর আগে মহরত শটও একই লোকেশনে হয়েছিল। তখন, এমন ছিল না বেলা । ক্যামেরায় ছিল না কোন পরিশোধন ব্যবস্থা । না কোন প্রসাধন চটপটে বৌ আর গঙ্গারাম স্বামীর জুটি ছিল দুরন্ত। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধটা ঘটে গিয়েছিল আগে। তখন ছিল জয়ের দিন। ধরাকে হস্তামলক ভাবার দিন। কত কী ঘটেছিল সেদিনের দৃশ্যপটে। ভক্তিমতী নাতনির দাদুপ্রণাম, প্রাক্তন দারোগা পঞ্চানন গুহনিয়োগীর রেফাসেন্স, পৌত্রিত্ব বরণ আর হাজার বর্গফুটের লটারি বাসাবাড়ি । খুশিতে ডগমগ পাঞ্চালী বলেছিল স্বামীকে দেখা হবে চন্দনের বনে।

চন্দনের বন খুঁজতে ওরা বেরত রোজ। মুচিপাড়া খালাসীটোলা কুমোরটুলি নিমতলা। ধোবিয়াতলাও ঘুরে ঘুরে সখ হল রাজপুরী পরিক্রমার। কিছু না হোক স্বপ্নপুরী লবণহ্রদ ভ্রমণের নয়নসুখও কম না । ডি সি পালের নয়নাভিরাম সব প্রাসাদ। বাজোরিয়া গোয়েঙ্কা তুসনিয়াল আর দু এক ঘর বাসু মুখার্জি দত্তদের। ঘুরতে ঘুরতে পরিশ্রান্ত হলে ঢুকে যাওয়া যাবে বিজ্ঞাপন বাড়িতে। অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার। এক কাপ চাও খাওয়াবে । বিজ্ঞাপনের খোপে ওরা হুবহু ঢুকে যাচ্ছে বলেই না যাওয়া। শুধুমাত্র স্বামীস্ত্রীর নির্ঝঞ্ঝাট পরিবার । প্রলয় শুরুতে বাধা দিয়েছিল। তিনহাজার বেতনে লবণহ্রদে বাসাবাড়ি, শখও কম না! তার উপর বিজ্ঞাপনে যে বাড়িওলা নিজের ক্রেডেনশিয়াল জানায়, সে কেমন লোক তা জানা কথা! নবীনা গৃহিনী বলেছিল, চলই না। পুলিশ বলে ডাকাত না, মেরে ফেলবে না। একটু রগড় হবেয় টাইমপাস।

সময় কাটাতে গিয়ে যে এমন ধোঁকার বাড়ি পেড়ে যাবে পাঞ্চালি পুটুস পুটুস, ভাবেও নি নতুন গোঁসাই প্রলয়। বৌ বলল প্রলয় এমন জেরাব মুখে ভেঙে পড়ত। তা পড়ত বৈকি। কেমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছিল, যেন কেপমাপিপ গ্যাং ধরা পড়েছে। পাঞ্চালীকে দেখছিল যেন ভিলেন প্রেমনাথ। পদ্মা পাঞ্চালীর বুকের মাপ জরিপ করছিল। ছত্রিশ আটত্রিশ চল্লিশ সেই সাহসেই পুলিশের সঙ্গে পুলিশ মিলিয়ে নামটা বলে দিল জুতসই পঞ্চানন গুহ নিয়োগী আমার দাদু । পাঞ্চালী কথার মূলাধার হয়ে রইল এই মিথ্যাবাড়ির অমৃতকুম্ভ? একবারে হোমওয়ার্ক ছিল না যে পাঞ্চালীর তাও নয়। দুলাল বালার গ্রন্থাগার থেকে পঞ্চা গুহর জীবনকাহিনী পড়েছে পুঙ্খানুপুঙ্খ। 'কোটাল কথা' বই-এর ব্লার্বে সপরিবার দুর্ঘটনার মৃত্যুকথা পড়েছে । লাগল বাড়ি বাউগুরি। বিজ্ঞাপনবুড়োও বলল, আমার বস । মিলে গেল দেবগণ দেবারিগণ! একে একে দুই হল। দুই এ একে তিন। মুখে মুখে এগ্রিমেন্ট । বিল রসিদ সব।

পাঁচ বৎসর আগে এই মাঠ কোনে শুকনো শিশিরের গন্ধে বিভোর মহারানী রিজিয়া বলেছিল। —পঞ্চাদাদু ভাবতে পেরেছিল এমন ফোকটে নাতনি পেয়ে যাবে?

নাতনি বলে নাতনি। দাদুভাগ্য কেমন বল। একেবারে ডবল দাদু!

বইদাদু যেমন তেমন, বাড়ি দাদু সুভানাল্লা!

পাঞ্চালীর কথারচনার প্রসদগুণে আচ্ছন্ন হয় স্বামী প্রলয়। মিথ্যাকে মিস্টি মিস্টি করে মেনে নেয় স্ত্রী কথার বয়ননৈপুণ্য।

পাঞ্চালীর মিঠেকড়া যুক্তিবুদ্ধির কাছে বারবার হেরো কথামুগ্ধ প্রলয়। মিঠে কথার শুরু ছিল ভালই।

লোকটা পুলিশের মত জেরা করছিল।

পুলিশ পুলিশের মতই করবে, সে ত উকিল বা মাস্টারমশাই নয়।

আর বাড়িটাও ভাল লেগে গেল।

তাই মিথ্যে কথা বললে?

মিথ্যে কথায় চিড়ে ভিজল না। তাই কড়া কথার জোয়ারজলে ভাসিয়ে দিল পাঞ্চালী স্বামীর প্রতিরোধ।

ওটা মিথ্যে কথা হল? তুমি বল না ? অফিস কামাই করে বলনি মাসীমার অসুখ।

তা বলেছি । মাসীর মেয়ের কথা বলব এখন।

তা হলে ? ছোট মিছেয় কিছু হয় না । ও হল ডালের বরফি। মিস্টি মিস্টি।

ধোঁকা?

আলবৎ । বুড়ো পুলিসের জেরার মুখে ত ভেঙেই পড়েছিলে। লোকটা পেডিগ্রি খুঁজছিল বড়সড় একটা পরিচয়। স্যার বীরেন বা আশুতোষের নাতনি হলে কথাই ছিল না। সাধুখাঁ সাহেবের ব্যাঙ্কের চাকরি। কী রকম সন্দেহের চোখে দেখছিল! ঢোল ফেটে যেত চৌচির।

কী হত? ওতে মিথ্যে নেই বিন্দুমাত্র। আমার কোম্পানি ফরেন ব্যাঙ্ক-এর মানবসম্পদ সাপ্লাই করে। চুক্তিবদ্ধ চাকরি। এতে মিথ্যে কোথায়?

এতেও তাহলে মিথ্যে নেই? তাহলে ত হয়েই গেল। এবার বাড়ি চল। সখা, ফিরিয়া চল আপন ঘরে । তর্কে কী বা লাভ । দিশাহীন পথ আর মাঠশালিক গৃহস্থালির সমাপন সুখ উদযাপিত হোক আনন্দে। তাই যুদ্ধবিরতি। সুখের লাগিয়া লোভের আঠায় জড়িয়ে গেল বোকা বর। বৌকথার বাড়ি তার ভাল লাগল। কাছে গেল, মুখে বলল, খা।

ভালবাসার বাঘ বেরল এই কাননে। ভালবাসা রঙে মিঠে মিঠে সকাল রোদ্দুর। কানন ঘেরি সবুজ টুকরো সূর্যের ঝিলিক। পাতাচেরা আলো আর বৌবুদ্ধির কুটিরশিল্প । বারান্দাঘর ইন্টুমিন্টুর রূপান্তর গৃহিনীতে। খেলাচ্ছলে লবণহ্রদ বেড়াতে আসা অভাবনীয় গৃহস্বামীর খুশিও বাঁধহারা। মর্তসীমার বাইরে। সবগাছ ছাড়িয়ে। সরাসরি সৌর লোকে খেলছে কাবাডি। চুকিত কিত।

গ্রামে চুকিত ডাক ছিল না । প্রলয় খেলেছে হাডুডুডু । একদমে বলতে হবে খেলার ডাক। হাডুডুডু ভাইয়া পানি খেতে যাইয়া পানির নামে চন্দন। চন্দন চন্দন.........অনবরত। থামলেই আউট । খেলায় কেউ কখনও বহিষ্কৃত হতে চায় না, প্রলয়ও চায়নি। লড়ে গেছে। গ্রামের ছেলে মহানগরে সে মনমাসির বাড়ি খুঁজে বের করাও লড়াই । ফাউ-এর উপর আসল হল চাকরি যোগাড় করা। যে সে চাকরি নয়, বিদেশি ব্যাঙ্কের অফিসার। হস্তি অশ্বত্থামার একটা জালফাঁকি আছে চাকরিতে চাল তেল ডাল নুনের মত মানুষ সরবরাহেরও আড়তদার আছে বড় শহরে? সেই আড়তের মাল হয়ে ঠিকা কাজে জুটে গেল । ভিজা পাওয়ারের বিক্রিওলা। কোট প্যান্ট টাই-এর

প্রাথমিক নিবেশ হাজার কয়েক। নগরপত্তনির প্রাথমিক ডাক এক নিশ্বাসেই নিয়েছিল প্রলয় চন্দন চন্দন..........।

কে আসল কে ফাউ এ বিতর্ক এখানে অবান্তর । ডিম আর পাখি তেল আর পাত্র নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। প্রলয়ের কাছে দুটোই অপরিহার্য। চাকরি এবং মনমাসি। মনমাসিও আপন মাসি নয় কিছু। পাশাপাশি বাড়ির দুই মাসতুতো বোনের নামই মন। আসলে বেহালা বাজাতে বাজাতে মায়ের দাদু বললেন ইমন বেহালা থামিয়ে বললেন সুমন। সেই মাসীবাড়ির বারান্দাঘরে আশ্রয় ।আপন বললে আপন দূর বললেও খুব দূরের নয়। বেহালাবাদক মানুষটা ত আপন। মাসি ত মাসিই , মায়ের মত । মাসীর বর বাবার মতো না হলেও মেসো ত বটে। সর্বক্ষণ বইপড়া মাস্টার মশাই দুলাল বালার নাক চশমায় শুধু জ্ঞান যেমন মায়ামমতা ও দেখেছে প্রলয়। ছুটির দিন বাজারের থলে হাতে একবার বারান্দাঘরে থেমে দাঁড়াতেন মনমেসো। ---কী হে শিবঠাকুর আজ কী খাবে বল? শিবঠাকুর প্রলয় নাচ নেচেছিলেন বলে আদরের ডাক মেসোর । প্রলয় কিছু বলত না। মুখ ফেরতার একটা মাছ আসত অনটনের সংসারে। উটকো বেড়াল হয়ে বেশ ছিল প্রলয় মাসির বাড়ি। সকালে বেরিয়ে গেল ধান্দায় ।রাত করে বাড়ি ফিরল, সকালের উজানি নাও ফিরল ভাটিগাঙ বাইয়া।

রাতের অতিথি যে তলে তলে তারই ভাঁড়ার সাফ করছিল বালা মাস্টার জানতেন না। গরীবের সংসারে দুঃখ কষ্ট ঢুকতে পারে বেরতে পারে যে কোন পথে। সদর খিড়কি ঘুলঘুলি খোলা। কিন্তু নৈতিকতার আগমন নির্গম পথ যে একটাই । সদর চৌকাঠ । মাস্টারমশাই ভালমানুষ যেদিন জানলেন মহানগরে মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকুও থাকল না গ্রাম যুবকের।

গ্রামের স্বামী স্ত্রীবুদ্ধির দুষ্টুমি মেনে নেয়। প্রলয় সাধুখাঁ চাকরির ফাঁকি দিয়ে নিজেকে সাজায়। জিততে হলে লড়তে হবে, এই সামান্য শর্তসাপেক্ষ সে একজন ভালমানুষ । অন্যের ক্রোধোদ্দীপক কোন কর্মে শর্ত ভাঙে না। চন্দনের গান গায় অনবরত। তবু সে আউট। বহিষ্কার। বেদিয়াপাড়া বারান্দাঘর থেকে ছিটকে গেল। আসলে ইতিমধ্যে প্রলয়জীবনে এক লগনচাঁদা দুর্বিপাক ঘটে গেছে। বিংশতি বালার অনুপ্রবেশ ঘটেছে, বিষম সব সমাজ সংকট উপমা ছাড়া যাকে সহজ করা সম্ভব নয়। আগুন আর ঘি, আম আর দুধ, মাছ আর বেড়াল কতই ত আছে। তবে শেষেরটাই জুতসই । রাত করে বাড়ি ফেরে রজত জয়ন্তীর যুবক দূর । সম্পর্কের হুলো ভাইকে মাছ ভাতের থালা আর এক গ্লাস জল দিতে আসে অষ্টাদশী বালা। সেই জলের নামেই চন্দন ।তারপর যেমন হয়, কথারচনার সহজ সমাধান বাড়ি থেকে পালিয়ে । চিনেবাদাম মাঠ আর অন্তহীন রাজপথ ধরে খুব ছুটেছে অশ্বমেধের ঘোড়া। থামল গিয়ে দাদুর বাড়ির মিথ্যে যজ্ঞশালায়।

মিথ্যা আর সত্য বিচার আসলে কূটকথা । কূটকচালে মাথা না ঘামিয়ে আপাতত বলা যায়, যাই হোক তবু ভাই নিজের বাসা। অস্থির চাকরির গোনাগুনতি বেতন থেকেও যে সঞ্চয় করা যায়, দেখিয়ে দিল বুদ্ধিমতী বৌ। গৃহ এবং অর্থমন্ত্রকের সফল পরিচালিকা স্বামীকে শোনায় হিন্দি সিনেমার গল্প। কৃপণ মহাজন বৃত্তান্ত।

সে কেমন? বোকা স্বামী ত সিনেমা দেখে না, জানবে কী করে।

কেমন আবার? জান না সেই মাছের ঝোলের ছবি দেখে ভাত খাওয়া?

না ত! বৌবুদ্ধিকে তারিফ জানাতে বোকা সাজাই ভাল।

না ত, কিচ্ছু জান না। মহাজনের ছিল এক বোতল ঘি আর ঘিএর বোতলে রুটি সেঁকার বিলাসিতা।

তাইত তাইত। বৌবুদ্ধিতে হাসতে হাসতে মজা হল। প্রলয় ভাবল কৃপণ মহাজনের ইঙ্গিত পুলিশ দাদুর দিকে। ভাববে নাই বা কেন। নকল দাদু পঞ্চানন গুহনিয়োগীর সহকর্ম মানুষটির সংসার বলতে সাজানো ঘি-এর বোতল। ফ্রিজ টিভি ওয়াশিং মেশিন দেয়ালসুন্দর কাঁচের আলমারিতে স্কেন্ডেনেভিয়ার বেলোয়ারি আসবাব। শৌখিন বটে লালবাজারের প্রাক্তন টিকটিকি মেজকর্তা। বাবুর আছেন এক আত্মীয়া, নামে ভ্রাতৃবধূ। কানে শোনেন মুখে বলতে পারেন না রহস্যকথার গা ছমছম করা চরিত্র। আশি বুড়োর সত্তর বয়সিনী বৌদি বোবা বৌ নিয়ে পাড়াজনদের ভিন্ন কথা। প্রলয় অতশত গল্প কথায় থাকে না। চতুরা পাঞ্চালী থাকে। স্বামীকে বলে,

দুর্বলতা ধরে রাখো।

কী হবে ধরে।

কাজে লাগবে।

কী কাজ?

আছে আছে। পুলিশের নাতনি আমি বলছি, তাই।

আসল ত নও।

তাতে কী? নকলেও থোড়া থোড়া হয়।

পুলিশ বুড়োর দুর্বলতা ধরতে রাডার পাতে প্রলয়। পুলিশকে বরাবর ভয় করে এসেছে গ্রামের মানুষ। দুম করে এমন মাথার উপর বাড়িওলা পুলিশকে নিয়ে প্রলয়ের মনোজগতে বিড়ম্বনা। বর্তমান আর প্রাক্তনেও কোন ফারাক নেই তার কাছে। পুলিশ পুলিশই। পুলিশ মানেই জেরা। শার্লক হোমস ব্যোমকেশ বক্সিরা খুনখারাবি বদমাইসির মধ্যে থেকেও অন্যরকম। রহস্যভেদ ছাড়া দুজনেরই ব্যক্তিচরিত্র অগোছালো। প্রাক্তন গোয়েন্দা কর্তাও আসলে পুলিশ। সত্যান্বেষী আর লালপাগড়ির মিশ্রণ। তাই হয়ত অশীতিপর বৃদ্ধজীবনে রুচি এবং বিকৃতির প্রকাশ এত স্পষ্ট। পুলিশ সংক্রান্ত অনেক কিছু জানে পাঞ্চালী। বাবার বইভাণ্ডারে পড়েছে পঞ্চাগুহর কোটাল কথা। পুলিশের মনস্তত্ত্ব পড়েছিল বলেই বারবার অগ্নিপরীক্ষায় পাস। কিছু জানা কিছু সপ্রতিভতা পাঞ্চালী বৌএর জোড়া শক্তি। প্রথম সন্ধ্যার জয়টাই ধরা যাক না! কী দারুণ! প্রাক্তন পুলিশের ড্রইংরুমে সাদামাছ কালমাছ লালমাছের রাজসিক গমনাগমন দেখছিল আর ঘোলা মনকে জলের স্বচ্ছতায় শাসন করছিল। ভাবছিল জলের কী অপার মহিমা। এর মধ্যেই বাড়িওলা দাদুর ক্যুইজ নাম্বার ওয়ান।

বলত দিদিভাই, পঞ্চাদা কী করে রহস্যভেদ করত? দুম প্রশ্নে বিপদেই পড়ে পাঞ্চালী। সপ্রতিভতা না হারানোর মন্ত্র পড়ে চাঙ্গা হয়ে জবাব দেয় পটাশ।

জলের দিকে তাকিয়ে থাকত দাদু।

উঁহু হল না।

হল । পাঞ্চালীর দৃঢ়তা আর কুইজ মাস্টারের নাকচ। দুয়ে মিলে প্রলয়রক্তে হিমস্রোত। এই বুঝি ধরা পড়ল। বাস্তুহানোর নোটিশ পত্রপাঠ। না, রক্ষা হল। সবুজ আলো এবং ফুলপয়েন্ট।

শুধু জল না । জল স্বচ্ছতা আর বিভিন্ন মাছের পারস্পরিক ব্যবহার। স্বস্তি ফিরে আসায় খুশি প্রলয়। লিমিটেড ভোকাবলারি ভেঙে জানায় উচ্ছ্বাস।

এতেই পরিষ্কার হয়ে যেত দুরূহ ঘটনার জাল । দারুণ ত !

দারুণ বলে দারুণ! এর নাম গ্র্যাণ্ড অ্যাকোয়ারিয়াম। তোমার দাদাশ্বশুরের দেওয়া নাম। থার্টি ইয়ার্স ব্যাক। বুড়ো ইচ্ছে করেই সবকিছুর তালগোল পাকিয়ে দেয়। জট পাকিয়ে রাখে । পাকানোর সুতো দেয় অন্যকে। থার্টি ইয়ার্স ব্যাক কথাটাও ধাপ্পা। রিটায়ার করার বার বছর পর পঞ্চাগুহর মৃত্যু হয় পথ দুর্ঘটনায়। একমাত্র নাতটি খুব ছোট। পাঞ্চালীর হিসেব মত দুর্ঘটনার পর কেটে গেছে কুড়ি বছর। কী দাঁড়াল? উল্টো জাল বিছিয়ে কী জানি কী শিকার করতে চায় বুড়ো। ছেলে আসবে ছেলে আসবে বলে ভাড়াটিয়া শাসন করে। এর না হয় একটা যুক্তি আছে। ছেলেটেলে কিচ্ছু নেই সব ফলস। প্রথম দিনই বলে দিয়েছে পাঞ্চালী । ওসব গল্প বলে নিজের সঙ্গে মস্করা করে বুড়ো । অভ্যাস যাবে কোথায়। নিজের রুলের গুঁতো খেয়ে কোঁৎ করে। কোষ্ঠ দৌড়ে পালায়। ছেলে থাকলেও এতদিন যখন ফেরেনি আর ফিরবে না। ফিরবে না বলেই ছেলে পালিয়েছে সাতসাগর পারে । করিতকর্মা পাঞ্চালী অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছে ভুটানভাই ইস্ত্রিওলার কাছ থেকে । বোবা বৌদির বর ভাইও পালিয়েছে অতল জলের আহ্বানে । পাঞ্চালী জেনেছে কার জন্য আত্মহত্যা কী কারণে দেশত্যাগ।

বুড়ো শোনায় ভিন্ন কথা। অনেক রোগ ভোগের ছেলে তার। দারুণ ব্রিলিয়ান্ট । হার্ট কিডনি কোমরের রোগ। ছেলে দেশে ফিরলে বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। তাই সই। যখন স্থির হল কথা পাঞ্চালী বলল— একটা লিখিত চুক্তি হোক । দাদু বলল, —তাও হয় নাকি? কী জবাব দেব? পঞ্চাদার নাতনির সঙ্গে এগ্রিমেন্ট? কভি নাহি । তোর দাদু হিংসের মরবে ওপারে । পাঞ্চালী বলে — আমার দাদু ওরকম না। সেয়ানা বুড়ো তাড়ানোর প্রভিশন রেখে দিল তাও । বলে,—পুলিশ কখনও চুক্তি করে না। বাসাহীনের বাসা চাই, তখন একমাত্র শ্লোগান। পাঞ্চালী রাজি,— ঠিক আছে ঠিক আছে বল থাকতে দেবে কিনা? কত নেবে? — বল এগ্রিমেন্ট করবি না, বিল রসিদ চাইবি না। — বাঃ কথা পাকা হয়ে গেল । মাসিক ভাড়া দু হাজার। — দু হাজার! না হল না তীরে এসে তরী ডুবল শেষ পর্যন্ত । তিন হাজারে দু হাজার গেলে হাতে থাকে পেনসিল। — পঞ্চাদার জন্য ফিফটি পার্সেন্ট গুরুদক্ষিণা। মাস পুরলেই নগদ এক হাজার । ফ্রিজ টিভি না থাকলে বিদ্যুৎ ফ্রি । জীবন ফ্রি। বুড়ো নাতনির সঙ্গে রসিকতা করে ফোকলা দাঁতে হাসল। জলের আর এক নাম যে জীবন।

এতসব ফ্রি করে দিল বুড়ো । তাও কৃপণ মহাজন অপবাদ। প্রলয় ধন্দ পরিষ্কার করল রহস্যময়ী। — নারে মানুষ না। দাদু হল আমার ঘিএর কৌটো। সিনেমার অভিনেতা ঘিএর কৌটো খুলে দেখেনি জীবনে। পাঞ্চালী খুলে দেখল গন্ধে ম ম করছে। খাবলে খুবলে নেওয়া যায় বেশ।

প্রথম রজনীতেই ধাঁধার আসর দুবার। দুটোই মৎস্যাধার কেন্দ্রিক । দ্বিতীয় রাউণ্ড মূলত প্রথমাংশের প্রসারণ । থার্টি ইয়ার্স ব্যাক-এর গুলগল্প এবং পঞ্চাদার অভিক্ষেপ । গ্র্যাণ্ড

অ্যাকোয়চ্যারিয়াম নামের বৃদ্ধগৃহের মস্যাধারটির উপরে আছে এক কাঠের প্যাগোডার সাজ। সেটিও হিরো পঞ্চালালের আইডিয়া । বলো কেন? লাও ঠ্যালা, এক আচ্ছা ল্যাঠা! কথায় কথায় প্রশ্ন পরীক্ষা। তবে নিরাপদ প্রশ্নে নকল নাতনি শুরুতেই হেরে বসে থাকে। আমি ওসব জানি না বাপু। জানে প্রলয়, বোকা স্বামী জানে মৎস্যাধার ধারণার আদিভূমি চিন জাপান। প্যাগোডার দেশ।

ইয়েস! হলুদমানুষরা জানত মাছ হল সুখীতম প্রাণী । কেতাদুরস্ত চলাফেরা দেখতে দেখতে জলস্বচ্ছতায় ধ্যানমগ্ন হওয়ার বিকল্প কিচ্ছু নেই।একা মানুষের এমন বন্ধু আর হয় না । ভেতর ঘরে বোবা পর্দায় আলোড়ন হতেই দাদুর ওজনভরা কণ্ঠস্বর বদলে যায় হালকা প্রতিবেদনে,— এবার এককাপ চা হয়ে যাক। এপারে মুখরা যুবতি সদ্য পরাজয়ে ধৈর্যহারা । কাচঘরে টোকা মেরে হুসহাস শব্দে মাছেদের গতিপথে সৃষ্টি করে বিভ্রান্তি। ভেতর বাইরের জোড়া সংক্ষোভে ব্যতিব্যস্ত বুড়োর হয় পর্দাভেদ প্রস্থান। যার যেমন প্রাথমিকতা । বোবা কণ্ঠের বিকৃত চিৎকার সামাল দেওয়া যে কর্ম নয় বুড়োর সে বুঝতে পারে নবদম্পতি । অভাবনীয় পরিস্থিতিতে স্নায়ুদৌর্বল্যে কাতর স্বামীকে নির্দেশ দেয় উজ্জীবিত পত্নী, দুর্বলতা গুণে রাখো। বোবা বৌ—এর চিৎকৃত সংলাপের সংকেত ভেঙে অর্থ বের করে প্রলয় গৃহিনী। বৌ বলছে, ওদের কেন চা খাওয়াব? গুণতি শেষে নবীনা নাতনি দাদুকে প্রতিনিমন্ত্রণ জানায় তাদের নব গেরস্থালিতে । পাঞ্চালী বুদ্ধিতে সরস্বতী নিবাসা বলে সুবোধ ব্রাদার্সের চা খাওয়াবে। আবার ডালের বরফি । মোড়ের মাথার দোকান থেকে একশ গ্রাম কিনেছে দশ টাকায়।

অতৃপ্ত আশি পুরুষের চোখ জুলজুল হয়েছিল একবার। আমন্ত্রণ তার রোধ করা ভার। ওদিকে রজত জয়ন্তীর আর এক জোড়া চোখেরও একই দশা। অশ্বমেধের ঘোড়ায় চড়ে বেড়ানোর পর আজ যে রাজসূয়। নিজের বাসায় জড়িয়ে ধরার প্রথম রজনী। বুড়ো নামতে পারবে না জানত পাঞ্চালী । নামল ওরাই। আলাদা দুই সুর গাইতে গাইতে । একজনের হিন্দি একজনের রবীন্দ্রনাথ। একজনের কামরাঘরে বন্দী হওয়ার গান। আর একজন ভুল গু নগুনানি দিয়ে দরজা খুলল বন্ধ করল। এরপর শুধু বর্ণনা অযোগ্য বিষয়ের আভাস । এবং বয়নে ইরেজ । সাময়িক সেন্সর । শেষ বারের মতো পোষা বরের নিঃশব্দ মৌখিক আচরণ শেষে শুরু হয় সংলাপ আবার।

তুমি এমন বোকা কেন গো?

কেন কী করলাম?

না হয় কোটালকথা জানি না অ্যাকোয়ারিয়াম ত জানি। প্রেমের স্বভাব কিছু কিছু জানি।

কচু জান।

কচু মানে। বারান্দাঘরের ডালভাত মাছের ঝোল বিস্মৃত হলে সখি?

সেই কচু। কচুপোড়া । কচুভাতে। আবার সংলাপের মধ্যবর্তী নীরবতা। অধরকচুর অল্পবিরাম।

বোকামি কথা এখনও শেষ করিনি ডার্লিং। মাছদুটো যখন গাছের ফাঁকে গেল, টেপ করলে কেন? টোকা দিয়ে অভিসার ভঙ্গ করলে?

ও, তাই বুড়ি চা দিল না?

দারুণ ত । এমন বুদ্ধি প্রলয়ের মাথায় খেলে না । পাঞ্চালীর উপর রাগল বোবা বৌ। বুড়ো

দখলের লড়াই যুবতি সনে। ব্যতিক্রম হল বলে রাগল। অন্যদি বকাবুড়ো বকে, শোনে বোবাজন। মাছেরাও শোনে। মানুষ বোঝার অসাধ্য এক সন্ধ্যাভাষায় ছিল বুড়ো বুড়ির প্রেমালাপ। ঠিক আছে বাবা, সরি, । বিকৃত মানুষের প্রণয় অভিমান নিয়ে মাথা ঘামিয়ে বিরক্তি বৈ কিছু নেই বরং রঙিন মাছের পিরিতি নিয়ে ভাবলে তাদের সোহাগের রাত হবে জমজমাট। নতুন প্রজন্মসম্ভব রাতে সাজবে তাদের নবীন বাসর । জলময় মাছের সংসার কল্পনা করতে করতে পাঞ্চালী এক সেন্টিটেরিয়ান গুল্মের স্বপ্নে বিভোর হয়। মগ্ন হয় জলীয়তায়। স্বপ্নভ্রূণ জন্ম নেয় তাদের স্বনির্মিত জলাধারে। বছর শেষ হতে না হতেই অ্যাকোয়ারিয়াম ভেঙে বেরিয়েও আসে লবণহ্রদের কন্যা। যৌথ গেরস্থালির প্রথম উপার্জন।

অনেক বৎসর পর পুলিশ দাদুর উঠানে মৃদঙ্গ বোল তোলে অবমানব নৃত্যের তালে। দাদুর খুশি নবীনাকে নাম ধরে ডাকে লাবণি । নাতনি কন্যার মুখ দেখে মাল্যদান করেন বুড়ো পুলিশ । লাল হলুদ রেশমি সুতোয় ঝোলান ডিবিয়ার্স হিরের প্যানডেন্ট। সর্বক্ষণের বুদ্ধিমতী পাঞ্চালীর চাতুর্য সেই সময় থেমে ছিল আনন্দে। নিরাভরণ অপত্যে। ঘি এর কৌটো খাবলানোর কথা মনেও হয়নি।

প্রলয়ের ভয় পাঞ্চালীর সাহসে। শুনেছে আজকালকার অনেক চতুর দম্পতীর কথা । পথে টাকা ছড়িয়ে রাখে। লোভ করলেই সর্বস্ব গেল। ডিবিয়ার্স হিরের গয়নার অনেক দাম। কেন দেবে এক অনাত্মীয় বৃদ্ধ? কী তার উদ্দেশ্য? সদ্য মা হওয়া রমণী বলে, ভালবেসে দিয়েছে । প্রলয় তথ্য বিশ্লেষণ করে জানায় পত্নীকে, কে এনে দেয় বল ত? বুড়ো ত দোতলা থেকে নামতেই পারে না। কোথাও একটা লিংক আছে। পাঞ্চালী বলে, আরে না না । সদ্যোজাত সন্তানের দামী উপহার প্রাপ্তিতে অভিভূত জননী বলে, আমার জীবনে মা বাবা ছাড়া দামী উপহার দেয়নি কেউ। মানুষটা মন থেকে একটা জিনিস দিয়েছে, ফিরিয়ে দিলে দুঃখ পাবে। প্রলয় অবাক। ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলেই নি সে । একটা মূল্যবান উপহারে এমন স্পর্শকাতর হয়ে গেল তার বুদ্ধিমতী বৌ। সন্তানস্নেহ এরকমই কাদার তাল! ঘি-এর কৌটোয় পর্যন্ত লোভ নেই?

সন্তান স্নেহ আর হিরের গয়না হল সাময়িক প্রসঙ্গ। এছাড়া পাঞ্চালী তার লক্ষ্যে স্থির আছে। লোভের আঠায় জড়াজড়ি আগুয়ান সময়যন্ত্র। গল্পকথার টাইমমেশিনে কুশীলবেরা যায় অতীতে। পাঞ্চালী জননীর পরিকল্পনা দুতিন বছর পরের। মাতৃহৃদয় দায়িত্বকাটার আকুপাংচারে এগিয়ে ভাবে। দুবৎসর পরই মিকি ডোনাল্ডের ঝোলা কাঁধে জলের বোতল হাতে রণে বে রে মেয়ে। টাটা মাম্মি টাটা পাপ্পা। লবণহ্রদে স্কুলে পড়ানোর খরচ সামলাতে পারবে বিদেশি ব্যাঙ্ক এর ভাড়াটে সৈনিক? তাই ফরোয়ার্ড চিন্তা। একটি গাড়ি থাকলে স্ট্যাটাস হয়, আয় হয়, স্কুলগাড়ির খরচ কমে। তাই আবার কৌটোয় হাত ।

বেতন আর উপরি থেকে বৎসরে তিন হাজার টাকা সঞ্চয়। পকেট কাটার কালো টাকা। শাড়ির ভাঁজের চোরকাটা । ধনীপত্নী স্বামীকে প্রস্তাব দেয়। একে একে সবই ত হল। অশ্বমেধ রাজসূয় রাজকন্যা। এবার একখানা রথও হোক । পাঞ্চালী ভাবনা উড়োজাহাজে হাওয়া খেতে বেরয় কখনও সখনও । রসদ কোথায়? যা আয় তাতে সাইকেল হয় রিক্সা হয় মেয়ের জন্য একটা ট্রাইসাইকেল হয়। অটমবাইল রথের শখ থাকলেও সাধ্য নেই পিতাজির। এদিকে পাঞ্চালীর বাজারে ঘোরা শেষ! পনের হাজারে ফিয়াট রেডি। এত টাকা কোথায়? সাইকেল রিক্সা ট্রাইসাইকেলের

দাম এক করে দাও। বাকিটা আমি দেখব। বাড়িওলা দেবে গাড়ি কেনার টাকা? দেবে দেবে। পত্নীর প্রত্যয়ে অবাক হয় স্বামী দেবতা। পুরনো গাড়ি বাতিলের সরকারি নির্দেশে দাম কমে গেল ছেষট্টি শতাংশ । অবিশ্বাস্য পাঁচ হাজারে কেনা হল ইঞ্জিনের ঘোড়া । চাবুক কেনার টাকা? গ্যারেজ? সেও দাভার বুড়ো?

পনের বছরের ফিয়াট রথের পাকা দেখা সইসাবুদ হল যেদিন, রাতে একা উঠে গেল পাঞ্চালী দোতলায়। হাতে নতুন কেনা ক্যাসারোল। ক্যাসারোলের ভিতর সুদৃশ্য স্যুপবাউল। বাউলে সাজানো গোল্ডির ঠ্যাং। ধোঁয়া ওঠা মুরগির স্টু টেবিলে সাজিয়ে দাদুকে আমন্ত্রণ জানায় আদরের নাতনি। অবাক বুড়ো কারণ জানতে চায়।— বারে আজ তিনশ ছেষট্টি হল না? বর্ষপূর্তি। এবার ত ভাড়া বাড়বে । কত বাড়াবে? এ হল রাম নামের জাদু ভানুমতী পাঞ্চালীর। শিকার ধরার আগে প্রলোভনের টোপ? অবাক বুড়ো আবার বিভ্রান্ত । আর জুলজুলে দৃষ্টি। একবার তাকায় চিনামাটির বাটির দিকে যায় ভিতর কাত হয়ে ধোঁয়া তুলছে সাদা ঠ্যাং। আর একবার তাকায় ফ্রিলগাঁথা রাতজামার ভিতর পাঞ্চালী সাধুখাঁ সুন্দরীকে । ডাকে, আয় কাছে আয়। আশি বসন্তের শীর্ণ হাত যুবতি পৃষ্ঠে বুলিয়ে হতভম্ব আপ্লুত পুরুষের ঢোক গিলতে সময়ের হেরফের হয়। কস বেয়ে মুখমধু গড়ায়। তৎপরতায় মুছে নিয়ে পৌরুষে ঘোষণা করে সিদ্ধান্ত,— পঞ্চাদার নাতনির কাছে আমি ভাড়া নিই না। তোরটা ফ্রি, নিচ্ছি শুধু তোর বরের পার্ট। বুঝলি? সেদিনের মত থেকে গেল কথা।

অসমাপ্ত এবং অসফল নিশিবিহার কান্ড নিয়ে কটাক্ষে যায় এক বৎসরের স্বামী প্রলয়।

তোমার বুকে টান লাগে না? স্বামীর রঙ্গকথার সঠিক লাইনে খেলতে পারে না পাঞ্চালী।

মানে?

আরে বুড়ো যখন পিঠে হাত বুলোয়।

ও! বুড়োদের মন সবসময়ে এক লাড্ডুর ভিয়েনে থাকে না।

ঠিক ত? ট্রাই করে দেখ!

কী ট্রাই করব?

কাছে না গিয়ে বল দাদু ভাড়া বাড়িয়ে দাও। দাদু গ্যারেজটা দিয়ে দাও ফ্রিতে।

বলব। এবার বাসা গ্যারেজ দুটোই নেব ফ্রিতে।

রাধারানি পাঞ্চালী আবার যায় একা। প্রলয়ানন্দ নির্দেশে নিশীথযাত্রা দুই। ক্যাসারোলে ধোঁয়া ওঠা মুরগির ঠ্যাং নয় । ভিন্ন এক জলীয়তার বার্তা নিয়ে সম্রাট আলাউদ্দিনের দোতলায় যায় চিতোরের মহারানী। তাই পোষাকেও আনুষ্ঠানিকতা । রাতজামা নয়, লালপেড়ে শাড়ি আর মস্ত সিঁদুর টিপের সতীসাজ। মুখের কথা বা শরীরছলনা নয় শুধু। সাজটাও প্রয়োজনীয় । যুদ্ধ জয়ের হাতিয়ার । বাহির শস্ত্র এবং কৌশল মিলিয়ে পাঞ্চালী তৈরি করে অন্তর সাজ। এবং আঘাত । সেখানে যেমন । ন্যায় অন্যায় শালীন অশালীন কিছু নেই। বুড়ো পুলিশও বলে দিয়েছে, দাদু নাতনি যেখানে নিয়ম নেই সেখানে।

শীত এবং হাওয়ার রাত যুগপৎ। শায়িত বৃদ্ধদেহে হংকং কম্বলের ওম ছাপিয়ে অস্পষ্ট

কাঁপুনি। অদৃষ্ট কম্পনকে আবৃত করার ভাবনা থেকেই সুরা ও সাকির দিব্যাস্ত্র বেছে নেয় প্রলয়সখি। পাঞ্চালী জানে বঙ্কী দাদু আর ফেলু খুড়োর বন্ধু মানুষকে বেআক্কেলে কথায় নয় বুদ্ধিদীপ্ত অস্ত্রেই বোকা বানাতে হয়ে।

দাদু ওমর খৈয়াম পড়েছ?

বিলক্ষণ পড়েছি দিদিভাই । ইংরেজি এবং বাংলা দুটো বিখ্যাত অনুবাদই।

কচু পড়েছ। পড়লে আর এমন ডবল কাঁথায় কাপতে না ঠকঠকিয়ে।

না রে, এখন আর চোখেও ভাল দেখতে পাই না।

তা হলে হাফ পড়।

হাফ পড়ব?

হ্যাঁ। সুরা ও সাকির অর্দ্ধেক। আঙুল সোডিয়াম ওক্সাইড মিশিয়ে বেলোয়ারি পাত্রে ঢেলে...

ঢেলে? তারপর? ফলের রসে বাড়তি ওম হয় বৃদ্ধকথায়।

তারপর আর কী, খোল ভেঙে বেরিয়ে পড়বে শঙ্খকুমার । বল হবে, যৌবন হবে।

হবে? তোর বর খায়?

পাঞ্চালীর পরিমিতি এখানেই । মুখে জবাব দেয় না। ভুবনমোহিনী হাসিতে জটিল করে দেয় বুড়োর মনোলোক। এবং সাফল্যের সঙ্গে বুট করে পাঞ্চালীর নিশিবিহার ড্রাইভে চাতুর্যের ফ্লপি। বৃদ্ধের প্রলম্বিত প্রশ্নে কর্কখোলার খুশি উপচায় নতুন ওয়ের ঠিকানায়। ডব্লু ডব্লু ডব্লু সুরা ডট কম।

কেনা হল অটোমোবাইল। পনের বছরের কিশোরী ফিয়াট । গাঁইতি মেরে সঞ্চয়ের পাহাড় ভাঙল পাঞ্চালী। পেটিকোটের চোরপকেটে ছিল তিন হল পাঁচ। প্রশিক্ষকের কোলে বসে শিখল স্টিয়ারিং ব্রেক ক্লাচ। শুরু হল লবণহ্রদে শিশুবাহন ব্যবসা। এক দুই তিন। তিন ট্রিপে অনেক। এক হাজার দু হাজার তিন হাজার মাসিক আয় একা চালিকার। গ্যারেজও হল ওমর খৈয়াম সূত্রে । এক পাঁইট স্কচের বোতলে। দাদু ভদ্রলোকের এক কথা, ছেলে ফিরলে ছেড়ে দিতে হবে। সহজ শর্ত । আবার ফ্রি ।

মিনি মাগনায় পেয়ে পেয়ে লোভ হয় গগনছোঁয়া । লোভের আর এক নাম লোপাট জানত না হ্যাংলা দম্পতি। বোকা বর বলে, চল কামরূপ কামিখ্যে যাই বশীকরণ কবজতাবিজ তন্ত্রমন্ত্র নিয়ে আসি। বপিরীতবুদ্ধির পত্নী বলে, না আমার মন্ত্র একটাই বুর্দ্ধিযস্য বাড়ি তস্য । বাড়ি আমাদের চাই। পাঞ্চালী বুদ্ধির উপগ্রহ ভূসমলয় কক্ষে স্থাপিত করে । বলে, দেখে নিও জয় আমাদের । ভাড়াটে নাতনি থেকে আইনি অস্তিত্বে লড়াইএ দাদুর ছেলেকে বাপ ডাকার অঙ্গীকার এবং জেহাদ ঘোষণা করে। পুরোদস্তুর জয়ের দিনে যেমন হয়। নিত্য নতুন চক্র রচিত হয় আগম নির্গম মার্গে। মূলাধার শেষচক্রব্যূহে বৃদ্ধ অভিমন্যুকে রথে আহ্বান করে পাঞ্চালী।

দাদু চল বেড়িয়ে আসি।

কোথায় যাবি, চল না।

বল না তুমি কোথায় যাবে।

তুইই বল। যেদিকে বলবি একডাকে বেরিয়ে যাব।

চল মুকুন্দপুর যাই।

সে কোথা?

বাইপাসের ধারেই। ভাল রাস্তা । নতুন বসত।

ভেড়ি বুজিয়ে বসত। গ্রাফ কাগজের জমি। চৌকো চৌকো খোপ। জলহাওয়া বন্ধদেশে নিয়ে মারবি নাকি?

ভুল খবর, ভুল শুনেছ, গেলেই দেখতে পাবে।

বাড়ি করবি?

করতে ত হবে এখানে আর কদিন?

ছেড়ে যাবি? বিরাশি বৃদ্ধের কণ্ঠে আবেগ ঝরানো পর্যন্ত ছিল ঢিলেঢালা। ফাতনায় টান পড়তেই টান টান। গ্রামবাসী জাগো । যেতে পারি কেন যাব?

থাকব যে তোমার ছেলে আছে না?

তাও ত কথা।

ছেলে ফিরলেও যাব না । বাবা ডেকে ফেলব । তাড়াতে পারবে?

পারবে রে পারবে। ও ছেলে সব পারে।

আবার পরিমিতি । থেমে যাওয়া। বিকেলে স্বামী ফিরলে বলে, ধাক্কা লাগাও । জ্বালানি ছাড়া গাড়ি মুকুন্দপুর যাবে না জেনেও আমড়াগাছি করে গেল নকল নাতনি। দাদু বুড়ো ঘরের বাইরে পা দেয় না ত যাবে অলীক ঠিকানায়! সব পারে ছেলের কথায় ওলটপালট হয়ে যায় রোষা পাঞ্চালীর। রাতে স্বামীকে বলে এ বাড়ি আমাদের।

সাধের বাড়ি বানাইল মোরে বৈরাগি। জোড়া মানুষের জীবনকে বিশুষ্ক বিষাদময় করে দিল এক লোভের বাড়ি। সব কিছু হারিয়ে এখন আকাশভাঙা অসহায়তায় নিমজ্জিত হয়ে আছে মাঠকোণে । পায়ের নিচের মাটিও চলে যাচ্ছে জলের নিচে। অঝোর একটা বর্ষণ হলে স্বামী স্ত্রীর মুখরক্ষা হয়। অকারণ জলবন্দী বসে থাকার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। শুকিয়ে যাওয়া তালু জিহ্বা এবং ভিতর মুখের শুষ্কতা থেকে রেহাই। এক কোষ জলে তৃষ্ণা নিবারণ দুজনের । পাঁচবৎসরের লোপাটবাড়িতে তাদের ছিল এক জলপরিশোধন যন্ত্র। ধারে কিনেছিল সন্তানকে জীবাণুমুক্ত জল খাওয়াবে বলে। হাপিস বাড়িতে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে বুড়ো নয় বেচে দিয়েছে। প্রলয় পাঞ্চালীর এতে কিছু যায় আসে না। ওদের ব্যবহারে ত লাগেনি জলযন্ত্র । কোন প্রয়োজনেই লাগেনি। এত প্রতিষেধক নিয়েও রক্ষা করতে পারে নি স্নেহের পুত্তলিকে।

মা গো যাই বলে চলে গেল লাবণি কন্যা । দুষ্টুমি করে অন্য মায়ের কোলে চলে গেল। জলশূন্য শরীরে চামচ জল ফিরিয়ে দিল রাত বারটায়। ভোররাতে আই ডি তে সূচজলও বিফলে গেল। লবণহ্রদের রাজকন্যা, পাঞ্চালী মায়ের এত তোড়জোড় রাজসূয় অনেক অশ্বশক্তির শকট যার বিদ্যারম্ভের প্রস্তুতিতে, চলে গেল অবোধ অবলা। পুলিশ দাদু বলত, এই নোনতা মেয়েটাই

আমার আসল দাদুভাই । বুড়ো যে নাম রেখেছিল লাবণি। পরিয়েছিল ডিবিয়ার্স হিবের বরণমালা। আই ডি যেতে পারল না অশক্ত শরীরে । সারারাত বারান্দায় জেগেই কাটিয়ে দিল।

সকালে সব শেষ করে যখন ফিরল নিঃস্ব দম্পতি , ঘটল এক অবাক কাণ্ড। নকল সম্পর্কের অনাত্মীয় পুলিসকে কাঁদতে দেখে মাতৃহৃদয়ের শোক বুকের ভিতরেই পাথর হয়ে গেল। হিমমানবী পাঞ্চালী কাঁদল না এক ফোঁটা।

পুলিশকে কাঁদতে দেখে মায়ের মনে সংশোধন প্রক্রিয়া শুরু হয়। দুই বৎসরেব ভুল এক নিমেষে শোধরাতে চায় প্রলয়বৌ। চোখেব জলে মমতাময় পুলিশ পুরুষ আর নির্মম কাঠুরিয়ার প্রভেদ বোঝার ক্ষমতা কোথায় সদ্য সন্তানহারার! সন্তানধন হাবিয়ে সত্যি বৈরাগ্য পাঞ্চালী লোভে । শখের টিনশকট চক্ষুশূল । বিকিয়ে দিল । গ্যারেজ গেল। হাজার বর্গফুট রাজপুরুষ পাড়ার বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে ওপরতলার ভেতর ঘরেও কিছু একটা হয় । বোবা পর্দাও অশ্রুজলে সিক্ত হয় । বলে — যেও না।

বুড়ো বলে — যাস না।

নাতনি বলে — যাব।

দাদু বলে— কোথায় যাবি ? বাড়ি ত তোদেব হয়নি মুকুন্দপুরে।

পাঞ্চালীর নিঃশ্বাস দীর্ঘ হয় শূন্যেব বাড়ি ফুৎকারে হাওয়া । বলে,— ওসব বাদ দাও।

দাদু কণ্ঠ আবার ভগ্নপ্রবণ, --- তোরা থাক দিদিভাই।

স্থির সিদ্ধান্ত নকল নাতনির। — তোমাব ছেলেকে লিখে দাও। এ বযসে আবএকা থেকো না।

এবার বৃদ্ধের নিশ্বাস দীর্ঘ--- আব ছেলে'

এমন ঝড়েও নড়ে না দুবৎসরের ভাড়াটিযা রমণী । বলে, --- যাব।

যাব বললেই যাওয়া হয় না। সময় থাকলে বেবিয়ে গেলে এমন জলমগ্ন ভোগান্তি হয় না। গৃহহারার হতাশা বুকে। চাতক তিয়াসা কণ্ঠে। এক বিন্দু জলের আকুতি। সে কি জানিত না। প্রলয়ও কি জানত না, এমন ঝড় উঠবে? জানলেও রোধ করার শক্তি ছিল না পতির। ছিল না বলেই বেপথু দুই খেলাঘুঁটির কেতরে পড়ে থাকাই হল পরিণতি। জলতৃষ্ণায় একচাল সরে স্ত্রীর পাশে যায় প্রলয়। বলে, জল দাও। তৃষ্ণার শান্তি পত্নিতেই আবার লগ্ন হয় প্রলয় । ওঠ গো সজনি! দাদু ভাবনা ভেবে আর লাভ নেই। বুড়োর ফোকলা গালে আর দাড়িও পাবে না। সব উপড়ে ফেলেছ পাঁচ বৎসরে। কী বুদ্ধি মাইরি তোমার । যার শিল যার নোড়া, ভালমানুষ তোমাকে ঘরভাড়া দিল সস্তায়, তারই দাঁতের গোড়া ভাঙার চক্রান্ত। এরোপ্লেন সুদ্ধ পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল মিয়া নওয়াজ। পারল না বলে তোমার দশা। ঘটিবাটি সুদ্ধ লোপাট! তখন চ্যারিটি করলে, বাঁচিয়ে দিলে। কৃতজ্ঞতা? বুড়ো কাঁদল বলে, রাত জাগল তোমার শোকে? তাই দয়া?

আসলে দয়া ফয়া নয়। পাঁচ বৎসর কেন পাঁচদিনও লাগাতার একরকম কাটাতে পারে না পাঞ্চালী। পর্বপর্বান্তরের খেলা না থাকলে কিসের জীবন। পাঞ্চালী কথার কথক ঠাকুরও এখানে,

এই দয়ার কথায় একটু বিভ্রান্ত । ঘরহীন বর বৌ দু বৎসরে বাস্তুদার হওয়ার পথে অনেকটা এগিয়েছে দাপটে। আড়াই বছরের মাথায় হল পাশা পালট । একতরফা থাকল না। ফিফটি ফিফটি। হাফটাইম পর্যন্ত যদি অনীত দীপেন্দু হয় দুরন্ত। পরের পর্বে মাঠ যে প্লেয়ারটিকে দেখল তার খেলার বয়স পেরিয়ে গেছে কবে। নামলে এখনও মাঠ রেফারি আর গ্যালারি জুড়ে আতঙ্ক। চিমা বল খেলোয়াড়ের নামে সতর্ক হতেই হয়।

আড়াই বৎসরের মাথায় জল বন্ধ হয়ে গেল। কেন গেল সে আগে পরের অনেক কথা। লাইন কেটে দিল বুড়ো। যতদিন থাকবে কষ্ট করতে হবে। মাটির নিচের জলাধার থেকে বালতি করে জল তোল। বাসন মাজ । কাপড় ধোও ।উঠান বাগানে মগ ঢেলে চান করতে পার। ওপর থেকে নয়নসুখ। শাড়ি জামা শরীরের সঙ্গে জলের লুকোচুরি, সারফেস টেনশন! দাদু, শরীর জলের কসরৎ না হয় দেখানো গেল একদিন। কিন্তু জীবন ছাড়া যে ঘর জীবন অচল। পাঞ্চালী ভেবেছিল অনেক রকমের বিকল্প। এক, জলাধারে আর্সেনিক মিশিয়ে দেওয়া। দুই, পাইপলাইনে বিদ্যুৎ পরিবহণ করে দেওয়া। বড় চূড়ান্ত এবং আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। এর থেকে ভাল পুলিশ ডেকে আনা। ঝুটঝামেলা অপছন্দ প্রলয়স্বামী বলে, কিছু করতে হবে না। যেমন বলা তেমন ফল। নিমজ্জিত অন্ধকার থেকে তৎপরতায় উঠে এল আলো আর জীবন । তালালাগানো মিটার ঘরে শর্ট সার্কিটের অন্তর্ঘাত থেকে রক্ষা পাওয়ার পথ একটাই। সেই শুরু । আক্রমণ আর রক্ষণের ধীরে চলার নীতি। আলোয় ফিরে পাঞ্চালী স্বামীকে বলে, হিসেব রাখ, বুড়োর শক্তি আর দুর্বলতা!

কৌশল হল বুড়োর শক্তি। যে শক্তি পাঞ্চালীর আছে প্রলয়ের নেই। সরাসরি জালে জড়িয়ে দেওয়ার শটশক্তি। জলকল বন্ধ হওয়ার আগে একবার সলতে পাকিয়ে রেখেছিল পুলিশ বুড়ো। পোস্টের গা ঘেঁষে বেরল দুরন্ত বলগোলা। বলল, বাইরে মারলাম। ছমাসের নোটিশ ছেলে আসবে বিদেশ ফেরত । ছেলে না হাতি! ভাড়াটিয়া উচ্ছেদের নোটিশ। পাঞ্চালী সব জেনেই বলে, আমার বাপ আসবে।

তিরাশি বুড়োর কানে সব সেঁধোয় না। বলে, ছেলে আমার বাপেরও বাপ, মানুষজন একদম সহ্য হয় না।

নাছোড়বান্দা নাতনি কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে । বাপ ডাকব।

বিরক্ত বৃদ্ধ বলে, ওসব মানবে না, সাহেবি কেতায় বাপদাদা নেই।

বাপের বাপের কথাফাঁকি দিয়ে গলে বেরয় ছেলের মেয়ে। ঠিকই ত বলেছে বাপ। বাপ ঠাকুর্দা দিয়ে কী হবে, মেয়ে নিয়ে সুখেই থাকবে আমার নতুন বাবা।

কসমসের পেলে গোলকিপার তরুণ বসুকে ভয় দেখিয়েছিল শুধু । বুড়ো খেলোয়াড় খেলবে নেমে নৈতিকতা নিয়ে মাথা ঘামায় না। বলে, না বাপু ওসব হবে না। সিঙ্গল মাল্ট। বাড়ি ছাড়ো।

গান্ধি মহারাজের নিদান শুনে পাঞ্চালী হেসেছিল। স্বামীকে বলেছিল, পাঁচ বৎসরের জন্য নিশ্চিন্ত। বুদ্ধির পত্নীমনে কী জানি কী আছে । তর্কশাস্ত্র আর অঙ্কের মোক্ষম মিশ্রণে মুগ্ধ করে সংশয়ী পতিকে। বলে, ভারত ছাড়ো আর বাড়ি ছাড়ো সমার্থক কথা। যে কোন ছাড়ো আন্দোলনের পর পাঁচ বৎসর দাপটে শাসন করা যায়। ইংরেজ যেমন করেছিল।

চতুর বুড়ো জলকল বন্ধ করল, বলল ছয়মাস। এসব কিছুই একদিনে হয় না। ভুল সলতে পাকানোর ফল। তাড়াহুড়োয় উরুত তেলএর বদলে জল মিশিয়েছিল পাঞ্চালী বিজয়িনী। বাড়ি হল গ্যারেজ হল ফ্রিতে। তাদের কী হল ? সবই ত ভাড়াটে শর্তে। বেওয়ারিশ বুড়োর সম্পত্তি চাই বলেই লোভ হয় গগনছোঁয়া। লোভের আর এক নাম লোপাট জানল না হ্যাংলা দম্পতি। দৃষ্টি চিকচিক পত্নী স্বামীকে বলে, দাদুর চতুরশীতি জন্মদিন হবে মহাধূমধাম। পাঞ্চালী বলে, বুড়োর শর্ত কাটা ওপড়াতে হবে। যে ছেলে বৃদ্ধ বাপ কাকিকে ফেলে পালায় সে কেন ফিরবে? ফেরা নিয়ে বাপেরই বা কিসের এত আদিখ্যেতা। তারা দুজনেই কেন হবে না উত্তরাধিকারী । বুড়োর ওভেনে কেক বানাল। আইসিং দিল শুভ জন্মদিনের বাংলায়। প্রলয় খিতমদগার কিনে আনল ক্যানিং স্ট্রীট থেকে বেলুন, গ্র্যাণ্ড হোটেল আর্কেড থেকে এক পিস মোটা চুরুট। পুরনো দিনের দারোগাদের দেখেছে মাথায় হ্যাট, মুখে চুরুট। খুশি হল বুড়ো। ধরতেও পারল না লুব্ধ মতির ঝিলিক । ভাবল মেয়ের জন্মদিনে দামী উপহার ডিবিয়ার্স প্যান্ডেন্টের প্রতিকৃতজ্ঞতা । মজাও হল। তৃতীয় প্রজন্মের স্বামী স্ত্রী গাইল হ্যাপি বার্থ ডে, লবণ হু দের কন্যা আধো, বোবা বৌ-এর অনুৎসাহ উপস্থিতি । প্রাক্তন গোয়েন্দা পুলিশ খুশি হলেই নাতনিকে ধাঁধার প্যাডকে দাঁড় করিয়ে দেয়। প্রতিবার জ্যাকপট জিতে জিতে দুঃসাহসী হয়ে ওঠা জকিনীও অপ্রতিরোধা। ভিনটেজ দারোগা দন্তে সিগারের সুখটান , কণ্ঠে যুগপৎ খুকখুক এবং ফাইনাল রাউন্ডের প্রশ্ন।

বলত দিদি তোর দাদুর কিসের নেশা ছিল?

কোন নেশাই ছিল না।

আর ইউ শিওর?

শিওর । তবে বাপির নেশায় ভাগ বসাত দাদু।

তোর বাপি মানে পজামাই? বুলার বর। তুই জানলিপঞ্চাদারকী করে? মনে আছে মেয়ে?

মনে থাকবে না? আমি তখন দশ বৎসর ।

বিজয়িনীর তখন খেয়াল নেই পাথরে হোঁচট না ঘাসে পা। পঞ্চানন গুহনিয়োগীর মৃত্যুপরবর্তী সংস্কর নে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনার বিবরণে কোন ভুল নেই ত? কন্যা জামাতা স্ত্রী সহ চারজনই নিহত। বেঁচে থাকল একমাত্র দৌহিত্রী। বয়স কত ছিল, দশ না দুই? নিজের জন্মদিনে কোথায় ফুর্তি করবে না বুড়োর ইন্টারোগেশন! এরপরেও একটা তেড়িয়া প্রশ্ন ছিল। সেখানেও সলতের কাপড়ে জল। চাকরি কলকাতায়, বাড়ি জব্বলপুর। পুলিশ কোয়ার্টারে কাটিয়েছে পঞ্চাদারোগা গোয়েন্দাজীবন? তাই নিরাপদ জবাব হল মধ্যপ্রদেশের শহর। ভিজে জবাবের প্রশ্নে ছিল তাদের বিবাহভূমি।

ফ্লপ শো জন্মরাত্রির এগারটায় স্বামীর প্রণয় ডাকে সাড়া দেয়নি লোভাতুরা পত্নী। গোয়েন্দা বৃদ্ধের জেরা ব্যবচ্ছেদে অসঙ্গতি মেরামত ভাবনায় শরীর ডাক উপেক্ষা করে । পত্নীর মন পড়ুয়া প্রলয়ও তখন এক একদম সঙ্গীতের অন্তরায় ঘুরপাক খাচ্ছে। দুজনের মিলিত ভাবনে অসঙ্গতি বেরল দুটো।

এক, প্রথম প্রশ্নের পর বক্সীদাদুর সহযোদ্ধা আর দিদিভাই যোগ করেনি ক্যুইজ প্রশ্নের শেষে।

দুই, পঞ্চাদারোগা আর পাঞ্চালী মিত্রর জীবন সংক্রান্ত তথ্যে কিছু স্থানকাল পাত্রের ভুল হয়েছে। এখন প্রশ্ন, অসঙ্গতিগুলো কী সাংঘাতিক না উপেক্ষণীয়? প্রমাদ ভয়ে পাঞ্চালী স্বামী মনে মনে আউড়ায় মুস্কিল আসান মন্ত্র, চন্দন চন্দন!

সঙ্গতি অসঙ্গতির লড়াই চলতে পারে বৃদ্ধে যুবতিতে। বাড়ি ছাড়ার নোটিশ দিতে পারে, কালক্ষেপ, আইনি লড়াই চলতেই পারে। তা বলে বিষয় সম্পত্তি উধাও করার মারাত্মক ঠাট্টা! প্রলয় জবাব চেয়েছিল পাঞ্চালীর কাছে। মৃত্যুমুখী বুড়োর রসিকতার মোক্ষম প্রত্যুত্তর। প্রাণপণ প্রয়োজনের সময়ই এক উপহারের মালায় জাদু করল তার প্রাণবন্ত পত্নীকে। হাল্লারাজার বোবা প্রজা হয়ে গেল পাঞ্চালী। এদিকে ক্ষণিক বর্ষণ চেটেপুটে খাওয়ার তৃষ্ণার শান্তি হয়ে এল জলের মাঠে। অভিশপ্ত নায়ক টেন্টেলাসের কণ্ঠ এতে সিক্ত হয় না। শুষ্ক কণ্ঠে প্রলয়ের অপার আক্রোশ। অথর্ব বৃদ্ধের এত শক্তি কী করে হয়। প্রলয় ভাবে শেষবারের মত একটা চমৎকার হোক। স্ত্রীশক্তি ফিরে পাক বলবুদ্ধি। পাঞ্চালী কথা বললে সব হয়। মেঘে জল। প্রকৃতিও নারীকে মান্য করে। লড়তে লড়তে একবার চ্যারিটি করল বলেই অ্যাডভান্টেজে চলে গেল বুড়ো। বেঁচে উঠল বলেই এত পরাক্রম। পাঞ্চালীর বলিহারি! দুম করে বলল, বাড়ি আমাদের। প্রলয় বলল মারবে নাকি বুড়োকে। নির্বিকার বলল, মেরেও ফেলতে পারি। বাগে পেয়েও মারলে না? কৃতজ্ঞতা? মেয়ের শোকে বুড়ো কাঁদল তাই? রাত জাগল মেয়ের জন্য? দয়া? এবার বোঝ ঠ্যালা দয়াময়ী। পুলিশ মিলিটারিকে ত চেন না। খাকি উর্দির কোন দয়াধর্ম নেই। কী জাঁদরেল রাষ্ট্রপ্রধান মিয়া সাহেব তাকেও ছুঁড়ে ফেলল বস্তিঘরে। পণ্ডিত শ্বশুর চিনতেন পুলিসকে। বলতেন স্বাধীনতা সংগ্রামের বড় শত্রু ছিল ওরা। পুলিশ দেখলেই শ্লোগান উঠত, বন্দেমাতরম, পুলিশের মাথা গরম। রক্তে আগুন লাগত। দয়াধর্মটর্ম না। মেয়েমানুষের সহজাত সেবাধর্মই কার্যকর হয়। ইলে তখন লড়াই-এর দিন। সিক্সমাছ্ বাড়ি ছাড়ো জলকল বন্ধ এর এতগুলো ধাপ পেরিয়ে পাঞ্চালী ডাইরেক্ট অ্যাকশনে। একা বিছানায় শুয়ে স্পষ্ট করে পঞ্চাদাদুর বন্ধুকে খেলায় ডাকে পাঞ্চালী। হাডুডুডু ভাইয়া। ছেলে তোমার নেই দাদু। থাকলেও তোমার বাড়িতে আসবে না। বাজি ধরতে পারি! রাতের সাথি প্রলয়কে বলে, তোমার হেল্প লাইন কোম্পানির উপহার সামগ্রী কী কী আছে বল ত?

সে অনেককিছু। টেবিল ক্লক, সিডি ক্যাসেট টাইটান হাতঘড়ি।

ব্যস ব্যস টাইটান একটা হলেই হবে।

হলেই হবে মানে? পয়সা লাগে।

লাগবে লাগবে। বৌকথার প্রয়োজনে অফিসের ঘড়ি একটা ঝেড়ে দেওয়া নিশ্চিত হয়।

আবার জন্মদিন? না বিবাহ বার্ষিকী? বৌ কোথায়? পাঞ্চালীর মাথায় কিছু একটা ছিল বিশেষ মিষ্টান্ন প্রক্রিয়ায়। নিচে আগুন ওপরে পাখার ব্যজন। তবে প্রলয় জানত দেওয়ালের পরে কোন এগোনোর রাস্তা নেই। তবু ঘড়ি হাতে বৌ বলল, দেখে নিও।

ছমাসের মাথায় কথামালার সুতো ছিঁড়ে যাওয়ার উপক্রম রোধ হল ভিন্ন উপায়ে। বাজার সিনেমার হঠাৎ ঘটনা। বাড়ি ছাড় নোটিশ বলবৎ হওয়ার অনেক আগেই বাটিচালান বন্ধ হয়ে গেছে ওপরতলায়। তাও উদরভঙ্গ প্রকোপে বুড়োবুড়ি অসুস্থ হয়। আর্তসেবায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ভাড়াটিয়া বৌ।

রাতের পর রাত জাগল। দুদিকে দুই লবণজলের বোতলের দিকে তাকিয়ে থেকে চোখের নিচে কালি পড়ল। বেঁচে গেল টিকটিকি বুড়ো। বোবা বৌকেও বাঁচিয়ে দিল পাঞ্চালী। আবার বাটি উঠল দোতলায়। মুরগির সাদা ঠ্যাং ক্যাসারোলে। সুক্তো স্টু আর আপেল লেবুতে দাদুর নাড়ি টনটনে হতেই বলল, আর ভাড়া নেব না।

বেড়াল দাদু বলছে মাছ খাব না। খালি গলায় বিষম খায় নাতনি। বলে, হঠাৎ?

হঠাৎ নয়, তুই এত করলি।

এত করলাম তোমার বাড়ি ভাড়া মুকুবের জন্য?

তাই বললাম? আসলে তোরা আর কতদিন থাকবি, এমনিতেই থাক না। তোদের বাড়িও ত প্রায় শেষ।

বিছানা ঘরে ফিরেই নকল জমিদার প্রলয়কে তাগাদা দেয় পাঞ্চালী। এবার কিছু ইটকাঠ সিমেন্ট কেনাকাটা শুরু কর। কেন, ব্যবসা হবে? গাড়ি ব্যবসা গেল তল এবার বিল্ডার্স? সল্টলেকে চলবে না। ম্যাডাম বলে, ব্যবসা নয় সত্যি সত্যি বাড়ি তৈরিতে লাগবে। জমি কোথা বেগম সাহেবা? পাঞ্চালী মহারানি অনেক চ্যানেল ভাবতে পারে একসঙ্গে। প্রলয় তাল রাখতে পারে না। দাবার ছকঘরের রিমোট সেন্সিং। সার্ফিং। ইজি নেভিগেশন। ইটসিমেন্টজমিহীন বাড়ির ঢেউএ দুলতে দুলতে গায় হাসন রাজার গান। লোকে বলে ঘরবাড়ি..........নাই আমার। ভালা শব্দ গানের ডটডট দিয়ে ইরেজ। আবার সংলাপ। জমি নেই ত কী হয়েছে? আবার গান। কী ঘর বানাইলাম আমি শূন্যের মাঝার? মুকুন্দপুর জমিটায় ভিত দিতে হবে।এ মাসেই। ওয়েবসাইট ডব্লু ডব্লু মুকুন্দপুরি বেগম ডট কম নির্গত ইনফো ধরা কর্ম নয় স্বামী সাবসক্রাইবার প্রলয় সহজবুদ্ধির। প্রলয় ব বোঝে না বুড়ো মরলেই যদি বাড়ির মালিক তবে রাতের পর রাত জেগে কেন যমদুয়ার থেকে ফিরিয়ে আনা। কেনই বা হঠাৎ নেই জমিতে ভিত দেওয়া। ঢাকাই শাড়ি কপালে সিঁদুর সাজে বুড়োকে একটিপ প্রণাম। বলে, অক্ষয়তৃতীয়া বলে আজই ভিতপুজো সেরে নিচ্ছি। মুকুন্দপুর পথেই বিজ্ঞাননগরী এবং যাত্রা ছেদ। সিড়িভাঙা অঙ্কের শেখ ধাপটা পরিষ্কার করল পাঞ্চালী দাড়িপথে। বলল, আমরা যেখানে ইচ্ছে যেতে পারি, দিস ইজ মাই সি এন এন। ছোটশূণ্যের আবাসে দুজন মিলে হাসল কিছুক্ষণ। চালাক বুড়োকে একটা গোল দেওয়া গেল। অলীক ভিতপূজার গল্পে ওর উচ্ছেদ অভিযান থামিয়ে দেওয়া গেল সাময়িক। ছুটি পাওয়া নটনটিরও আমোদ হল একদিনের। আতিশয্যে পাঞ্চালী একটা ভেংচি কাটল বিশাল প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীকে। এবং কাঁদলও অঝোরে হাউহাউ। মাতৃবক্ষের স্নেহক্ষুধা যে লুকিয়েছিল চাংপার গাছের চাঁপা হয়ে। লুকিয়েছিল মেঘ হয়ে। নির্মল শিশুরাজ্যের অকাল ঘর্ষণে ঝরঝরিয়ে ভেঙ্গে পড়ল অতিকায় ডাইনোসরের পায়ে। প্রমোদ উদ্যান ঘিরে এত শিশু পুষ্পের সমারোহ কখনও দেখেনি নাগরিকা। এত শিশু পুষ্পধনে তার একটি কী থাকতে পারত না? অবোধ প্রশুবাণে আপ্লুত করার সন্তানবাসনার দুঃখ ঘেরে পাঞ্চালীকে। রুদ্ধ সন্তাপবেদনা বৈশাখী ঝড়ে হয় চুরমার। মেঘজলের অনবরত ধারাবর্ষণে প্রলয়ের গহনমনও হয় সিক্ত। চিত্তদাহের সঞ্চয় ভাণ্ডার তারও কিছু কম না। স্ত্রীকে জড়িয়ে বাহিত আবেগে পিতৃহৃদয়ও কাঁদল অনেকক্ষণ।

সমাজবাস্তবের বাধ্যবাধকতায় কথাবয়নকে জলধারার মত বয়ে যেতে দেওয়া যায় না।

মায়াবাদী অশ্রুজলের কুহক ভেঙে তৎপরতায় বেরয় প্রলয়। সাময়িকতা কাটাতে প্রতাপী হয় নির্বিরোধী স্বামী। সত্যের মুখ ঢাকে হিরন্ময় পাত্রে। একমাত্রিক ঘেরাটোপ ভাঙে সাহসে।

পাথরচাপা হিমবালিকার জাড্য ভাঙতে বলে, কোথায় পাবে?

চামুণ্ডা মাতৃমূর্তি বলে, এত বড় শহর মাথা গোঁজার ঠাঁই কোথাও হয়ে যাবে।

ঠিক ঠিক। প্রলয় বলে ঠিক। শোকার্ত ক্লান্ত মহিলাকে বিশ্রামের সময় দেয়। দিনক্ষণ সময় গেঁথে সুতো ছাড়ে। দুঃখিত পত্নীকে বলে ঠিক আছে দেখছি, এক বৎসরের মধ্যে পেয়ে যাব কোথাও।

এক বৎসর অনেক দিন। তিনমাসেই পাঞ্চালী বুকের পাথর চুঁইয়ে জল গড়ায়। উপায় হয় এবং রফাও। রাতের প্রিয়া বদলে যায় দিনের ঘরণিতে। বলে, কেন ছাড়ব?

ঠিক।

বুড়োটাই কুচক্রী। এখন ঘর ভাঙার সিন নেই।

ঠিক।

বুড়ো পুলিশ একা থাকতে পারে না তাই ভাড়াটিয়া।

ঠিক।

আমরা ত জানতাম লবণহ্রদ আমাদের বাসস্থান নয়। বুড়োর প্ররোচনা ছিল বলেই আমরা গৃহস্থ।

ঠিক।

বিজ্ঞাপন দেখে বেড়াতে এসেছিলাম। স্রেফ ফাজলামি, একটু রগড় শেষে চলেই যেতাম কেমন জেরা করল।

ঠিক।

পেডিগ্রি দেখে কুকুর কেনার শখ? বুড়োকে প্রথম দেখেই মনে হয়েছে বজ্জাত। বৌকে বলে বৌদি।

ঠিক।

ছেলের গল্পটাও ধাপ্পা।

ঠিক।

প্রলয় মানুষে গুণপনার লেশমাত্র নেই সে তথ্যে সমৃদ্ধ পাঞ্চালী দেবী। ওদিকে প্রলয় জীবনেও স্তুতির যোগ্য একজনমাত্র মহাদেবী। পত্নীর তাচ্ছিল্যের ভয়ে সে অনেক কথা মুখ ফুটে বলে না। আরো কয়েকটি ঠিক তথ্য কথাও সে জানে। এবং জানে নিশ্চিত। এক, বুড়ো আসলে বুড়ো নয়। বয়স কিছুতেই আশি চুরাশি নয়, বড়জোর সত্তর। দুই, লোকটা পুলিশও নয়। পঞ্চানন গুহনিয়োগীর কথাকাহিনীও উদ্ভাবনে দুরন্ত। উল্টো ডালের বরফি। ভাড়াটে বৌ ধরার অস্ত্র। প্রথম বছরে ভালরও ভাল, দারুণ হনিমুন! দ্বিতীয় বছরে যেমন তেমন। তৃতীয়ে নরম গরম বিচ্ছেদ উচ্ছেদ। কাল্পনিক ছেলে ফেরার ভয়, পুলিশের ভয়, জলকলের ভয় এবং একমন্ত্র

বাড়ি ছাড়র হুমকি। শহুরে নাতনি এতে ভীত হয় না। বলে 'ভারত ছাড়'র ইতিহাস। বিয়াল্লিশের 'ভারত ছাড়'র পর পাঁচ বৎসর দাপটে শাসন করেছে ইংরেজ। আমরাও করব, থাকব।বুড়ো বলে, পুলিশকে ওসব রঙ্গকথার ইতিহাস শুনিও না, ভূগোল সুদ্ধ পাল্টে দেব। ভীতু এবং নির্গুণ স্বামী হয় সন্ত্রস্ত। মধ্যস্থতায় বলে, শান্তি শান্তি। বাদিপ্রতিবাদির মান্যতায় তিনমাসের সময় সম্প্রসারণ চুক্তি হয়। গুণহীন মানুষের মধ্যস্থতায় এরকম অনেক তিনের বাধা পেরিয়েছে বাসাহীন দুই গৃহস্থ। তবু বৌ তার বুদ্ধির তারিফ করে না। একেবারে গুণবুদ্ধি না থাকলে কী আর কাক ঠোকরানোর শহরে উড়ে এসে জুড়ে বসতে পারত প্রলয় নামগোত্রহীন!

এমন ছিল না বেলা। আশ্বিন আসতে তখনও তিন মাসের দেরি। বিদেশী ব্যাঙ্ক আর হেল্পলাইন কোমপানি তিনমাসের অস্থায়ী প্রতিনিধি করে উত্তরবঙ্গ ভ্রমণের প্রস্তাব দেয় ঠিকা কর্মচারিকে। শ্রাবণদিনের এমন প্রস্তাবে কেউ রাজি হয় না। প্রাক্তন গ্রামযুবক একবাক্যে রাজি। প্রলয় সাধুখাঁ যাবে শিলিগুড়ি স্থির হল কথা। স্বামীর মুখে শুনি সে কথা পাঞ্চালী আনন্দময়ীর আনন্দ আর ধরে না। বলে, চল যাই। আর ভাল লাগছে না থানা পুলিশ ঝগড়াঝাঁটি। প্রলয় বলে, লোকটাকে জানিয়ে যাওয়া ভাল। পাঞ্চালী বলে, কেন বলব? আমতা স্বামী বলে ঠিক।

সব ঠিক ঠিক থাকে না শেষ পর্যন্ত। পালটে গেল মতটা। পাঞ্চালী বলে, বলেএস তবে। শিলিগুড়ি নয় বলবে বিদেশ যাচ্ছ। স্টেটস

আমেরিকা।

ঠিক।

বুড়ো পুলিশ বলে, আচ্ছা।

তোমার ছেলেও ত থাকে বিদেশে। কোথায় থাকে দাদু?

আমেরিকা।

সে ত জানি। বলি কোথায় থাকে।

কোথায় আর থাকবে বারো নম্বর নয় ষোল নম্বর রাস্তায়। তোদের জন্যই ত ফিরতে পারছে না।

তার মানে আমেরিকায় থাকে না।

যেখানেই থাকুক তোমাদের কী। বাড়ি কবে ছাড়বে বলে যাও। এবার আর দারোগা বাপ এসে বাড়ি খালি করে দেবে।

তাই? দেখি তোমার কত ক্ষমতা।

পাঞ্চালী লেজে আগুন দিয়ে এল। প্রলয় ভাবে, এরকম অরক্ষিত দুর্গ তিনমাসের জন্য শত্রুর হাতে রেখে যাওয়া ঠিক হবে না। মানবী বোমা পাঞ্চালীকে বোঝাবে কে? তাই একা দৌত্যে যায় প্রলয়। ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে বুড়ো বাড়িওলাকে বলে,

শান্তি শান্তি!

কিসের শান্তি? আমার বাড়ি চাই আজই। বাড়ি দিয়ে তোমরা যাও জাহান্নমে?

তিন মাসের ত ব্যাপার দাদু। ফিরে এসেই ছেড়ে দেব।

সে ত দেখছি পাঁচ বছর থেকে।

এবার আর দেরি নয়। বাড়ি আমাদের রেডি। কারেন্ট এসে গেছে। প্লাস্টার হচ্ছে।

তা হলে ত হয়েই গেল । মালপত্র রেখে এসো।

তাই ত বলতে এলাম শালাকে বলে যাচ্ছি। রং হয়ে গেলে নিয়ে যাবে।

ভেরি গুড। একেবারে ম্যাটাডর ভ্যান নিয়ে আসতে বল ।

এত মাল সম্পত্তি ভ্যানে যাবে না, লরি নিয়ে আসতে বলেছি।

তা এত সব দায়িত্ব দিয়ে যাচ্ছ, আপন শালা ত?

ইয়েস বস।

নদী তিস্তা আর শহর শিলিগুড়ি মন ভাল করে দিল বদলী কর্মী প্রলয় সাধুখাঁর। পাঞ্চালীও খুশি, তবে বরফ চাঙড় একটা থাকলই বুকের ভিতর । সেসব ত শহুরে শৈত্যের স্থায়ী আমানত। ভাঙানোর উপায় নেই, সুদে বাড়ে। হোটেল তিস্তাপার এর নিরিবিলি এক অপার্থিব পরিবেশ রচনা করে স্বপ্নবিমুখ দম্পতির মনে। রেলগাড়ি আর পান্থশালার নদী জড়িত নামে তাদের মনচুরি হয়ে যায়। উত্তরবঙ্গের নদীনামে কালিদাস কালের সখ্য। শিপ্রা বেত্রবতীর গঙ্গাজল সখি তিস্তা তোর্ষা। মনোমোহিনী তটিনীপারে তাই অতীন্দ্রিয় হিয়া কম্পনে থরথর দুই বিলাসীবক্ষ। মনপবনের নাও চড়ে বেরয় প্রিয় সন্দর্শনে। অঙ্গে হংকং বাজারের পুষ্পাসব গন্ধবারি নবীন পরিচ্ছদ । হিমালয় কন্যা তটিনীর উচ্ছলতায় হিমরমণী পাঞ্চালীর শীতে ওম লাগে। পঞ্চবর্ষ প্রাচীন অভিসারিকানবীন সাজে সমর্পণে হয় সম্পূর্ণা। স্বামীকে জানায়।

এখানে জীবন কেমন আলাদা।

হঁ।

নদীর পারের জীবন ত।

হুঁ।

এখানে সব কেমন মনের মত।

হুঁ।

এখানে কোন প্রতিকুলতা নেই।

হুঁ।

এখানে সব সহজ সরল।

আর ওখানে ? সব গরল?

ওখানে শুধু যুদ্ধ। জঙ্গী তৎপরতা। মাইন রকেট লঞ্চার ডালের বরফি।

ভাল দিকও আছে সোনা ।

কিসের ভাল?

ওখানেও আলাদা জীবন আছে ওখানেই মনের অনুকূল পরিবেশ আছে।

আছে আছে । সব আছে জানি।

তবে?

বুড়ো পুলিশচাকে আমি সহ্য করতে পারি না।

মীনুষটাত খারাপ ছিল না।

ছিল । বেওয়ারিশ একটা মানুষের এত সম্পত্তি কেন থাকবে । আমার সঙ্গে ইন্টুচারের একটা লোক। কিসের এত লড়াই? ছেলের ভয় দেখায়। ওখানে আর ফিরে যাব না।

কোথায় থাকবে?

এখানে ।

খাবে কী?

কচু।

চিকমিক নদী বালুকা আর জ্যোৎস্নালাকে রেজতবর্ণা নদীজলে হয় অভিসার রজনীর কলয়িত উন্মোচন। জলের মহিমায় হয় সংলাপের অল্পবিরাম। কণ্ঠলগ্না প্রিয়তমা আবার শুধায় আনন্দধন স্বামীকে।

তোমার চাকরি এখানে স্থায়ী হয় না?

হয়।

একটা সত্যিসত্যি বাড়ি করা যায় না?

যায় ।

এমন নদীর পারে, যখন ইচ্ছে ধরে আনার জ্যোৎস্নাকে পাওয়া যায় সারারাত।

যায়।

এমন পিরীতি রীতির পরিমিতি দিয়েই রচিত হয় কুমার সম্ভব আবার। রাতের কথামালা মলিন হতে দেয় না প্রলয় সাধুখাঁর দিবস অধীশ্বরী। প্রাতের দেবী নিশিসএ ধরিয়ে দেয় হেসে।

এখানে জমির দাম কম, তাই না গো?

লবণহ্রদের তুলনায় কম বটে। দেখব চেষ্টা করে?

এখনই?

নয় কেন?

না এখন না।

তবে কখন?

বুড়ো পুলিশের ইসকুরুপ টাইট না করে নড়ব না আমি।

পুলিশ বুড়োর চিত্তে এখন খুশির নৃত্য। রোদনভরা আকাশ আর সিক্ত বসুন্ধরার গোঁসা গোঁসা যুগলবন্দির সুখী দর্শক। রোদের কোলে মেঘের খেলা টাপুর-টুপুর বৃষ্টি। এদিকে মাঠের

ভিতর খোলা হাওয়া আর অন্তর্বাসভেদী ঝমঝম। এসব দেখা হয় না বুড়োর । দুঃখের বারিধারার মধ্যেও প্রলয়ের তির্যক চোখে ঢোক গেলার পরিতৃপ্তি। পাঁচ বৎসর প্রাচীন স্ত্রীর শরীর জল এখনও লোভনীয়। চোখের শান্তি আরাম দিয়ে তৃষ্ণা মেটে না। হামুখ বৃষ্টিজলে কণ্ঠের শুষ্কতা বাড়ে । শরৎবন্যার ভাসান আর কতক্ষণ প্রলয় পাঞ্চালীর পায়ের কাছে থেমে থাকবে কে জানে । বুড়ো ত বিসর্জন দিয়েছে কোন সকালে । কলা বউ সাজার আগেই। ইসকুরুপ ঢিলে করে দিয়েছে। তারপর থেকে বেনো মাঠে দুজন নির্বাসি। যা স্বাভাবি ় তাই ঘটে। শেষপাতার চমকে বুড়োর হঠাৎ মৃত্যু এবং পাঞ্চালীর লবণহ্রদ অধীশ্বরী হওয়া হয় না। পাঁচ বৎসরের পাঞ্চালী কথার কালো কালো অক্ষরগুলি সব বিপক্ষেই যায়। সহানুভূতির চোরা হাওয়াও মাঠে মারা গেল। তিস্তাপারের নতুন প্রস্তাবনাও তলিয়ে গেল অকাল বন্যায় । ইসকুরুপের কথাও কথার কথা । হাজার হোক পানার নিচের মন্দকারী জলস্বাভাব নয় পাঞ্চালীর । লোভের সাময়িক প্রবৃত্তি তাড়া না কালে পাঞ্চালীর সব ভাল। পাঞ্চালীর মমতা ভাল পাঞ্চালীর স্বামী সোহাগ ভাল। মা পাঞ্চালীর মাতৃত্বের কারণেই ত নবমীদশা!

লাল হলুদ সুতোয় গাঁথা মালাটা ! ডিবিয়ার্স প্যানডেন্ট । ওটা ছিল ভিতর লকারে । বুড়ো বলল তাকের উপর পড়ে ছিল। ঘটা করে দিল পাঞ্চালীকে । টিকটিকি বুদ্ধি দিয়ে মোহতিমিরে ডুবিয়ে দিল মাতৃহৃদয়। প্রতিরোধের সব পথ বন্ধ করে দিল শুরুতেই।

তিস্তাপারে পরিবর্তিত পাঞ্চালী মুখে যতই ইসকুরুপের কথা বলুক, শান্তির মানত করে ফিরেছিল হ্রদ নগরে। প্রলয়কে নিশ্চিন্ত করতে বলেছিল পটিয়ে নেব, ভেবনা । বুড়ো পুলিশের বিদ্রূপ ও তাচ্ছিল্য প্রলয়ের মনটা বিষিয়ে দিয়েছিল। শালার প্রতিবেদনে একটু ভুলচুক ছিল। বই পুলিশের একটা ছাড়া যে নাতি নাতনি নেই। বোকামির কথা পাঞ্চালীকে বলেনি শুরুতে । শেষ পর্যন্ত সেই গৃহিণী সখিই তার মনোভার লাঘব করল। বলল, নরম নরম হয়ে জড়িয়ে ধরব। বলব, সব ভুলে যাও দাদু। স্টু করে খাওয়াব, তেল কৈ রেঁধে দেব। ফোকলা দাঁতে খাওয়ার কচুপোড়াও দেব। অনেক দিন পর খুশির কচুপোড়া খেয়ে উচ্ছল হয়েছিল স্বামীস্ত্রী। জীবনের বীজক্ষেত নতুন করে উর্বর হয়েছিল। ভাঙা বুকের পাঁজর দিয়ে নতুন জীবন গড়ার শপথ। নদীর সখ্যে জীবনমুখি স্বপ্ন দেখেছিল বেদুইন দম্পতি।

পাঁচ বছরের ভুলে যাওয়া পূর্বাশ্রম মনে পড়ে দুলালবালা দুলালীর। আবেগের আতিশয্য হয়। শিলিগুলি হংকং বাজার কেনাকাটার স্বর্গরাজ্য হলই বা। মনের দুঃখ মনেই থাক। স্নেহময় পিতা দুর্বাসা আর জননী যে পিতার সহধর্মিণী । বুকে ঝাঁপানোর বাবা কিংবা মাগোও কিনে নেওয়া যাবে না। নরুন কেনা হল বিকল্পে। দাদুর জন্য আবার চুরুট দুপিস। পাঞ্চালী বলল, স্টেটস থেকে কন্টিনেন্ট যাওয়ার ফাঁকে হাভানায় একদিনের স্টপওভারে কেনা বলবে।

বলা আর হল কোথায়। ব্যাগের কোনে বেশ শুকনোই আছে গুপ্তধন। একটু প্রেম দিয়ে এলে হত। বুড়োর মনটাকে একটু ভিজিয়ে রাখা যেত। আহারে এতদূর থেকে মনে করে এনেছে। ফিরিয়েও দিতে পারত তাদের সম্পত্তি। জলের বদলে ধোঁয়া দিয়ে তৃষ্ণা নিবারণের আর একটা বিফল চেষ্টা করল প্রলয় । পারল না, তামাক কাঠি টানার কোন রহস্য আছে, যা প্রলয় জানে না। জলেই গেল পঞ্চাশ টাকার অর্দ্ধেক । তাদের ঘটিবাটি বিপ্লবের নায়ক ত কেমন দক্ষ কৌশলে নিঃশব্দ ধোঁয়া ওড়ায় পরিতৃপ্তিতে । পাঞ্চালী পারত, একটু মমতায় আদরে বুড়োকে কাত করে

দুর্যোগ দিনে থাকার ব্যবস্থাটা করতে পারত। মোক্ষম সময়ে হিরের মালাটা দেখিয়ে পাঞ্চালীর মাতৃবক্ষে আবার পাথর চাপা দিল। বুড়োর হঠাৎ টুসকি সইতে পারল না বৌ। সপ্রতিভতা নষ্ট হল। বুড়োর টুঁটি টিপে ধরে বলতে পারল না, ফিরিয়ে দাও আমাদের সম্পদ । দুর্দম সাহসী তার বৌ হঠাৎ কোন ভয়ে নির্বাক হয়ে গেল? কিসের ভয় তার? নেংটোর নেই বাটপাড়ের ভয়। শূন্যে শুরু করেছিল বসত, শূন্যেই ত শেষ হল । তা বলে লড়বে না। অন্যায় যুদ্ধে জয়ী হয়ে যাবে এক বুড়ো ধৃতরাষ্ট্র। তালা লিভারের নয়ছয় করে সব কেড়ে নিল বৃদ্ধ পুলিশ। গোদরেজ ছয় লিভারের প্যাড লক লাগিয়েছিল তারা দরজায়। ফিরতে না ফিরতেই ট্রান্সপ্লানট হয়ে গেল নায়ার নয় লিভারে । বলল সব মাল উঠিয়ে নিয়ে গেছে প্রলয় শালা। প্রলয় মানবে কেন, এত সহজেই কী সাফ হয়? সাফ করা যায় ? তালাঘরের পিছনে ছিল তাদের অনেক তিল । তিল জমিয়ে তাল।

কত কী করেছিল পাঁচ বছরে! কিনেছিল প্রতিবেশীর ঈর্ষা, ওয়ান টু ওয়ান টু, দি কুলেস্ট ওয়ান, জিরো ব্যাক্টিরিয়া জলযন্ত্র। মেরে জীবনসাথি স্টোরওয়েলের ভিতর প্রলয় সম্পদ নেই তেমন কিছু । একটা রেমণ্ডস স্যুট। সেণ্ডেস সেলএ কেনা। আর কিছু জামা পাজামা। পাঞ্চালীর আছে থরে থরে সাজান কাতান কাঞ্জিভরম কাঁথা বালুচরী সালোয়ার কুর্তা। প্রলয় জানে শাড়ির ভাঁজে অনেক চোরকাঁটাও আছে। সঞ্চয়ের অর্থ কিছু ব্যাঙ্কে রাখা নেই। সব চোরকাঁটার বিপজ্জনব ফিক্সড ডিপজিট। আর ভিতর লকারে পাঞ্চালীর ঠাকুরঘর। সোনার কাঠি। রূপার কাঠি। পাঞ্চালীর প্রাণের নির্যাস। ঐ একটা চাবি পাঞ্চালী কখনও হাতছাড়া করে না। আর বুড়ো বলল, তাকের উপরে পড়ে ছিল ।লাল হলুদ সুতোয় গাঁথা হিরের মালা। প্রাণের পুত্তলি লাবণি কন্যার সব স্মৃতি। দিনে একবার করে হিমানী সম্প্রসপাত ঘটত খোলা লকাররে। বুকের হিম কিছু আলমারির প্রকোষ্ঠে কিছু তার বুকে জমিয়ে রেখেছে পাঞ্চালী। সেই তার প্রাণপ্রতিমা নিয়ে এমনে নিষ্ঠুর মিথ্যে বলল বুড়ো। বিবশ পাঞ্চালীর সব প্রতিরোধের পথ বন্ধ হয়ে গেল। প্রতিবাদিনী পাঞ্চালীকে বুড়ো যুগপৎ মূক ও বধির করে দিল এক স্মৃতির প্রতীক দুলিয়ে ।আসল কথা, মাতৃহৃদয়ের অসহায়তা দিয়ে কথা প্রবন্ধের গতি রুদ্ধ করে দেওয়া হল । সরল হল না। মনস্বিনী পাঞ্চালীকথা বোঝাব সাধ্য নয় উপস্থিত কুশীলবদের । পাঁচ বৎসরের পাঞ্চালী মনের সর্বক্ষণের সঙ্গী প্রলয়ই তার তালগোলের হদিশ পায় না। তবে এটকু বুঝতে পারে কাদাজলের এই বারুণি ব্রতে সিদ্ধি একটা আছে নিশ্চিত । প্রলয় জানে এ রূপান্তরের অর্থ নয় কোন সর্বনাশা প্রকল্প। উত্তরবঙ্গের নদী পাঞ্চালীর কানে যে বার্তা দিয়েছে তাতে নেই খালজলের আবর্জনা। নদী তিস্তার বহমান স্বচ্ছতাই তাই পাঞ্চালীকে আপাত নির্বাক করে দিল। বুড়ো পুলিশ দিয়েছিল হিরের মালা, আবার দিল আলমারির লকার ভেঙে । ভয় পেয়েছিল মুখরা পাঞ্চালীকে। বাসা ভর্তি মাল হাপিস করে দিলেই হল! এমনি ছেড়ে দেবে ভাড়াটিয়া নাতনি। একটা মাত্র ভুল করেছিল প্রলয়, শালার অস্ত্র তুলে দিয়েছিল বুড়োর কানে। ব্যস, অলীক শালা এসে খুলে দিল চাবি আর বোঝাই সম্পদ ছুটল হাইওয়ে দিয়ে । ই এম বাইপাস। লরি বোঝাই মাল ছুটল মুকুন্দপুর। মিথ্যের লরিপথ দিয়ে ছুটল পঞ্চবার্ষিক কথা গোলের ফ্যান্টাসি। তিস্তা ফেরত রমণীকে লাল হলুদ সূত্রে বিবশ করার বার্তা দিল নির্মম কথক। সব মাল হাপিস হল। বুড়ো বলল হিরের মালা বেঁচে থাকল তাকের উপর ।এমন দয়া । মায়ের মনের চারপাশে সাময়িক তালা লাগাতে ছলনার আশ্রয় নিল বৃদ্ধ।

বুড়ো ভাবল, জিতে গেল। ভুল প্রলয় জানে ভুল। ভুল খেলায় মেতেছিল পাঞ্চালী। শুদ্ধতায় ফেরার প্রস্তুতিতে তার এ মৌনতা? পূর্ণনির্মাণ প্রস্তুতি। হিরের মালায় কিছু নেই, জানে পাঞ্চালী। নিষ্প্রাণ পাথরের সমাহারে কিছুই থাকতে পারে না। আরো ছিল তার পার্থিব সম্পদ। হারানো সন্তানের টুকিটাকি স্মৃতি। সেসবও কেড়ে নিল পুলিশ। পাঞ্চালীর মনপড়ুয়া স্বামী প্রলয়ের হাত থেকে ব্যর্থ চুরুট ছিটকে গেল পোস্টের ভিতর। নিখুঁত লক্ষ্যভেদের পর আবারও নিশ্চিত হল তার সিদ্ধান্তে। বুড়ো পুলিশকে জিতিয়ে দেওয়ার জন্য নয়। অন্য এক আরম্ভের জন্য এই সাংকেতিক বিরাম।

পিতারে করিয়া বশ কন্যার হৃদয়ে প্রবেশ কৌশল। দুলাল বালার শিষ্য প্রলয় সাধুখাঁর সাহিত্য পাঠও এই কারণে। দাঁড়ি ছেদ শব্দের কর্ণাভিরাম বিকল্পে বিরাম ব্যবহার শিখিয়েছিলেন সাহিত্যের শিক্ষক। বিরাম কথায় আবার আরম্ভের ইঙ্গিত থাকে স্পষ্ট। মৌন পাঞ্চালীকে নিয়ে বানভাসি প্রান্তরেও ঋষি পুরুষের তত্ত্বকথা মিলিয়ে নিচ্ছে। হিরের মালার প্রতীকও এক নবরূপক। মণিঘর ভেঙে বের করে দেওয়া মালাকে আসলে নতুন করে দেখল পাঞ্চালী। নতুন করে ভাবল। সব কিছু হয়ত নতুন করে সাজাতে লেগেছে। বুড়ো বাড়িওয়ালা, হারানো কন্যা লাবণি, পতি প্রলয়, এমনকী নিজেকেও। নতুন করে দেখা, পুনঃদেখা। দুলালবালা শ্বশুর শিখিয়েছিলেন গ্রন্থপাঠের ফিরে দেখা। পুনঃপাঠ। প্রথমপাঠ আর ফিরে পাঠে সময়ের গহ্বর থেকে উঠে আসে এক নবনির্মাণ। চেতনার রূপান্তর হয়, হয় পুণর্গঠন। পার্থিব সম্পদহারা মাতৃহৃদয়ের রূপান্তর দেখে মিলিয়ে নেয় বহু ভাবনা সঙ্গতির নবগঠন। লাল হলুদ সুতোয় বাঁধা জাগতিক একটা ভূষণের কেরামতি। চেতনার পুনর্বাসন।

যাক যা গেছে তা যাক ভাবার মত উদার পুরুষ নয় প্রলয়। এত সহজ! শুধু স্ত্রীর উপর তত্ত্বের প্রয়োগ হবে, পুরুষের কোন রূপান্তর হবে না। স্ত্রী ধনে ধনী হয়ে শূন্যের চক্রে ঘুরপাক ত অনেক হল। ঘোর কাটিয়ে পাঞ্চালীকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে যুক্তিবুদ্ধির স্বাভাবিক পথে। বুড়ো বাড়ি মালিককেও বুঝতে হবে ভাড়াটিয়া উচ্ছেদের আইনগত রীতিপদ্ধতি। মানুষের সংসার লোপাট করার এমন শক্তিমান হতে পারে না এক অশীতিপর বৃদ্ধ। পাঞ্চালী ইচ্ছে করলেই সব ফিরে পায়। সব আছে তার পাশে। পুলিশ আছে সমাজ আছে আইন আছে। আছে তার নিজস্ব সংগঠন, তার নিজস্ব পুরুষ। যার প্রতাপ নিষ্ক্রিয় করে রেখেছে পাঁচ বছরের শাসনে।

দুই পহরের মাঠে ঝমঝম ঝমঝমিয়ে বর্ষণ হয় মুখর। জল বাড়ে। দুই ঝোলা বুচকা দুজনের হাতে কাঁধে। সব সিক্ত। শরীর মনও সিক্ত হয় বিষণ্ণ জলপ্রবাহে। প্রলয় হাতে হাত তুলে নেয় স্ত্রীর। বলে চল। চোখে চোখ। তাকায় দুজনে। জটিল কিছু ভাব বিনিময় হয়। শুরু হয় চলা সপসপিয়ে। জলে।

জলের বৃদ্ধি। বৃষ্টির সঙ্গে এক পরিচিত বেদনার রাগিনী মন ছুঁয়ে যায় রিক্ত যুবক যুবতির। একে অন্যকে আকর্ষণ করে। রমণী চোখে এক বিন্দু জল। বরফ জমতে জল বরফ গলতেও জল। বিরাম শেষে শুরুর প্রস্তুতি জলের প্রবাহে।

মেঘবর্ণ রাজপথ ওঠে সেতুর ডপর। সেতুর ডপর সংলাপে মোনতা ভাঙে মানবী।

এখানে একটা খাল ছিল না ?

আছে ঐ নিচে। পতিতোদ্ধারিণী।

মুঠো করা রমনী মুষ্ঠি ওঠে ওপরে । নামে খালের জলে। লাল হলুদ সূতোয় বাঁধা হিরের মালা তলিয়ে যায় সাংকেতিক অতলে। দৃশ্যান্তর লবণহ্রদের সীমানা থেকে বের করে দেয় নির্বাস দম্পতিকে।

(অপ্রকাশিত)

বোকা কাশীরাম কথা

পঞ্চাশ পেরনোর পর বিভাসের ইচ্ছে হল একটা গল্প লেখার। আসলে বয়সের পঞ্চাশ নয় বিবাহের পঁচিশটাই তাকে উদ্বুদ্ধ করল। উত্তেজনা নেই, রোমহর্ষণ নেই এ কেমন রজতজয়ন্তীর জীবন। গল্প চাই, গল্প না থাকলে জীবনের জুত হয় না। বিভাসের মনে কথা সাজানোর অনেক উপাদান ছিল। কথা ছিল অনেক যা কাউকে বলা হল না। মনের ভিতর টগবগানো উত্তেজনা মনেই ফিনিস। ভূমিকম্প বিস্ফোরণ জলোচ্ছ্বাস কিছুই নেই নীরব উপত্যকায়। মেট্রো যেমন দমদম থেকে টালিগঞ্জ, বিভাসেরও তেমন সরলরেখার জীবন। স্ট্রেট পঁচিশ বছর ডিগ এন্ড কভার। ব্যর্থতার কোন দুঃখও তার মধ্যে নেই। ভি ভি সফল মানুষের যেমন হয় কল্পনার চূড়ো থেকে অনেক ওপরে উঠেছে। ডজ ড্রিবল লম্বা পাস হেড-এ গোল দিয়ে নক আউট পর্যায়ে টিকে টিকে টপে। শিক্ষক বাস্তুকারের খ্যাতি দেশের বাইরেও আছে। তবে খ্যাতিকে এমন কোন ঘোড়ার ডিম ভাবে নি বিভাস যে টেবিল টপে সাজিয়ে রাখতে হবে। খ্যাত পুরুষ শ্রীকৃষ্ণও দুঃখ করে বলেছিলেন বনে বনে বাঁশি বাজানোর চাকরিটা যদি পাওয়া যেত ফিরে। ত মানুষটার জীবনে গল্প ছিল পরতে পরতে। খেলতে জানত খেলাতেও পারত। চিমা বাইচুংদের মত নয়, শুধু এঁকেবেঁকে ছুটলেই হল না। গল্পের ভিতর থাকতে হলে আরো কিছু চাই, কান কামড়ানো সেমসাইড বাইসিকল কিক ভগবানের হাতের গোল থেকে ডোপিং বেটিং সিনেমা নায়িকা বা সাবান সুন্দরীর প্রেম, দর্শক পেটাতে গ্যালারিতে উঠে যাওয়া পাশাপাশি মাদারের আশীর্বাদ নিয়েই না গল্প! সিঙ্গল এবিলিটি মানুষরা এখন আর গল্পে আসে না। অল ইন ওয়ান, অলরাউন্ডার না হলে গল্পের এগার থেকে বাতিল। এখন আর কেউ নিশীথ সাধু অমর পাল বা অশোকতরু হয় না, সব স্বর সব সুর বিচরণে পারঙ্গম জীবনমুখি হলেই হিরো। আমি খাই তুমি খাই সকলেই খেয়ে দেয়ে থমকে থাক থার্টি প্লাস। গল্পেও সোজা পথে চলার মানুষরা আসে না। গল্পের পাকদন্ডিতে থাকে চড়াই উৎরাই ডেঞ্জার ইউটার্ন খাদ দুর্ঘটনা হাসপাতাল। থাকে সেবিকা রজনীগন্ধা দ্রুত আরোগ্য কামনা থাকে প্রেম। প্রেমের হাফসোল। সাউর সুইট রেসিপি।

বিভাসের জীবনে কী ওসব আছে? সুখি মানুষের সানন্দ জীবন। তার তরফের আদুরে মেয়েটা সাহেব বাঁদরের গলায় মালা দেওয়ায় মনের ভিতর একটা কাঁটা বেঁধে। তবে কাঁটায়ও ত রকমফের আছে, শিংমাছের কাঁটা নয় প্রিয় ছাত্র কাম জামাই। না বেঁধা গোলাপের কাঁটা হয়ে বেশ একটা বিঁধবে বিঁধবে ভাব মন্দ ছিল না। ছোট্ট একটা খিঁচ, এসব নিয়ে গল্প হয়

না। উপকাহিনী। মূল কথার পরিপূরক শুধু। টিয়া রিচার্ড তার অপছন্দের জুটিও নয়। অপছন্দের কারণ ভিন্ন, নবীন বয়সে সাধ আহ্লাদ ছেড়ে সঙ সাজায় আপত্তি। সঙের মজা, জীবন নিয়ে টেম্পরারি নাটক। নইলে তার মনের মত মেয়ে মনের ফ্রেমে অবিকল আধাআধি জুড়ে আছে। জন্মের পরই ভাগ হয়ে গেল যে। ছোটটি তার। ডাক্তার বলেছে তাই টিয়া ছোট নইলে উল্টোপক্ষের বড়টিকেই ছোট মনে হয়। বড় কেয়া তার মার মতো মাস্টারনি, সবকিছু লাগাম বাঁধা, নির্ভুল প্রোগ্রামিং এ ওঠা-বসা কথা বলা। তার ভাগেরটি যদি হয় উর্মিমুখর সমুদ্র তো ঐ তরফেরটি ধ্যানগম্ভীর গিরিরানি। এই বাপেরই ত মেয়ে। বিভাস জানে কেয়ার মধ্যেও একটা সুপ্ত আগ্নেয়গিরি রয়েছে। মার ভাগে পড়ে আপাতত বন্ধ রেখেছে অগ্নুৎপাত।

চার সদস্যের অনুমোদন সাপেক্ষ পারিবারিক সিদ্ধান্তের শেষ গোলটেবিলে গোল বেঁধেছিল তাদের। রিচার্ডকে নিয়ে। যদিও শেষ পর্যন্ত স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্যের অনুমোদন করিয়ে নেয় ছোট বোনের জন্য বড়কি। বহেস, তর্কবিতর্ক স্থায়ী ছিল অনেকক্ষণ। জামাইএর গাত্রবর্ণ অপছন্দ টিয়ার মার, দীর্ঘদেহ নিয়ে গর্ব রঙ ও রেখার বিন্যাসে গল্পের বীজ কি? পূরবী দীর্ঘাঙ্গী বিভাস মাঝারি। পূরবী গৌরাঙ্গী বিভাস জেটকালো না হলেও ফর্সা নয়। একটু জটিল হয়ত পূরবীর চলন এখানে। তবে রঙের বৈপরীত্য বা তানের হ্রস্বদীর্ঘতায় মূল বন্দিশে কোন বেতাল হয় নি কখনও। মীড় গমকে কোন খাদ ছিল না। আর মেয়ে দুটিতো জুড়ির তার, মা বাপের পছন্দ হলেই হল। পাশ, পাশ।

কথায় কথা বাড়ে, অল্পে হয় না গল্পকথার সাজ। কবি অসিধারা বসুকে জানাল কথার পিঠে কথা দিয়ে পৃথিবীর ছিয়াশিটি দেশে বসবাসের অভিজ্ঞতা আছে তার। দশ বারটা বাড়িয়ে দিল হয়তো, বিখ্যাত কবি সাহিত্যের এলেবেলেকে গুরুত্ব ত দিল। বলল, আপনি একটা উপন্যাস লিখুন এবার, এত অভিজ্ঞতা! অভিজ্ঞতা ত অবশ্যই, চাকরিসূত্রে অনেক দেশে, শিক্ষকতা শুধু জাপান আমেরিকা। বাস্তুকারের চাকরি থেকে প্রাচ্যবিদ, কী করে যে এত নাম হল! এলেম ছিল নিশ্চিত। স্থপতিকে বিদেশে গিয়ে দিতে হয় বক্তৃতা। তার প্রিয় বিষয় স্থাপত্যে প্রাচ্য। এই সেদিন ফিলাডেলফিয়ার রিচার্ড যুবকের রিপিট নোট নেওয়ায় বিরক্ত হল। জামাই হল। সাধু হল। অনেক রকম যৌবনের দূত ছিল পাঠচক্রে, দীর্ঘাঙ্গ সব ঘোর কৃষ্ণ ও অতি গৌর। রহস্যময় প্রাচ্যের জমজমাট এবং সহজিয়া বিষয় নিয়ে তৈরি লিখিত প্রতিবেদনের সঙ্গে শব্দ মধ্যবর্তী অকথিত অংশে তার বাগ্‌বৈচিত্র্য অনেক অধ্যাপকেরই ঈর্ষার বিষয়। চিনা পাই লৌ, ভারতীয় মন্দির গোপুরম, সিংহদুয়ার এর বৈশিষ্ট্য, গথিক আর প্রাচীন ভারতীয় মন্দির ভাস্কর্যের তুলনামূলক স্বাতন্ত্র্য বিশ্লেষণের প্রাচ্য গৌরবের মৌন সমর্থন যখন ছড়াচ্ছিল ভাষাও তার ব্যবহারের ইন্দ্রজালে তখনই ঢ্যাঙা রিচার্ডের বিরক্তিকর 'ইয়েস স্যার' বাধা। ওদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা পূরবদেশের পঠন প্রক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অডিও ভিডিও লিখিত প্রতিবেদন বের করে দিচ্ছে কম্প্যুটার। ভুল ধরবে যন্ত্র প্রশ্ন করবে কীবোর্ড মাউস, নির্দেশ করবে সঠিক নিশানা। বিরক্তি ঝেড়ে বিভাস গর্বিতই হয়েছিল সাইবারনেটিকসকে কাঁচকলা দেখিয়ে হিন্দুস্কুলের এইট-এর ছাত্র যেন ভূগোলের নোট নিচ্ছে — নদীর প্রাথমিক গতিতে এই কবিতাটা ব্যবহার করা যায় না স্যার! বিরক্ত স্যার, —ভূগোলে ওসব চলে না। তবু বিভাস লিখেছিল থরথর, করি

কাঁপিছে ভূধর / শিলা রাশি রাশি পড়িছে খসে / ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল / গরজি উঠিছে দারুণ রোষে' । এইচ বি স্যার একদিন শুধু কাঁধে হাত দিয়েছিলেন। ভালমন্দ কিছু বলেননি, কিন্তু বিদ্যুতের এক শিহরন খেলেছিল । শিক্ষক বিভাসও এই ভঙ্গিটি আয়ত্ত করে দেখেছে, মেশিন মানুষের দেশেরও যুবজনে মন আছে । নীরব এই স্পর্শ প্রশংসার মূল্য আছে । বিভাসের প্রশ্রয় পেয়ে মার্কিন যুবকটি এক উদ্ভট প্রশ্ন করে । ওয়েস্ট বেঙ্গলের মন্দির স্থাপত্য নিয়ে জানতে চায়। এখানে বিব্রত হওয়া ছাড়া কোন পথ নেই বিভাসের । পশ্চিম বাংলার মন্দির বলতে ত বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা । বলেছিল । — নো স্যার । ওয়ান গ্রেট বৈষ্ণব অব ওয়েস্ট বেঙ্গল টোল্ড মি। ছোকরা তাকে শেখাতে চায়, ছিয়াশি দেশ পার করে আসা ওরিয়েন্টালিস্টকে? কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তো এমন চুক্তি হয়নি। শেখাতে এসেছে, ইন্টারোগেট করবে কেন? — হোয়াট ডিড হি টেল? — ভেরি ইন্টারেস্টিং স্যার । মন্ডির ডোমস আর অল ইন দি শেপ অব মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট, মৃদঙ্গম পাখোয়াজ করতাল এটসেটেরা। আচ্ছা এই তাহলে বৈষ্ণব সাধুদের প্রচার! হেসে বলেছিল, এরকম আছে ঠিকই তবে এতে কোন বৈশিষ্ট্য নিরূপিত হয় না ।

হিন্দুস্কুলে ছাত্র কখনও স্যারের বাড়ি যায়নি বিদ্যার্জন প্রয়াসে । রিচার্ড সাহেব চলে এল শিক্ষকের পারিবারিক আস্তানায়। বিভাসের বোকা বৌও হঠাৎ দারুণ স্মার্ট, কেয়া টিয়াকে নিয়ে চলল পড়াশোনার নাম করে আড্ডার আসর ঘরে এবং গ্রিক নামের শহরময় চরকিপাকে । পূরবী নামের তার বৌ পূর্ব পশ্চিমের মিলন মহত্ত্বে নীরক্ত সাদা রঙের প্রতি বিরূপতা ভুলে গেল । পূরবীর মেয়েটাও রিচার্ডদা বলল । বিভাসের সাদাসিধে মেয়েটি প্রথম বর্ষের লজিক শিক্ষণকে দর্শন ভেবে ভুল বকল। ভুল শুদ্ধের সব বিদ্যা তখন খুইয়েছে সাহেব । এহেন পরিস্থিতিতে বিবাহ প্রস্তাব ঝটিতি অনুমোদন বিদেশেই । পারিবারিক বিশেষ অধিবেশনে 'হ্যাঁ' জয়ী হয় এবং আলিটালিয়ায় দেশে ফেরার চারটির বদলে পাঁচটা টিকিট কাটা হয়। বিভাস পূরবীর গর্ব একেবারে ওনার্স প্রাইড, আমেরিকা থেকে ঘরজামাই নিয়ে ফিরছে। প্রতিবেশির হিংসুটে মুখ দেখা হয়ে ওঠে না নবীন শ্বশুর শাশুড়ির। সল্টলেকের শ্বশুরালয় বা পিত্রালয়ে এসে ওঠে না নবীন সন্ন্যাসী আর তার সাধের বোষ্টমি। সিতবস্ত্র আর মুন্ডিত মস্তক রিচার্ড জন্ম নিল নদিয়ার ছাড়িগঙ্গা পারে জগন্নাথ মিশ্র নামে। টিয়া নাম নিল শচীরানি । এ পর্যন্ত তো ঠিক আছে, থাকে । এরকম গল্প ঘটে। টাইমপাস এবং পরচর্চার জন্য শোনে সবাই । মূল গল্পের চলন সহজ করতে অববাহিকার আভাস ।

বরং কাশীরামকে দিয়ে গল্পের শ্রীগণেশ করা যায়। মূল ঘটক হতে পারে সে। কাশীরাম জানে গল্পের গরুকে কোন গাছের মগডাল থেকে পেড়ে আনতে হবে কচি ঘাসের লোভ দেখিয়ে এবং ভাইসি ভার্সা। বিভাসের পি সি-র নাম কাশীরাম । ওকে সবকিছু বোঝাতেও কাঠখড় পোড়াতে হয় যথেষ্ট। সব ইনফো নেওয়ার ক্ষমতাও নেই । তাই আবর্জনা খেয়ে আবর্জনা ওগরানোর মাত্রা যায় বেড়ে। বিভিন্ন প্রোগ্রাম নিয়ে মিক্সিং এর কারিগরি কি জানে হতভাগা। তবে কথা জানে বোকারাম। বিভাসের গোটা জীবনটাই ত ওর ভুঁড়ো পেটে জমা আছে। কী করতে পারল? নব কলেবর জগন্নাথ মিশ্র শচীরানির কথাও জানে বেটা! গল্পের পোকা যখন নড়েচড়ে তখন তার জীবনের অসফল প্রেমের আভাসগুলোও ভরে রাখে সিক্রেটমেনুতে । সাহা

ইন্সটিটিউটের আণবিক সরকারও অবাক কাশীরামের কান্ডকারখানা দেখে। বিভাস খুব খুঁতখুঁতে, বলে, বড্ড বেশি বোকা। সরকার মেনে নিয়ে বলেছে, তাও আপনি দারুণ পোষ মানিয়েছেন, এবার ইন্টারনেট পেয়ে গেলে দেখবেন কেমন স্মার্ট হয়ে যায় ! কাশীরামের আবার জ্ঞানের নাড়ি টনটনে, অভিমান হয়। আণবিক আর তার কথোপকথনের পর তিনদিন শাটডাউন হয়ে পড়ে রইল। যেদিন মান ভাঙল, গোঁসাঘরে আলো জ্বলল। কাশীরাম বোকা, বোকার হদ্দ এবং অভিমানী যুগপৎ।

কাশীরাম বুদ্ধিরাজাকে দিয়ে একটা গ্রেট নভেল তৈরি করার পরিকল্পনা আছে তার। আপাতত তার চাই একটা গল্প, শর্ট স্টোরি, ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা ছোটো ছোটো সুখকথা দিয়ে গড়া কাশীরাম তাকে হেল্প করবে। দেশিবিদেশি কিছু ছোটগল্পের একটা মিশ্রণ প্রোগ্রামে কিছু তো বেরবে নিশ্চয়। না, ওসব আপাতত চাই না তার। প্রথমেই সাড়া জাগিয়ে ফেললে পাঠকের মনে দারুণ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে। সেফ সাইডে কলম চালানোই ভাল। নিজেকে নিয়ে নিজের জীবন নিয়ে একটা সত্যি গল্প চাই। ওসব টুকলিবাজি তোলা থাক অসিধারাদের উঁচু নাক ভোঁতা করার জন্য। সাদা জীবনের গল্পও হয়, যা মনে দাগ কাটে। উত্তমকুমারকে নিয়ে লিখল একজন। আউটডোর শ্যুটিং এ গ্রামের ভিতর হারিয়ে গেল ম্যাটিনি আইডল। এদিকে শহর তোলপাড়, ফ্যান মিডিয়া অতিব্যস্ত উদ্বিগ্ন, প্রশাসন গ্রামে লংমার্চ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এদিকে মহানায়ক ভুঁড়িতে তেল মেখে যাচ্ছেন আত্রেয়ীতে নাইতে। পিঁড়ি পেতে খেতে দিচ্ছে গ্রামবধূ। মিষ্টি কুমড়োর ছক্কা, পটলের ডালনা আর চুনো মাছের ঝোল। ভালই লিখেছিল প্রদীপ মাজি। গল্পের ম্যাজিক দিয়েছিল একটু, গ্রামের কেউ চিনতেই পারেনি হিরোর হিরোকে। ওর-- কম হয়, কিন্তু তার জীবনে ত ওসব উদ্ভট আকাঙ্খার কিছু নেই। নাগরিক মানুষ সে, বনে বনে বাঁশি বাজানোর শখ নেই। ওগো যা পেয়েছি সেইটুকুতেই খুশি আমার মন। উত্তমকুমারের গাওয়া গানটাই যদি জাতীয় সঙ্গীত তবে গল্পের জন্য এত আকুলতা কিসের?

গল্পের সাধ যখন একটা হয়েছে পূর্ণ তাকে করতেই হবে। একটা শুরুর প্রয়োজন শুধু। ভাষা টাষা কিছু না শুরুটাই আসল। স্থপতি জানে সেটসস্কোয়ার বসিয়ে কোথা থেকে রেখা টানতে হয়। নোম তোমটাই শুরু। লয়কারীতে বেঁধে আলাপে যাওয়ার প্রস্তুতি। গল্পেরও আছে পকড় আছে মীড়ের কারুকাজ, পালটা গমক অন্তরাপথের নিশ্চিত ঘরানা।

গল্পের ম্যাজিক খুঁজতে নিজের বন্দিশ ভুলে অন্য কাকলিতে সুর সন্ধানে ব্যস্ত থাকার মানে হয় না। বিভাসের এ কালক্ষেপ আসলে গৌরচন্দ্রিকা, তম্বুরায় সুতো পরানো। অতীতের রঙরঙা পৃষ্ঠা থেকে কাহিনীহীন গল্পের আকার বা অনুরণন কিছুই ত হচ্ছে না। বিষয়ে পৌঁছতে না পেরে সাজানো যাচ্ছে না খাবলে খুবলে আনা ঘটনা। পরম্পরা যদি বা হচ্চে গল্প হচ্চে না। একটা জটিলতাও পাওয়া যাচ্ছে না যার কেন্দ্রে আবর্তিত হতে পারে কথা। তুলির নিপুণ বহুমুখিনতা নয়, দোয়াত উল্টে কালির ধ্যাবড়ানো বিস্তৃতিতে পর্যবসিত অধ্যায়গুলি। কেন্দ্রহীন পরিধিতে ভিড় করছে চরিত্র, মন ও শরীরের বিচিত্র কর্মকান্ড। বিভাস তাই স্থির করে, ক্রম ভেঙে দেবে, এখানে কিছু ওখানে কিছু দিয়ে টাইলস ম্যুরালের বিমূর্ততায় সাজাবে কথা পরম্পরা।

বিভাসের ভিতর গল্পপ্রস্তুতির ভিয়েনে জলশর্করার মিঠে পাক ফেনাময় ব্যাপ্তি নিয়ে

টগবগ করছিল। ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াতেই সব হারিয়ে যায় এক খেই হারানো অন্ধকারে। চিন্তা ভাবনা যোগসূত্র। দিবস আবৃত করা আনন্দঘন এক আঁধারে পরিব্যাপ্ত চরাচর জুড়ে শুধু ভাঙার খেলা। নিপুণ কারিগরের ভাঙন শিল্পে কী যে গড়া হয় সে শুধু যে জানে সেই জানে। আকাশ ঝেঁপে মাতাল হাতীর পাল। ভেড়ার পাল বলেছিলেন বাংলা সাহিত্যের আলি সাহেব। অচেনা এক বাংলা ছড়ায় শুনিয়েছিলেন মেঘের স্বরূপ। পিঙ্গা মেঘর আঙ্গাআঙ্গি চেরাপুঞ্জির পাড়ো / ধলা মেড়া ফালদি পড়ে কালা মেড়ার ঘাড়ো। ভেড়ারা লাফালাফি খেলা খেলতে খেলতে তার মাথার তিনদিকে পাক খেতে খেতে অভিবাদন জানায়। রণতূর্য শোনা যায় কাছে দূরে ভেড়ি মেঘের শেডগুলি মুছে যায়। খেয়ালি চিত্রকর নতুন করে আবার সাজায় ওয়াশ।

নলবনের নিকটজলে বারিধারার টুপটাপ স্পষ্ট হয়। আষাঢ় মেঘের স্বাভাবিক বর্ষণে উৎফুল্ল স্পীডবোট যাত্রীদলের ভিজতে ভিজতে পারঘাটে ফেরা, দুভারক্রান্ত ভুসভুসিয়ে ডাঙায় ওঠার পর তরীহীন নিস্তরঙ্গ জলাধারে বৃষ্টির মুখরতাই তখন বিভাসের বাইফোকেলের দূরদৃষ্টি। আকাশ মাটি জল আর প্রাণীকূলের পরিবর্তিত অবস্থান বিভাসকে এক দূর পরাধীন চিত্রকল্পের মুখোমুখি করে দেয়। যায় দিনকে মনে হয় এমন দিন। যে দিনে বলা যায়। সময়ের সন্ধিপ্রকাশ লগ্নে পাশাপাশির মুগ্ধ হরিণী উপস্থিতিতে বিহ্বল বিভাসে তখন চঞ্চল তারানার দ্রুতি। চশমার কাঁচে বৃষ্টির ছাঁট আর সঙ্গিনীর দৃষ্টি আকর্ষক গুগলিতে স্কোয়ার ড্রাইভের বিপুল বাউন্ডারি। বিভাসের দুরন্ত দৃষ্টি স্থির হয়। পূরবীর উত্তর চল্লিশ সাদা খোলের সুতি শাড়িতে, সবুজ মেরুন পাড়ে পাড়ে, ভারি ফলের নিচে নিচে, লক্ষ্মীর ছাপ পায়ের পাতায়, ক্ষীণ কোমরের স্বল্প শিথিল গাত্রোপরি উন্নত বক্ষে। কালিদাস থেকে আধুনিক কবি এমনকি স্থপতির পরিভাষায়ও যার স্তুতি করেছে একসময়। এখনও করে, বলে স্তোকনম্রা বলে ওরিয়েল উইনডো। অভিক্ষিপ্ত অলিন্দ, বলে সাদা রাজহাঁস। পরিচর্যাহীন আবরণে ঢেকে রাখা স্বল্প আলুলায়িত সুন্দরে দৃষ্টি নিমগ্ন রাখতে বৃষ্টিজলে বাস্পাচ্ছন্ন চশমা পরিত্যক্ত হয়। খালিচোখের পূরবী এখনও সমান উদ্দীপক পঁচিশ বছর আগে যেমনটি ছিল। শাড়ির সম্মুখ পাড়ে বিন্যস্ত দীর্ঘ কেশদাম। এখনও যে কোন যুবতির ঈর্ষার কারণ। ময়ূরীর যেমন মেঘকলাপ, মেঘলা দিনে কেশ এলানোও পূরবীর এক বিলাস। বিভাসের নীরব ভক্তদৃষ্টি বাণীর পরশে উদাত্ত হয় 'ওগো প্রাসাদের শিখরে আজিকে কে দিয়েছ কেশ এলায়ে'। প্রাত্যহিকতার বাস্তব ভেবে যাকে গল্প কল্পনার বাইরে রেখেছে, সেই কল্পস্বরূপিনীকে হঠাৎ পাওয়ার উল্লাসে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে বিভাস। এবং কাটবিন্যাসে গল্পের প্রথম অংশ ভাঙে হুড়মুড়িয়ে। লবণহ্রদবাড়ির উন্মুক্ত অলিন্দে অপার্থিব পরিবেশে বিভাসগল্পের প্রথম অধ্যায়ের হয় মঙ্গলাচরণ। সে তার স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করে গভীর আবেশে।

দুই

লাগ লাগ লাগ। এই ত বেশ লেগে গেল গল্প। বর্ষণমুখর ত্রিসন্ধ্যায় প্রকাশ্য অলিন্দচুম্বনের পর পঁচিশ বছরের প্রাচীনা স্ত্রীর বিব্রত হওয়া উপভোগ করে বিভাস। লজ্জাবতী গৃহিণীতে গর্বও যেমন একটা সন্দেহের সুখও ফুটে ওঠে রূপটান সমৃদ্ধ মুখমন্ডলে। সন্দেহ কখনও একাগ্নী বান হয়না, ছররার মতো ছুটে বেরবে খর ছুঁচলো কোন। নির্ঘাৎ কোন সুন্দরী দেখেছে রাস্তায় পার্কে বা মার্কেটে। স্টারে রোমান্টিক মুভি দেখেছে নয় ইংরেজি নভেল পড়েছে। কেয়াটিয়ার মিল

বুনের বইও পড়ে মানুষটা। সুখাবেশের সংশয় এখন জমিয়ে রাখবে তার প্রাচীনা স্ত্রী। আরও গভীরে যখন যাবে জেনে নেবে কোন ছবির দৃশ্য, কোন নভেলের চ্যাপ্টার। একটা বানিয়ে বললেই হল। বিভাসের উদ্ভাবনীতে এমন দৃশ্যের কল্পনাও করে না পূরবী, তাই উপস্থিত 'ছি' শব্দে রাগের প্রস্থান। বাইরে বিভাসেও তখন রাগ মল্লার।

কাশীরামের স্বভাব বড় কুচুটে। গল্প বিষয়ক পোকাটা যখনই নড়াচড়া করছে বাধ্য হয়েই একটা গোপন আর্তাতের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। পূরবীকে লুকিয়ে হয় সব শলাপরামর্শ, গোপন সংকেত। কাশীও বলে স্ত্রীকে কখনও পূর্ণ সত্য জানাতে নেই। সে আর নতুন কথা কী, পঁচিশ বছরের অভ্যাস এবং ধরা পড়ার রেকর্ডও শতকরা একশ। তার সরল স্ত্রীকে রাক্ষসের ধাঁধায় ঠকিয়ে গেল জীবনভোর। উত্তর বললে সে দক্ষিণে যাবেই। উল্টোডাঙা বললে নির্ঘাৎ সে গড়িয়াহাটে। মেদিনীপুর বলে চলে এল নদিয়ায়। অলিন্দ ঘটনার পরদিনই মেঘ মেঘ সকালে। আগের দিন বিকেলের এক ঘোরলাগা মানসিকতার সঙ্গে বেশ মানানসই। ছাড়িগঙ্গার পারে তোফা পরিবেশ। সাধু সেজে হনিমুন করার আদর্শ ঠাঁই।

গল্পের স্থানাভাব পূরণ করতেই শুরুতে জগন্নাথ মিশ্র আর শচিরানির প্রসঙ্গ দরকার ছিল। নইলে হঠাৎ করে কেন বিভাস ছাড়িগঙ্গার পারে সাধুসঙ্গমে। যতই কেন গোল গল্পের বিরোধিতা করা হোক একটা অদৃশ্য পরম্পরা তো থাকেই। কন্যাকে দেখার একটা আকাঙ্খা পিতার থাকতেই পারে। তার উপর যদি সে সন্তান আবার তার তরফের হয়। স্থান মাহাত্ম্য বিভাসকে আকৃষ্ট করল যার পর নাই। পাঁচতারা পরিবেশের আশ্রম। বিফস্টেক ডিস্কোথেক ফিশফিংগার নেই শুধু। এছাড়া কী নেই। দীর্ঘিকা নামের নীল জলের স্যুইমিং পুল। অবগাহনের জন্য ছাড়িগঙ্গার বিশাল জলধি সিংহদুয়ার থেকে দু পা ফেলিয়া। ভোগেরও বিপুল আয়োজন, কুজিন রেস্তোঁরা কোল্ডড্রিঙ্ক কাম পার্লার বৈষ্ণব নামের। গোবিন্দভোগ। তমালতলায় যেমন ইচ্ছে খাওয়া। অমৃতবাজারে জনতা খাবার। নন্দালয়ে দইপায়েস মিষ্টান্ন। কুড়ি বিঘা জমির উপর রাজপাট। মন্দির ভাস্কর্যেও বিভাস মুগ্ধ। এই মন্দিরের কথাই বলেছিল পূর্বাশ্রমের জগন্নাথ মার্কিন দেশে। কংক্রীটের ঢোল মৃদঙ্গ খোল কাঁসর শঙ্খ করতালের জটিল নির্মাণ।

ধর্মপথের প্রতিবন্ধকতা কাটাতে ওয়ার্কশপের ব্যবস্থাও করে বিশ্ববন্ধু সমাজ। তবে বোবার ত কোন মৌখিক ভদ্রতার দায় নেই। আত্মজা আর জামাতার ধর্মসংসার তাকে বোবা করেই ছাড়ল। ভালরে ভাল এত ভালতেও বিভাসের বদহজম হয়। মৎস্যমাংসে ভোজন রসিক ঘটিবাঙালির এই থোড় মোচা কচুশাক আর কেক পেস্ট্রি পায়েসের নিরামিষ খাবার অপছন্দ হল। অজ্ঞাতবাস ভেঙে কেয়া পূরবীকে আনিয়ে দিন পনেরর একটা ছোট পরবাসের অমিয়মন্থন জমিয়ে দেওয়া যেত। আমিষ নিরামিষ দ্বন্দ্বে শরীর মনকে কনুই ঠেলল। বিলিতি জামাইটাও গোঁয়ার। নিজামের বিফস্টেক এর ঐতিহ্য এবং বৈশিষ্ট্য জানাতে শিক্ষকের ঘেরাটোপ ভেঙেছিল ঝনঝানিয়ে। উহুঁ, ছাত্রের তাতে কী। ছাত্রও নয় এখন, নতুন খেলায় জামাতা পদবিও নড়বড়ে। তাই জগন্নাথ বাবাজির জয় নিতাই জয় রাধে বোল আর জপমালার অঙ্গুলি চালনার দ্রুততায় বিরক্তি। টিয়াপাখি কন্যাও ত ছোলা লঙ্কা আর আলুপটল ঝিঙে পোস্ত পাঁচ তরকারি দধি দুগ্ধে চিকন গোয়ালিনি। অসহায় পিতার দৌত্যে তখন এক মীমাংসিত সত্যের বিপরীতে স্নেহের আহার্য। আহারের জন্য জীবন নয় জানে কন্যা, সেই শিখিয়েছে এককালে, সুখে নিরামিষ থেকে

আমিষের ন্যূনতম সমঝোতায়ও যখন রাজি নয় কেউ । তবে আর কেন এ প্রবাস । সখি হে, ফিরিয়া চল আপন ঘরে ।

অসফল দূতিয়ালি শেষে ফেরাই যখন নিশ্চিত, পূর্ব রজনীতে দিনের আলোর গভীর থেকে বেরিয়ে এল এক তারা । বয়সে তরুণী সেই ষোড়শীর ঠাঁই হল বিভাসের নয়নসমুখে। যেখানে পুষ্পবাটিকা দুই পর্ণকুটিরের অবস্থান বিভাজিত করেছে। সেই ফুলবনের ওপারের শূন্য কটেজে পূর্ণ বৈভবে বিভাসের প্রবাস সমাপ্তির নৌকাকে অনড় করে দিল পারঘাটে ।

গল্প ত ফটোগ্রাফি নয়, টুকুস করে দেখলাম তুলে রাখলাম অ্যালবামে। ডাইরি লেখাও নয়। কথা রচনার অনেক বিষয় আছে রঙ আছে। এঁকে বেঁকে যাওয়ার লাফিয়ে ওঠার রেখা আছে । মনের মত করে তোলার ব্যাপার আছে। যেমন বিভাস তার মনের মানবী রামকেলিকে দেখেই চিনতে পারে । বাল্যসখী ষোড়শী না চেনার কারণ থাকতে পারে না সদ্য যুবকের। রামকেলি যদি তার ভীরু প্রথম মানুষকে চিনতে না পারে সেও তার মনের বিন্যাস। বিভাস ওখানে একটা সমঝোতার পথ বেছে নেয়। বাইশ ধরা আর ষোলর অধরা মাধুরী টাইম মেশিনে পিছিয়ে নিয়ে যাওয়ার গিমিক তো সেকেলে স্যাড স্টোরির ফর্ম। ওসবে নেই সে। হঠাৎ করে গল্পের মোড় ঘুরিয়ে অতীতে নিয়ে যাওয়ার আজগুবি বিষয় ধোপে টিকবে না, যুক্তিগ্রাহ্য হতে হবে যেমন সার্ফ আলট্রা বা মাইক্রো সিস্টেম এরিয়েল।

তাহলে কী সব ঝুট হ্যায়! ধূমের নীচে আগুন নেই। পুরনো সেই দিনের গানের কথা শুধু শূন্য হৃদয়হরণী। গল্পভাবনায় একটা মোক্ষম বাঁকের অপেক্ষায় নিরাশ হয়ে এক ঘন্টাধ্বনির অপেক্ষায় বসে থাকে বিভাস। ক্রি রি রিং তিন চাকার রথের সারথি হয়ে আসবে লালমোহন। গান কীর্তন বিরতির এই সময়টায় মন্দির প্রাঙ্গনে বিরাজিত হয় এক অপার্থিব নীরবতা। দারু প্রতিমার ভোগ লেগেছে তাই মন্দির চাতাল শূন্য। পূর্ণিমার এপার নয় ওপার হওয়ার কথা তিথির। কাল রাতেও ফকফকা জ্যোৎস্না ছিল। এমন চাঁদের আলোয় গৌর বোষ্টুম মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল কন্যা বোষ্টুমির চোখে। আর আজ, লবণহ্রদে আপনঘরে ফিরিয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর আকাশেও কেমন আধকপালে। মেঘও জ্যোৎস্নার টুকটুকিতে বিভাসের মনেও এক উদাস খুশি। প্রাচীনা পূরবী দর্শনের পুলক যেমন আবার সেই হাতে পার্শে ভেটকি তোপসে পমফ্রেটে সর্ষে জিরে লঙ্কাবাটার ম্যাজিক প্রিপারেশন এর লোভ রয়েছে আঠেরো আনা। দুঃখ হয় বোকা জামাইটার জন্য, চূড়ান্ত ভোগের দেশে জন্মেও রসনাকে নির্বাস করে যত্রতত্র ভোজনতন্ত্রের ডাল ঘ্যাঁট ময়দা বেসনের কেক প্যাস্ট্রিতে কেমন জীবনধারণ করে যাচ্ছে। আদৌ করছে কি? চালিয়ে যাচ্ছে। জলের ব্যাপারেই বাবাজি পরিষ্কার, এ দেশের পুকুর নদী পাতকো'র জলে চানপান করে যে নিমাই দাপিয়ে বেড়াতেন, সেই জলকেই অসম্মান করে তার চাই আরপার পরিষ্কার অ্যাকোয়া মিনারেল। আর্সেনিকহীন শুদ্ধ জল। থাক বেটা ভন্ডতপস্বী!

জগন্নাথ মিশ্রর সব কাজের সবসময়ের কর্মী লালমোহন রিক্সাওলা বলেছে, লক্ষ্মী বোর্ডিংএ সব পাওয়া যায়। সর্ষেবাটা বলুন সর্ষেবাটা – কালিয়া বলুন কালিয়া, মায় তেলকই চিতলপেটির ঝালও পাবেন। রিক্সাওয়ালা ডাকে প্যাঁপু। ছাড়িগঙ্গার পারে সবকিছু টাইমবাঁধা। নিয়মের রাজত্ব। লক্ষ্মী হোটেলও নটার ভেতর, নইলে মিল নেই । ঠিক আছে বন্ধু আজ তোমাকেও খাওয়াব, প্রেমধর্ম হবে সাম্যবাদও হবে। লালুভাই অতিথির সাম্মানিক পারসে থাকবে, থাকবে

ইলিশ ভাপে, চিতলের পেটি, পাতের এমাথা থেকে ওমাথা বিস্তৃত পাবদার ঝোল, কেচকি মাছের কড়ু। শেষপাতে কী থাক্‌বে দই সন্দেশ? না ওখানে একটু চাষাড়ে বিভাস। কাঁচা আমের পাতলা চাটনি খেয়ে ঢেকুর তোলা যাবে বেশ। এর মধ্যে প্রায় ঢেকুরের সুখে চটিজোড়া খুঁজে পায় না। চাতালের নিচে রেখেই ত প্রতিদিন শূন্যমন্দিরে একবার বসে। শেষরাতে হারিয়ে গেল? যাক্‌, মন্দ না সর্বহারা রিক্সাওলার সঙ্গে লাস্ট সাপারটা হোক নগ্নপদেই। হারিয়ে আক্ষেপ করার মানুষই নয় সে। এমন সময় মেঘে ঢাকা আর অর্দ্ধ জ্যোৎস্নায় আকাশ থেকে ফটিকজল ডেকে উঠল।

আপনি প্রসাদ নেবেন না?

কে? কোথায়?

মন্দিরে, গোবিন্দভোগ?

না।

ও। নিন আপনার চটিজোড়া।

মেঘ কেটে ক্ষণিকের জন্য সম্পূর্ণ জ্যোৎস্নায় উডল্যান্ডস চটিজোড়া হাতে অতীত প্রকটিত হয় বিভাস সমুখে। ষোড়শী রামকেলির হাতে তার পাদুকা।

ছি ছি, একেবারে হাতে করে।

তাতে কী হয়েছে, আপনার চোখের সামনেই ছিল, খুঁজে পাচ্ছেন না।

ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। ব্যাপারটা সমুদ্রের মতো হয়ে গেল।

কৃতজ্ঞতার সঙ্গে একটা সূক্ষ্ম খোঁচা দেওয়ার চেষ্টা করল বিভাস। বাল্যসখি রামকেলির আপনি আজ্ঞেও তাকে একটু রাগবশ করেছে সত্যি। খোঁচাটা দিয়ে গর্বিত হয়, কারণ সে নিশ্চিত রামকেলি ধরতে পারে নি। পূরবীও পারে না তার রসবোধের সঙ্গে টেক্কা দিতে।

আমি কিন্তু নিই নি। ফিরিয়ে দিলাম শুধু। দেবস্থানে একটা পুণ্য করলাম, অন্ধজনে আলো। আপনি রাতকানা আছেন একটু।

রিয়্যালি।

মোগাম্বো খুশ হোয়া। রসিকার কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তা শরীরে আবার আমিষাভাস এনে দেয়। লক্ষ্মী বোর্ডিংএ আর একটা একস্ট্রা আইটেম নেবে খুশিতে।

শুনুন।

এবার মিনতি। শুচিতার পরশ ষোড়শীর কণ্ঠস্বরে।

আপনি হোটেলে যাচ্ছেন?

ন্ না।

না, এত আর রামকেলি নয়। এ যে জাদুকরি। বলে দিল তার আংশিক অন্ধতার কথা। বলে দিল, বেড়াতে নয়, হোটেল যাচ্ছে। নো, চলবে না, ডাইনিকে নিয়ে গল্প চলবে না তার।

ভবিষ্যৎবাণীর প্রাথমিক চোট আঘাত তাকে তোতলা করে দিয়েছিল। এবার মন্দ্রস্বরে নস্যাৎ করে মায়াবিনীর মিথ্যে শক্তি।

না, আমি বেড়াতে যাচ্ছি।

নিয়ে যাবেন?

কাকে?

আমাকে।

না।

আমিষগন্ধী অনুরোধ আর পার্টটাইম সারথি লালমোহনকে ভয় বিভাসের। লেজখসা টিকটিকি। সাহেব সাহেবগিন্নিকে সব রিপোর্ট করে পুঙ্খানুপুঙ্খ। জীবনের কত ধনই যে পথের ধারে বসে আছে ঝকঝকে। পঞ্চাশোর্ধ বয়সে মুড়িতেলেভাজার আহরণে অবাকই হয় বিভাস। আঃ কি সুস্বাদু রেসিপি! রাতে একটু ঢ্যামকুড়াকুড় ডেকেছিল পেটে। ব্যাটা লালুর প্রতিবেদনে মহাযুদ্ধের দামামা বাজিয়ে ছাড়ল। সাহেবি নুস্কায় নাক্সভোম মাদার একদিকে অ্যান্টাসিড আর অ্যানজাইম অন্যদিকে। গৃহত্যাগী কন্যা জামাতার শাসন বড় কড়া। তাই চোর পুলিশ। লালমোহন বর্জন আর অনিচ্ছুক সঙ্গিনী সঙ্গে কথার আমড়াগাছি।

আপনি খেয়েছেন ঢেঁকিশাক, খারকুন পাতা? এখানে কচু শাক খুব খায় লোকে।

মহাপ্রভু খেতেন। প্রিয় ছিল কচুশাক আর মোচার ঘন্ট।

আপনিও তো ব্রাহ্মীশাকের রস খেতেন পরীক্ষার আগে।

ন্-না তো। ব্র-ব্রা-হ্-মী শাক কে বলল?

মাতৃভাষা আর স্বভাব কেউ লুকোতে পারে না। আমকেলিও পারেনি। তোতলামির ঝোঁক থাকায় কখনও র উচ্চারণ করতে পারত না। নাম বলত আমকেলি দত্ত। ধরা যে পড়েছে জানিয়ে দিলে কেমন হয়। থাক্, ভাবের ঘরে সবে ত সিঁদ ঢুকিয়েছে।

বসবেন একটু?

একটু কেন এখনও অনেকক্ষণ বসা যায়।

ছাড়িগঙ্গার পারে বসতে বেশ।

বাঁধানো ঘাটের এপারে ষোড়শী রামকেলি আর ওপারে পঞ্চাশের বুড়ো।

বিভাস কী একটু এডিট করছে? মোচড় টোচড়ের মোক্ষম জায়গাগুলোকে সিক্রেট মেনুতেও ধরে রাখার সাহস পাচ্ছে না। কাশীরাম এক মোক্ষম বুদ্ধি দিয়েছে, ডাটা ফিড করো, সঙ্গে সঙ্গে ইরেজ করে দাও। কেউ জানবে না কিছু কাশী ত জেনে গেল। একটা পরম্পরা রক্ষাকারী পরামর্শ দিতে পারবে গল্পকারকে। অতি সহজ অর্থডক্স গল্পে কোন দিলচশপি নেই বলে শেষ কথা জানিয়ে দিয়েছে তার অগতির গতি।

তাই, চেনা অচেনার আলো আঁধারির সাসপেন্স এর কার্টেন ওঠাতে বিভাস রামকেলির

পাশে বসে পড়েছিল ধপাস। মুগডাল আর অন্নের পাশে যেমন ধ্যাবড়ে বসে পাঁচ তরকারি। আপনির রূপান্তর ঘটে।

মঠে ত চেয়েচিন্তে খেলে দেখলাম খুব।

খুব না, খেয়েছি।

মঠে পোলাও হয়, পোলাওকে কি বলে জান?

কী জানি খাইনি।

পায়েসকে কী বলে?

ওটা জানি, পরমান্ন।

না ওটা বইএ লেখে। পায়েস হল মিষ্টান্ন পোলাও পুষ্পান্ন।

নিছক তথ্য। অন্ন পরমান্ন পুষ্পান্নে। তবু হাসির বিষয় হয় ষোল বছর আর ক্যাচ টুয়েন্টিটু'র মধ্য গগনে। হাতের রেডিয়ামে একটি লম্ব প্রতীয়মান। ছাঁটাই লালমোহনের বর্দালি মানুষটির এত দায় নেই সময় জানায় ঘন্টা বাজিয়ে। রাত ন'টায় রামকেলির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিভাস মনে করে এক মিঠে কিশোরীর রায়বাঘিনী রূপের কথা। কী দাপট! চোখ উঠিয়ে দেখলেই চড়চাপড়। স্কুলের মাঠে ট্যারা সঞ্জয় ওকে দেখে হাসেনি, তবু মার খেল। মনে কী পড়ে মধ্যগগনের চাঁদ সুলতানার? বিভাস স্মৃতি হাতড়ে পুলকিত হয়। জল আর মেঘের লুকোচুরি। প্রতিফলনে চাঁদমুখে সেই হাসি, পঁচিশ বছরের প্রাচীন অবিকল। বিভাসের ঠোঁটেও মাধুর্যের দৈর্ঘ্য।

হাসছেন যে বড়।

মনে পড়ল।

কী পড়ল, মজার কথা?

আপনার কথা।

আমার কথা? আমাকে চেনেন? দেখেছেন?

আপনি স্কুলে . . .

থাক, বিভাস সামলায়। হঠাৎ আলোর ঝলকানি শেষে তুমি আবার আপনিতে। এত বৎসর পর কী কথা থেকে কী মনে করে। প্রতিক্রিয়ায় যদি ফোরফর্টি আবার ঝলকে ওঠে। এর চেয়ে এই তো বেশ, সহজ চলন। ট্যারা সঞ্জয় আর বিভাস ত এক নয়। স্কুল প্রসঙ্গ টেনে নিয়েই রামী বিব্রত বিভাস উদ্ধারে সক্রিয় হয়।

পড়াই। বিদ্যাধরী উচ্চমাধ্যমিকে। আপনি জানলেন কী করে?

জানি জানি। জ্যোতিষ করি, জানতে হয় সব।

আপনি জ্যোতিষি?

ঐ আর কি।

বিভাস রায়চৌধুরী ই আর সাহেব এর এত গুণ তো জানতাম না।

বিভাস ভাবে তার গুণের কথা জানল কী করে মোহিনী কন্যা? চাঁদ ডুবে গেল মেঘ ও জলে। বর্ষণের আগেই ফেরা দরকার। ভয় পুলকে বলে, চল ফিরে যাই। বলতে চেয়েছিল আজ আমরা নিরামিষ। পূরবীর ভয় আর বর্ষণের ভয়ে বিভোর হয়ে সব তালগোল পাকিয়ে ফেলে ভাবুক বাস্তুকার।

ছাড়িগঙ্গার ঘাট পেরিয়ে পথে পড়তে নতুন ভয়। বিকল্প রিক্সাওলার পলায়ন আবার গল্পের চলনকে না জটিল করে দেয়। ব্যাটা নচ্ছার যদি বাড়তি লাভের আশায় সব খবর পাচার করে দেয়। সাহেব সাবস্ক্রাইবারের রয়টার বার্তা লবণহ্রদে পৌঁছতে সময় লাগবে না।

হোক, কিছু একটা হোক। তালগোলহীন গল্পের অন্তত একটা গোল ত হবে। সল্টলেকের বারান্দায় বর্ষণমুখর ভিজে মাঠে গোল দিয়েছিল একটা অসাধারণ। আর ছাড়িগঙ্গার পারে বল নিয়ে দৌড়লেই না অফসাইড হয়ে গেল। তবে আপনি থেকে তুমির ডিড অব কনভেয়েন্স কমপ্লিট হওয়ায় বিভাস খুশি।

বিভাসের ভিতর বিষয়ী মানুষটা ওঝা হয়ে গল্পের ভূত ঝাড়িয়ে নামায় তৎক্ষণাৎ। তার শেষ বেলাকার মাটির বাড়ি পূরবী বাঁচাতে এস টি ডিতে এস ও এস পাঠায় লবণহ্রদে। পূরবীকে জানায় সব। কন্যা জামাতার কটেজ সংসারের বোষ্টুম বোষ্টুম খেলার কথা। লালমোহন গুপ্তচরের নিয়োগ এবং বর্জন পর্যন্ত। ছাড়িগঙ্গার পারে একা একা বসে থাকায় কী প্রশান্তি, আহ তুমি যদি থাকতে। বুথের বদ্ধঘরের ভিতর বুড়ি বৌকে প্রেম নিবেদন করে বিভাস নিষিদ্ধ সংলাপে। পূরবী আপ্লুত হয়, আবজি গুবজি কথার জুতসই আখর মিলিয়ে দেয় ক্যাচিং। স্বামী স্ত্রীর একান্ত সংলাপ। অনেকদিনের পর মনোভাব মেঘভার লাঘব হয়ে বন্যা এল। বিভাস নিশ্চিত, রামকেলি পর্ব পূরবীর অজানা। জানলে বলে দিত, জানি জানি কেন এত প্যার!

মিঠে বোলর স্মৃতিতে একদিন অ্যাক্সটেন্ড হয়ে গেল ছাড়িগঙ্গা বাস। ছুটি বাড়লেও গল্প এগোল না। মেয়ে মুচকি হাসল না। জামাই যে এস টি ডি করেনি সেও আভাসিত হল পূরবীর কণ্ঠস্বরে। রিক্সাওলাও কোন বিভ্রাট ঘটায়নি, ঝড় তুফানের আশঙ্কায় চলে যাওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে ভাড়া নিয়ে গেছে। রামকেলি বলেছে আর একদিন যাবে ছাড়িনদীর পারে। বিভাস বলেছে, আবার আসিব ফিরে। সুখের পরশ নিয়ে রাত কাটানো হয় না এক দু'রাতের বেশি। অগমেন্টেড ইন্টারভালে দুঃস্বপ্ন তাড়া করে আহত গমকে। অভ্যাসের সঙ্গিনীকে কাছে টানতে তাই ছুটল ভোর ভোর।

পূরবীতে একটা অ্যাকস্ট্রা গ্রেস আছে। রামকেলির মতো পরপুরুষ দেখলেই কলাপী হয় না। যার নিজের পুরুষই হল না জীবনে তার ত সকলই গরল পর। আর কুমারীর যৌবনও যে চিরদিনের। তার পূরবী শ্রীমতী হলেও কম যুবতি নয়। তিন টুকরো থেকে তার পিস বের করতে পারলে হয়। কেয়া টিয়ার মা আর তার স্ত্রী, তিনভাগের এক অপ্রাপ্য ভাগ তার। এমন মা মা ভাব হয়েছে, শাড়িতে লাল বা পিংক এর ছোপ থাকলেই গেল গেল করে ওঠে। শখ করে একটা গোলাপি বেডরুম ড্রেস এনেছিল। — না না কেয়াটার যা ছানাছানির স্বভাব, দেখে ফেললে? সীতাদেবী সাবিত্রী দেবী একেবারে। ওদিকে রামকেলি, যতক্ষণ কটেজে গরদের

শাড়ি পরে চিকন মন্দাকিনী চব্বিশ ক্যারেট। আর নয় রামকেলি, ট্রেনের ভাবনা ট্রেনের লাইন বেয়ে চলে যাক ভাইজ্যাগ আম্বালা নয় তিরুবনন্তপুর। বিভাসের গমন রেলের মতো সরলগতি নয়। আনইভেন সংখ্যা দুশো এক এর লবণহ্রদ বাড়িতে পৌঁছাতে অনেক অনেক আঁকা বাঁকা খানাখন্দ। অনেক প্ল্যানিং, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী কেয়া যদি পড়তে যায় পটলডাঙ্গায়? মেঘ মেঘ আকাশে ভরসা এবং আশংকা। বৃষ্টি যদি ঝাঁপতে পারে তবে হয়ত ফিরিয়ে আনা যাবে এক বিস্মৃত দ্বিপ্রহর। ভোরবেলে হাত দিয়ে মুখের হাসিটাকে মুচকিতে রূপান্তরিত করে। মন একাগ্র করে, জপযন্ত্র ঘোরায় দ্রুতবেগে, আমার অর্থভক্ষ বৌটাই আমার সর্বস্ব। বায়ান্ন বছর বয়সে আর গল্পের জীবন হয় না। রাতের বেলা টেলিফোনে কথা বলা মানুষটি ঠিক পঁচিশ বছর আগের সাজেই হুবহু। শাড়ির সম্মুখ পাড়ে বিন্যস্ত কেশদামে তেমনি উদ্দীপক। কানের যন্ত্রে এত তুইতুকারি মুখখিস্তি করল, যৌনতার কথা বলল, দরজা খুলে এ কেমন স্ট্যাচু! মেয়েরা ওরকমই হয় পুরুষকেই এগোতে হয়। নীরবে পুরবীর কাঁধে হাত রাখতেই হড়কে যায়, যেমন যায় বিশ্বস্ত পিছল ঘাটে। সব সময় ত যায় না, এক আধবার আলুর দম হতেই পারে। তা বলে ভয়ে ভীত হয়ো না বিভাস। হও আগুয়ান। এগোতে গিয়ে পিছিয়ে যায়, বিভাসের চোখে তখন সংকটের দুইরূপ। প্রথমটা পূরবীর চোখ ভেদ করে মনের ভিতর, যেখানে, তিরস্কারের সংলাপ, — কাকে ভাবছ, কাকে ভেবে প্যার, ছাড়িগঙ্গার পারে যাকে নিয়ে গিয়েছিলে, বুড়ি ছুঁড়ি বোষ্টুমি! দ্বিতীয় প্রলয়ের কথা যে ভাবেনি তা নয়। ইউনিভার্সিটি বন্ধ তিনদিন। মার পিছনে দাঁড়িয়ে বাপকে জব্দ করছে টিয়ার দিদি। — চল বাপী, দেখে আসি টিয়াপাখি সংসার।

কাশীরাম সব জানে বিভাসই জানল না। তার নিঠুর দরদী প্রিয়তমার সকন্যা পরিকল্পিত প্রস্থানের সব খুঁটিনাটি কাশীভাইকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জানতে হল। তথ্যের চাপে বেচারা হাঁসফাঁস করছিল। উইন্ডো খুলে দিল কয়েকটা। খোলা হাওয়া আসুক। সেও জানাল তার ছাড়িগঙ্গা পর্ব বিশদে। আর বিভাসকে অবাক করে পিসি কাশীরাম অমৃতলাল হয়ে উঠল কম্প্যুটার জ্যোতিষী। গ্যাস খেয়ে জানাল পূরবীর প্রস্থান বিবরণের আরো বিশ্লেষণ। ছাড়িগঙ্গার অকুস্থল নিয়েও যুক্তিবাদি নিরীক্ষণ ইত্যাদির সত্যান্বেষণ অসমাপ্ত রেখে জানাল আপলিংক হারানোর জন্য দুঃখিত। কিসের আবার আপলিংক, পিসির কোন আপলিংক থাকে না। লেখক হওয়ার চালিয়াতি এসব। হিন্ট দিয়েই সরে গেল। জানা কথাকে সূত্র ধরবে কেন সে? ঠিক হ্যায়, বোকাকে বোকাই বানাতে হবে। বিভাস এখন সতর্ক হবে, সব বলবে না। গল্প বানিয়ে ডাটা দেবে। তখন দেখবে আপলিংকএর ফাজলামি কেমন হয়।

বিভাসের পরিবারে সবাই তিলকে তাল করতে ওস্তাদ। শচিরানি আর মিশ্র সাহেবপুঙ্গব নির্ঘাৎ এমন এক থ্রিলারে গরম খাইয়েছে যে খুনসুটি করার ডলিটাকেও বগলদাবা করে দৌড়ল। কেয়া কেয়া করে হিন্দিতে ডাকলে বাপের উপর হাত, চুলে মিঠু মিঠু টান মেরে বসে থাকলেও টাইমপাস মন্দ হয় না। একটু রিস্ক বেশি থাকে কেয়াবাত বন্ধ হয়ে যাওয়ার চান্স। স্যারি সোনামনি আর হবে না, রাগের পুতুলকে আদর করেও সুখ, প্রতিবাদ ত নেই। একজন বাপের একজন মায়ের হল কথার কথা। মা বাপকে বকলে দুজনেরই সুখ। মেয়ের মান ভাঙতে খড়্গ হাতে বাপের উপর ডাইনে বাঁয়ে কথার প্রহার শুরু হলেই মায়ের পিছনে যুগল চাঁদের উদয়

হয়। মুচকি হাসির চাঁদ। চাঁদের মা চাঁদকে নিয়ে গেল, তার রইল কি? ডালের চচ্চড়ি মাছের ডালনা রাঁধার সখা সুদামা আর এক অর্বাচীন আনফেইথফুল যন্ত্র। মুচকি হেসে মালিক ফাঁসাতে তো একটা মুখ চাই সে মুরোদও নেই মুখপোড়ার। মনিটার মুখে আপলিংক ডাউনলিংক এর গল্প শুধু। একা বাড়িতে অভ্যাসের বৌটার জন্য মন কেমন করে বিভাসের। ছাড়া শাড়িটাও গুছিয়ে যায় নি, গন্ধ শোঁকে বিভাস, অ্যালবাম খুলে মেয়ে দুটোর ছবি দেখে। সুখের শৈশব সুখি জননীর যৌবন দেখে এখনও মনটা হু হু করে ওঠে। নালন্দার লাল ইটের দেয়ালে একাকিনী বিরহিনী তার হেমামালিনী। মনের সঙ্গে পরিবেশের মিল থাকলে বিষয়ানুগ হওয়া যায়। এখন যেমন মনের ভিতর একাকার মেঘভার। একটু বৃষ্টি হতে পারত, নলবনের সামনে বারান্দায় দাঁড়িয়ে মনে করা যেত কোন অতীত স্মৃতি। কত কথার, না কথার স্মৃতি এই অলিন্দে। সত্যি মিথ্যে যে কত প্রগলভ, কত মিতকথন। কাশীরামকে একবার ইন্টারভিউ দিয়েছিল। একবার কেন কতবারই বলেছে গল্পের ভূত তার যৌবনোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গে তাকে পিঠে চাপিয়েছে। এই বাড়িটার প্রসেনিয়াম স্টাইল বারান্দার নলবনের প্রেমপ্রেম বাতাস তাকে আরো রোমান্টিক করেছে। বিয়ের পর থেকে কত কথা বলেছে নবীনা বৌকে। প্রাকবিবাহ প্রেমকাহিনী তার ডন জুয়ানকেও যাতে হার মানায় তাই সত্যি দুটো ফলস তিনটে জানিয়েছিল ফার্স্ট চান্সে। ভুল করেছিল, কাশীরাম জ্ঞান দিয়েছে, মেয়েরা শুধু শুদ্ধ বর্তমান নয় ক্লিন পাস্টও চায়। মেয়ে পুরুষের জীবন নিয়ে ঠাসা কারেক্টার ফিড করে রেখেছে ভিন্ন নামে। কাশীরামের ব্রেনে গন্ডগোল আছে, পূরবীকে নিয়ে যত গল্প বানাও আপত্তি নেই পরকিয়া কারেক্টারে নিজের নাম জুড়লেই বাইটস সমেত চিৎপটাং। কথা বলবে না, উল্টোপাল্টা জবাব দেবে। বুড়োদাদুর ব্রেনটা এবার স্ক্যান করিয়ে আনতে হবে ব্যাঙ্গালোর থেকে। নিজকিয়া পরকিয়া সব মিলিয়ে গল্প উপন্যাস বের করতে হবে থান থান।

দুই পাত্রী প্রস্থানের তিনদিনের দিন কাজের মানুষ সুদামা ওরফে ডাল ভাত মাছের ঝোলওয়ালা দামুর ক্যাজুয়েল লিভ আর কাশীরামের গোঁসা। ওয়ার্ক টু রুল পর্যন্ত নয় একেবারে কাম বন্ধ। চাক্কা জ্যাম!

অনবরত খোঁচাতে খোঁচাতে দুটো নব নন ফাংশানিং। উইন্ডো বন্ধ। এরকম দমবন্ধ গুমোট অবস্থায় আলোর ঝলকানি। হঠাৎ হাওয়া। আলোর আগে এল শব্দ ক্রি রি রিরিং। কেয়ার টেলিফোন।

বাপি তোমার মেয়েটা ভীষণ মিথ্যেবাদী। সন্ন্যাসিনী না কচু।

কেন কি মিছে বলল?

বাপি তুমি বলছ, কি মিছে বলল, তোমাকে নিয়ে কী কান্ডটাই না করল।

তাই?

হ্যাঁ, তোমার কটেজের সামনে যে ইয়াং মহিলা।

আমার কটেজ? ইয়াং মহিলা?

আরে না না, তোমার টিয়াপাখির লাললঙ্কা। স্টোরি বানিয়ে মাকে জানিয়েছিল। সব মিথ্যে আমরা দেখেছি।

ইয়াং নয় ঠিকই, একসময় ছিল। এখনও বুড়ি নয়, টু বি ভেরি প্রেসাইজ মাঝবয়সী বলা যায়। ঠিক কিনা বল।

নো ম্যান। সব ফল্‌স্‌। কোন মহিলার অস্তিত্বই নেই।

নেই মানে? হয়ত চেক আউট করে গেছে।

আরে না বাপি ওখানে এক ইয়াং ম্যান।

মানে যুবতি উধাও। রামকেলি চেঞ্জড টু যুবক। চন্দ্রকান্তার স্টোরি নাকি রে।

যুবক মানে ঐ আর কি। তোমার থেকে ছোট। মার ক্লাসমেট ছিল। বিয়ে করেননি। চাকরিবাকরি ছেড়ে চলে এসেছেন। সাধু হবেন।

তোর মার বন্ধু? ফ্রেন্ড? ঘনিষ্ঠ? কি নাম?

নাম বললি না, লীলাময় নয় তো? তোর মা বোষ্টুমির ভাব কেমন?

আস্তে বাপি, তোমার যা গলা মা পাশে দাঁড়িয়ে শুনছে।

লে এ গে যা? ভেল্কি এবার লাগল বলে। গল্প হবে না মানে! মোক্ষম মোচড়ের গল্প হবে এবার। সুখে সম্পদে বিভাস চৌধুরীর জীবন কেটে যাবে এলেবেলে, এ হতেই পারে না। ভারসাম্যহীন একা একা পুরুষ শুধু পরনারীতে ডুবে যাবে জ্যাবড়ে মরবে আর তুমি সতীসাধ্বী পত্নী নারীবাদের ফ্ল্যাগ ওড়াবে? এবার লীলাময় প্রসঙ্গ। হ্যালো কাশী, বাপ ভালো হয়ে যাও খেতে দেব দিস্তে দিস্তে কার্বন বিদেশি বাহারি ফ্লপি দেব পরতে। এ বড় সুখের সময় কাশীরাম। নাই চলেগা নাই চলেগা বলনেওলা আর কেউ নেই। সব সমান। একা বিভাস চৌধুরিকে আর একুশ নরক ঘুরে যন্ত্রণায় বিদ্ধ হতে হবে না। কী সব ডেঞ্জারাস হেল এক একটি। এবার রিলিভড, পয়েন্ট সমান, ওয়ান অল। এক নরেশ্বরীর গর্ব আর রইল না রাতের রাগিনীর। তোমা বৈ জানি না, চোখ তুলে তাকাই নি কখনও। কত না ছলনা জান! কতবার বলেছে বিভাস, বল না লীলাময় স্টোরি, বুকে টুকে হাত দেয়নি একবারও? সন্ধের পর রিক্সায় একটা তড়িৎ কিস্? সব তাতেই না। এবার? লালমোহনকে নম্বরটা দিয়ে এলে হত, আর কিছু টাকা। আপলিংক হারানোর ফাজলামি করলেও কাশীরাম একেবারে অকৃতজ্ঞ নয়। স্যরি, বলে নিজেকে শুধরে নিল। বলল এবার সে সিরিয়াস। আঙুলে পালকের পরশ লাগিয়ে জানাল সমাচার। তুমুল লীলা সমাচার। পিসিচন্দ্র তখন গল্পের ঝোঁকে জবাব দিল চটপট। ঘোর অনাচার চলছে মন্দির চত্বরে। ডিমসেদ্ধ নিয়ে আসছে লুকিয়ে, ভাগ করে খাচ্ছে দুজনে। ছুরি দিয়ে কেটে না হাত দিয়ে ভেঙে? ওহ্ নো রামুভাইয়া এ হতেই পারে না, পূরবী কামড় দিয়ে আধাআধি ভাগ করে খাওয়ার মানবী নয়।

জাগরণ আর বিভাবরী রোমান্টিক শব্দ হিসেবে জুতসই হলেও গল্পে কাব্যভাষা পরিত্যাজ্য। রাতে ভাল ঘুম হয় না বিভাসের। প্রথম প্রহরেই একটা বিভৎস স্বপ্ন দেখে। বধূ শুয়েছিল পাশে, চুরি করে নিয়ে গেল লীলাময় যুবা। অপহরণ। চিৎ শুয়ে সে সব দেখল। বুদ্ধি ফিরে এল যখন হারিয়ে গেছে তার মানবী। হারিয়ে যাওয়া প্রিয় সাথিকে খুঁজতে বেরোয় বিভাস রাতের দ্বিতীয় প্রহরে। এঘর ওঘর স্মৃতিময় অলিন্দ। শূন্য শয়ন শূন্য ভবন। কবিতার ভাষা

তাড়াতে চেষ্টা করলেও ভিড় করে এসে ওরাই তাকে বিদ্রূপে বিদ্ধ করে। হদিশ পাওয়া গেল, শুয়ে আছে ওরা। কেঁদে ফেলেছিল বিভাস। একতলার ভূগর্ভস্থ জলাধারে টর্চের আলো ফেলতেই সেনসেক্স নেমে গেল বিয়োগ অঙ্কে। ওরা সুখে আবেশে জলে জড়াজড়ি করে . . .। জলাধার তোলপাড় কর জল লেগেছিল তার গায়ে, চোখে। স্বপ্নভঙ্গের পরও জল লেগেছিল নয়নে। অসহনীয় স্বপ্নের কাছে বিভাস কৃতজ্ঞ রইল একটি কারণে। জীবনে যাকে কাঁদতে দেখেনি, দেখল। বটতলা বা বাংলাবাজারের কোন বই পুস্তক কিতাবও নেই হাতের কাছে। জলাধারে পরকিয়ার মত উদ্ভট স্বপ্নফল গুণতে পারে একমাত্র কাশীরাম। বিভাস অন্ধকার হাতড়ে জাগাতে চেয়েছিল কুম্ভকর্ণকে। কাকস্য পরিবেদনা। এক রাজ্যের বিদ্যুৎ ট্রিপ করেছে পার্শ্ববর্তী রাজ্য। কাশীবাবুর তাই গভীর নিদ্রাসুখ। একা বিভাসের অবুঝ মন তাও আদুরে ছোঁয়ায় ডাকে কাশী, কাশীরাম, রামুভাই। অন্ধকার চরাচরে তখন কাশীরামের চোখেই মমতার বিদ্যুৎ চমক। ভক্তের ভগবান ঘুমঘোরে জানায়, রাশ টু ছাড়িগঙ্গা।

গল্প উঠল লাটে। গরু চড়ল গাছে। যে ওপেল লবণহ্রদ আর মধ্য কলকাতা ছাড়া হাঁটেনি, দৌড়ল ভোর ভোর। উত্তর চব্বিশ পরগণার সীমানা ছাড়িয়ে। দুঘন্টায় গৌরাঙ্গ সেতু পার হয়ে ছাড়ি গঙ্গা পারের মন্দির কুটিরে। নিতাইচাঁদের প্রাঙ্গণে গাড়ি ঢোকার মৃদু চেনা শব্দে বোষ্টুমি খুকি বকুলমালা গাঁথতে গাঁথতে মুখের স্মিত হাসি প্রসারিত করে বড় খুকি কেয়াফুলে। অভিমান হল বিভাসের। মুখ তুলে তাকাল না পর্যন্ত জোড়া আত্মজা। তুমি কার কে তোমার! বাপকে নিয়ে কোন চিন্তা নেই। গর্ভধারিণীরও যে দেখা নেই। সাতসকালেই কি বেরল ডিম কিনতে না কোন দুঃস্বপ্নের জলাধারে। কেউ বুঝবে না কী দুঃসহ যন্ত্রণায় রাত কেটেছে তার। দিন ঢল যায় রাত না যায়ে। শচীন কর্তার সুরে মোক্ষম গানটি কেন যে মনে পড়ল না রাতে ?

পালের গোদা সাহেবটিকে ধরাছোঁয়ায় পাওয়ার যো নেই। বোকা বৌ বোষ্টুমি আর কতক্ষণ সাসপেন্স টিকিয়ে রাখতে পারে। ফোড়ন কাটে।

একটু অ্যাডভান্স হয়ে গেল বাপি। মা বলেছিল আটটা। গাড়ি নিয়ে বেরবে মা কাউন্ট করেনি।

রাইট। কার ক্রেডিট বল?

কিসের ক্রেডিট !

বা তোর মাকে বরাবর ভুল গুণতে কে শেখাল বল?

ও বাপি। দেখ দেখ তোমার গঙ্গা কেমন ময়লি।

বিভাসের রাগ জল হয়ে যায় এক মুহূর্তে। ছুটকি বড়কি সাহেব সব ষড়যন্ত্রকারীদের এক কথায় মাফ করে দেয়। হাসিতে হাসতে মিলন হয় অবিশ্বস্ত স্ত্রীর সঙ্গে। গঙ্গা নেয়ে এসেছে তার বৌ। ষোড়শী পূরবীকে দেখেনি জীবনে। জল টুপটুপানো স্ত্রীকে দেখে পথের ক্লান্তি রাতের যন্ত্রণা কন্যা যুগলের অসহযোগিতা, নতুন পুরুষ চরিত্র, গল্পের নতুন বাঁক, সম্ভাবনা সব ভুলে বিভাস উদাত্ত ধ্বনিময় হয়ে ওঠে।

তুমি সদ্য স্নান করি দীর্ঘ আর্দ্রকেশজালে নবশুক্লাম্বরী মূর্তিমতী ঊষা।

বাপি, হাতে সাজি। দুই ফিচেল কন্যার হাতে পুষ্পরাজি। বকুল ফুলের মালা। কাশীরাম দুষ্টুমি করলেও এমন মুহূর্তে মোক্ষম করণীয় জানিয়ে দেয়। তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে সে সদা সপ্রতিভ। বিভাসকে না যাওয়ার ন তস্থৌ করে পূরবী কুটির অভ্যন্তরে। 'ছি' শব্দে কী সন্দেহ না হতাশা? প্রেমের কবিতার উদ্দেশ্য যে তাকেই সে নিশ্চয়তা কোথায়, রামকেলির কাজল যে রয়েছে চোখে! ষোড়শীর ব্যাকুলতা নিয়ে যখন সদ্যস্নাতার বন্দনা শুনছিল তখন কী সেই পুরুষ ভেবেছিল? যে বসিয়া আছে সম্মুখ কুটিরে ? এদিকে রামকেলি ওদিকে ভিন্ন পুরুষ। বিব্রত বিভাস। মনে মনে ডাক পাঠায় তার বিপত্তারণ কাশীরামকে। ত্রিশঙ্কুর মতো কুটির বাহিরে একা পথিক বিচরণ শেষে সাধু সাধুনির বদান্যতায় একটি গৃহাভ্যন্তর তার প্রাপ্য হয়। অপরিচিত দুই পথিকের ডবল অকুপেন্সি রুম। দিন কাটল নিজের মত, কথা না থাক, পাশে ত আছে কেউ। রাতে থাকলেই হল, নাকি আবার কেয়াটা একা শুতে পারে না বলে চকমা দেবে? থাকে যদি কপালে নাইটমেয়ার বাঁচাবে কে?

রবীন্দ্রনাথকেও কম বিব্রত করেনি বেয়াড়া স্ত্রীরত্ন। বিভাস সেখানে কোন ছার। বালিকা মিনি প্রশ্ন করেছিল সাদাসিধে 'বাবা, মা তোমার কে হয়?' শ্যালিকা ছাড়া কীইবা জবাব দেওয়ার ছিল বিভ্রান্ত স্বামীর। বিপবিপ বুকপকেটে কানের কাছেও যেন কার ফিসফিসানি। কাশী ত গৃহবন্দী সল্টলেকে। এদিকে স্পষ্ট কাশীরামের বার্তা, গেট রেডি, মেঘৈর্মেদুরঅম্বরম ইত্যাদি ইত্যাদি। সেজেগুজে তৈরি হয়ে নাও। মনে ছিল আশা, এরকম একটা সিগনাল কল্পনায় ছিল তাই মুগার পাঞ্জাবি সেটটা ঢুকিয়েছিল স্যামসোনাইট বাক্সে। অবিশ্বস্ত পত্নীর আগ্রহে বানানো। আড়চোখেও কী একবার দেখা যায় না। বলা যেত, কেমন লাগছে গো? কোন মানুষের নয় ভূমি ড্রেসিং টেবিলের ওপর বটুয়া থেকে পারফিউম নেওয়া যায়। সুগন্ধের পরশও কোন প্রতিক্রিয়ায় ফেরে না। বিভাসের আড়চোখ কিন্তু দেখে ভারিক্কি বালুচরীর সুন্দরীকে। ফুলিয়া থেকে কিনে দিয়েছিল। একই সুগন্ধ ফ্রিশ ফ্রিশ। তার মানে বেড়ি রাধিকা কহু ঘর নিয়ে জারী। ঘর মানে ত সংকেতস্থান। ছাড়িগঙ্গার দেশে লালমোহনের ছড়াছড়ি। তিন চাকার রথের খোঁজে বেরোতেই পূরবীতে হয় বন্দিশ, হাতে ওপেলের চাবি দোলে।

সন্ধ্যার আঁধার নিবিড় হয়। বিভাসের মনে দোলাচল। একদিকে রামকেলি অন্যদিকে অনামী পুরুষ। রামকেলির কথায় হেসে উঠল বিভাস, পূরবীর শরীরেও লীলাময় হাসি। ছাড়িগঙ্গার পাড় ভেঙে উছলে উঠল জলরাশি। হাসির গাড়ি থামল বাঁধানো ঘাটে। উদ্বেলিত উত্তেজনায় ব্রেক কষল জোরে। স্যরি, বিভাসের হাত বালুচরী কাঁধে, হড়কায় না। কিছুক্ষণ থাকে, অদক্ষ কুশীলবের যা হয় প্রম্পটার ছাড়া থেমে থাকতেই হয়। স্ক্রিপ্ট প্লীজ কাশীরাম? বিভাসের আকুলডাক দূর লবণহ্রদে পৌঁছায় না। তাই নিজেই তৈরি করে সংলাপ।

নেই, গল্পটল্প নেই কোথাও।

কেন কামকেলি কথা?

অ্যাঁ!

হ্যাঁ।

আরেকটাও আছে।

ওটা কাশীরাম জানে না। ফিড করা হয়নি।

হয়েছে। লীলাময় প্রসঙ্গ জানে রামু। জানে বলেই ত জট খুলে গেল। একটু বিশ্বাস করলে কী হত বুড়ি।

বিশ্বাস করলাম বলেই না হ্যান্ডসাম বুড়োর গল্প।

বুড়োবুড়ি সে রাতেই পালিয়ে যায় লবণ হ্রদে। আর উল্টোপাল্টা ডাটা পুরে কাশীরামের বোকামি দেখে দুজনে। হাসতে হাসতে বিভাস গল্পের নটেগাছটি মুড়িয়ে দিতেই— পূরবী 'ছি' শব্দে গড়িয়ে পড়ে মুগার পাঞ্জাবিতে।

মুখাবয়ব, ১৯৯৮

মতামানুষ কথা

মতামানুষ কথা

রঙ্গীকে নিয়ে সবার সামাল সামাল। কেন? শ্যামসাহেবের সঙ্গে চাপানউতোর খেলা না চালালে কী কেউই ওরা জীবন খুঁজে পেত ? ওলাই-ওলাই আ, জীবন খুঁজে পাবি । টেলিফোনে গান গেয়ে মামা ভাগ্নিকে ডাকে । ছোট মামা বলিন রাজখোয়া । বলে, ভূপেনদার জীবনেও অনেক দুঃখ । মামারা ভাবে রঙ্গী বিষাদে ভার হয়ে আছে । দুঃখ কাটাতে গৌহাটি থেকে ডাকে । ছুটে ছুটে আয়।

জীবন খুঁজতে রঙ্গী বেরিয়ে পড়ে । গৌহাটি সে যেতে চায় না । মামারা জোর করে নিয়ে যায় । শ্যামসাহেব বলেন, নদী পাহাড় ভাঙে কাহার টানে? মামা ভালোবেসে ডাকে তাই বাধা দেন না । তবে মার চেয়ে মামার এই অধিক দরদও অর্থহীন ।

নতুন পৃথিবীজাত শিশুকে ফুলের কাছে নিয়ে যাওয়ার গল্প রঙ্গী পড়েছে । ফুল সুবাসের বদলে দুর্গন্ধ ছড়াত, হাত দিলে বিদ্যুৎ । সংগীত কর্কশ চিৎকারে শেষ হত । শ্যামসাহেব স্নেহপ্রবণ পিতা । জন্মের পর রঙ্গীর একটি ছাড়া অন্য কোনো অনুভূতিকে ভোঁতা হতে দেননি । নিষিদ্ধ দেশ গৌহাটিতে পাঠিয়েছেন বারবার । হোস্টেল থেকে বাড়ি গৌহাটি ইটো সিটো কত জায়গায় গেছে রঙ্গী। পাঠিয়েছেন শ্যামসাহেব । রঙ্গী ছিল তখন হ্যান্ডব্যাগেজ । কখনও শ্যামসাহেবের হাতে, কখনও বলিন মামার । উষা-আন্টির কাছ থেকে ডেলিভারি । লাগেজ বুকিং হয়েও গেছে । এয়ারপোর্ট টু এয়ারপোর্ট ডেলিভারি ।

ট্রেনেও গেছে । কুমারসাহেব এসে নিয়ে গেছেন ভিটি থেকে । কাকা ভালো। কাকির ইশারা থাকত নয়না ত্রিপাঠির দিকে । রঙ্গীর জীবনের ঘুষঘুষে জ্বর এই কুহকিনী থাকেন ভাসিতে। লিভটুগেদার শেষে ম্যারেড এখন । পঁচিশ বছরের এক অবিকল মুখশ্রীর অধিকারিণীর ছবি রেখেছে সে তার অর্কিডঘরে । রঙ্গী বম্বে থাকেনি । ফিরে এসে শ্যামসাহেবকে অ্যাটাক করেছিল । বাইশ বছরের মেয়েকে যাচাই করতে সাগর পারে পাঠিয়েছিল বাপ। জীবনের প্রথম কুড়ি বছর যে দুয়ারে কপাট দিয়ে কাটিয়ে দিল, আরো কুড়ি কুড়ি বছরও সে কাটিয়ে দেবে ঠিক । বাপের মেয়েকে শ্যামসাহেবও বোঝেন না ।

বোঝে না তার মামারাও । ঘুরেফিরে এক কথায়ই চলে আসে গৌহাটির দুই মাছের ব্যাপারি রাজখোয়া । বলে যায় শ্যামসাহেবের গুণপনা । বলে, দু-ভাই মিলে পিটিয়েছিল তার

বাপিকে । বেধড়ক পেটানো । অনুশোচনা দগ্ধ হওয়া বড়মামার তোম্বা ফোলানো যশুরে কইমার্কা মুখশ্রী দেখে করুণাও হয় না রঙ্গীর । সংক্রান্তি পুরুষ সাজা ছোটমামা অনুতাপে গম্ভীর হয়ে যায়। কিছুই করার নেই রঙ্গীর । ছাইপুরী সুবর্ণপুরী করার ম্যাজিক যে জানত সে চলে গেছে কুড়ি-বছরের পার । রঙ্গী ওসব অনুতাপের মর্ম বোঝে না । কিসের অনুতাপ ? বোনের জন্য যাকে হাড়ভাঙা মার মারল তারই মুখের দুটো কথা শোনার আকুলতার মানে নেই । গৌহাটির এই চাতক দুটিকে সারাজীবন অপেক্ষা করে থাকতে হবে । রঙ্গী জানে শালাদের জন্য শ্যামসাহেবের কোথায় পোড়ায় ! আবার নাম করলে বিরক্ত হয় । অকাল বর্ষণের কোনো স্থান নেই তার জীবনে । নয়না ত্রিপাঠির ভাইদের দেখলে তাই রঙ্গীও বিরক্ত হয় ।

এতদিন সে গৌহাটি যেতে চায়নি। প্রাক্তন শালারা উষা আন্টির কাছ থেকে ডোলিভারি চেয়েছে, শ্যামসাহেব ট্যাগ লাগিয়ে দিয়েছেন । এবার পালা জেদের । বাইশ বছরের মেয়েকে আটকে রাখবেন । বাপের বেটির থোড়া থোড়া কথাটা তো আর মিথ্যে নয় । বারো বছরের বেণী দোলানো বাচ্চা সামগ্রীও নয় সে এখন । বিনন্দ হাজরিকার ভয় শ্যামসাহেবকে গিলে খেয়েছে । বাপি কি দেখেছে কখনও সেই অসমিয়া যুবককে ? ভিতু যুবক মতামানুষকে ? সব তো শোনা কথা । ভিকি খোঁজ খবর নিয়েছিল । ওরকম নামের কেউ নেই গৌহাটিতে । সব স্টোরি । তাও বিশ্বাস হল না । ভিকি ইজ ইওর ম্যান শ্যামসাহেব! মেয়েকে দান করে রেখেছে যার কাছে । গৌরীদান, বাল্য প্রণয়ের প্রেরণায় । বনের বাঘে নয় মনের বাঘে খেয়েছে শ্যামসাহেবকে । ভিনদেশি যুবকের সাথে কী কথা? তার সাথে তাহার সাথে ? অন্যের কবিতা কত বলে বলে যান শ্যামসাহেব । যেয়ো নাকো, কয়ো নাকো, বোলো নাকোর প্রতিবন্ধকতা দিয়ে মেঘ ও রৌদ্রের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি রুদ্ধ করতে পারেনি কোনো আত্মভোলা কবি! আত্মজা-হারানোর অলীক বর্ষণসিক্ত শ্যামসাহেবকে দিশাহারা করে রঙ্গী হয় উদ্দীপ্ত । বৃষ্টির সুবাস বয়ে দ্বৈরথে পিতাকে সম্ভাষণ জানায় । বলে, বলো কার কবিতা 'ভক্ত বহে বিদ্রোহের ধ্বজা' ?

শ্যামসাহেবও রঙ্গীকে বুঝলেন না। না বুঝলেন নাই । রঙ্গী তো পিতায় স্বর্গ কল্পনা করে। পিতার ধর্মকেই গ্রাহ্য করে বাইশ বছরে একবারের বেশি স্নেহময় কাকার বাড়ি যায়নি। পিতাকেই মূলাধার করেছে তার সব অভিমানের। পিতার সঙ্গে চাপান উতোর খেলাকেই রঙ্গী তার জিয়নকাঠি মেনেছে। তাই, গৌহাটী সে যাবেই এবার । বিনন্দর ডাক সে অগ্রাহ্য করতে পারে না । মতামানুষ বিনন্দ সকলের থেকে আলাদা ।

বিক্রম তার নির্ভরতাকে আঙুলে নাচানো পুতুল ভাবে । ভাবুক, রঙ্গী এবার বাইশ বছরের ভুল নির্বাচন শেষে মুক্ত হবেই হবে। ভিকি ওকে দুলালী বলে বিদ্রূপ করে । উষা আন্টি ওর সারল্যকে ছেলেমানুষি ভাবেন। মামারা তাকে ভুল লোভ দেখায় । অগাধ সম্পত্তি দেখিয়ে স্নেহ দিতে চায় ।

বলিন পুলিন দুই মামা রঙ্গীর। অন্ধ্র গুজরাট থেকে মাছ আসে রাজখোয়াদের আড়তে । ছোটমামা বলেছে ইলিশের ব্যবসা শুরু হলে রঙ্গীকে বাংলাদেশ নিয়ে যাবে। ঢাকার রিক্সাওয়ালাদের জোক্‌স খুব পপুলার। বাংলায় কী করে মজার মজার কথা বলে শোনার খুব ইচ্ছে রঙ্গীর । মামা নিয়ে যাবে বলায় সব উৎসাহ আর বেরোবে না মেঘের ভিতর হারিয়ে যায়।

কলকাতার আকাশে মেঘ নিয়ে গিয়েছিল গৌহাটি । বরঝাড়ে নেমে মেঘমুক্ত আকাশ । মামাদের সঙ্গে একটা লাভ হেট সম্পর্কও তো অস্বীকার করতে পারে না । শ্যামসাহেব এটা জিইয়ে রাখতে চেয়েছেন । তাই নিঃসম্পর্কেও কেমন রঙ্গীকে জুড়ে দিলেন।

পুলিন রাজখোয়ার প্রতি একটা আকর্ষণ তার রয়েইছে । জব্বলপুরের কুটিপিসি বলে, কম কথার মানুষ পুলিনের কথা আর মন দুটোই তার চোখে। ঈর্ষণীয় দৈহিক সৌন্দর্যের অধিকারী পুলিনমামার চোখের ভাষায় কুটিপিসি কোন সর্বনাশ দেখেছিল ? অসমাপ্ত গল্পকথার ব্যর্থতা কি ? পঞ্চাশোর্ধ্ব, এখনও বিয়েই করল না। মানুষটি হয়ত ভালই। ছোটমামা ভয় পায় খুব। বলে, পুলিন নয় পুলিশমামা।

ছোটমামী কখনও লাঠি হাতে আসেনি। মামাতো বলার মতো কেউ নেই বলেই মামীর পক্ষপাত রঙ্গীর প্রতি । মামীতে মাতৃস্নেহে মমতায় ঘিরে রাখার ব্যক্তিত্ব নেই। মামাদের একমাত্র নিম্নগামী অবলম্বন জেনেছে বলেই রঙ্গীর উপেক্ষা সয়েও বন্ধুত্বে সহজ সুন্দর ।

ছোটমামীর মেখেলার পটাশ পটাশ শব্দ তুলে হেঁটে উঠেছিল শরনিয়ার পাহাড়চূড়ায়। গৌহাটির বাসে চড়তে খুব মজা। কলকাতার মতো নিলাম বাজার নয়। ভবানীপুর এক , জগুবাজার দুই, শোভাবাজার তিন, ভি আই পি রাম জয়া লেকটাউন জোড়ামন্দির রথতলা হালতু সাত আট নয় দশ এর বাক্স পেঁটানো মুড়ি ঠাসা তো নয় । বাঁধতে হলে 'রব' আর চলতে হলে 'যাব দিওক । বেশ মজা । লাচিতনগর থেকে মেঘদূত । 'বেদের মেয়ে জোছনা' চলছিল মেঘদূতে। বাংলা সিনেমা দেখতে এত লম্বা লাইন! কিছুক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে চৌধুরিদা বৌদিকে লাইন দিয়ে রিক্সা করে চলে এসেছিল । ভেবে মরুক মানুষদুটো কে 'চৌধুরিদা' আন্দাজ করে। উলুবাড়ি চারিআলিতে মিষ্টিমুখের সামনে নেমেছিল। মুগার কাপড়েব একটা মচ্‌মচ্‌ শব্দও ছিল। মামীকে বলেছিল, মেখেলা কাপড়গুলো শাড়ি নয় কিছুতেই । ঘের বড় কম । মাপা।

বিনন্দ বলেছিল, ওকে নাকি দারুণ সুন্দর দেখাচ্ছিল । অসমিয়া মেয়েদের মতো অবিকল। রঙ্গী অবাক হয়ে বলেছিল, কী রকম ? বিনন্দ দুম করে কথা বলে । কথার পিঠে কথা এলে সর্বনাশা হাসি দিয়ে জবাব দেয়। শরনিয়ায় পাহাড়চূড়ায় কথা হচ্ছিল যখন, তখনই এল বৃষ্টি ঝেঁপে। রঙ্গী নবীন বৃষ্টিকে জড়িয়ে উঠোনে কয়েক পাক ঘুরে প্রশ্ন করেছিল, বলো ? বিনন্দ বলেছিল এনেকা। মানে এরকম । নৃত্যরতা রঙ্গীকে সুন্দর দেখেছিল।

বিনন্দই কেন রঙ্গীর বডিগার্ড ঠিক হল সেবার, কিছুই জানে না সে। বিনন্দ ওদের পরিবারের না ব্যবসার কেউ, তাও জানে না। মামা মামীদের সংসারে এই চতুর্থ সভ্য যে মাধবকাই-এর উপরের স্তরের, একটু জানতে পেরেছে । আত্মীয়ও নয় মামাদের, বন্ধুও নয়, কর্মচারী নয়। বিনন্দরা হাজারিকা । পদবি দিয়ে কিছু বোঝে না রঙ্গী । নয়না রাজখোয়া কতদিন আর শ্যামসাহেবের পদবি ধরে রাখতে পেরেছিল ? শ্যামসাহেবের অনেক স্বভাব বিনন্দতে আছে। বিনন্দও রাজামানুষ, তার মর্জির মালিক। মতামানুষ কথায় কথায় কবিতা বলে না। মতামানুষ গান গায়। বিহু গান। নাচে ভীতু মানুষের দেহশ্রীতে কুঁদে বসানো গ্রিক পুরুষের কাঠামো । মামাদের সঙ্গে ব্যবহারের বিপ্রতীপে বিনন্দকে বলেছিল রঙ্গী, অসমের মানুষরা বড় ভালো । আসলে বিনন্দকেই তার ভাল লেগেছিল । বিনন্দ বলেছিল, অসমে সমুদ্র নেই, আকাশ আছে নীলে নীল। ছায়াময় আকাশ

ঝেঁপে বারিপতনের বিশালত্বের যেমন তুলনা নেই। তুলনা নেই তার বিশাল নদী লুইতের। লুইতের মতো মানুষের মনও বিরাট বিস্তৃত। মতামানুষ বিনন্দ গায়ে পড়া কথা বলে না, কথা বলে সাজিয়ে। মনের কথা বলার জন্য যেন ঘাপটি মেরে থাকে।

ইম্পোর্টেড গাড়ি চেভরলেট-এর কাছে মারুতি কনটেসা দাঁড়ায় না। মামার নতুন গাড়ি নিয়ে কামাখ্যা গেল। সঙ্গে নেভিগেটর বিনন্দ। কামাখ্যা থেকে পাকদণ্ডি পথে চূড়ায় ভুবনেশ্বর শিবের মন্দির। ওখান থেকে দেখিয়েছিল উমানন্দ শিবের বাড়ি ব্রহ্মপুত্রের চরে। কর্মনাশা আর এক চর। আমিন গাঁও-এর দিকে ছোট চর দেখিয়ে বলেছিল 'বিচনি পাহাড়'। বিচনি মানে পাখা। পাথরের উপর ক্লান্ত অশ্বক্ষুরের দাগ এখনও মহাভারতের যুগকে ধরে আছে। রঙ্গী অবাক হয়ে শুনেছে। ভুলে গেছে এই পাহাড়ে অনেকবার সে চড়েছে। রঙ্গী নতুন করে শুনল বিনন্দর মুখের ভাষা। অসমিয়া ভাঙা বাংলা আর আকাশ ভেঙে বৃষ্টির ভান নতুন করে সব দেখায় অনুপ্রাণিত করল। দীর্ঘাঙ্গ মানুষটিকে বলেছিল —

দেখাবে ?

কেন নয়। আমার তো এইই কাজ।

চলো, তবে যাই।

চলো বললেই যাওয়া যায় ?

যায়। রঙ্গীর জেদের ওপরে যায় রাজখোয়াদের পোষ্য ছেলেটির গোঁ। এখন যাবে না। ওখানে এরকম যাওয়া যায় না। ফেরি সার্ভিসে যেতে হবে। বৃষ্টিতে অনেক ঝেঙ্গ, অন্যদিন যাবে। লঞ্চ অনেক চড়েছে রঙ্গী। নৌকোতে যাবে দুজনে ভিজতে ভিজতে। রঙ্গী আর বিনন্দ। ভীতু বিনন্দ যাবে না। বিশাল গ্রিক ভাস্কর্যে গতি ফেরানোর উপায় জানা না থাকায় তখনকার মতো প্ল্যান বাতিল হয় রঙ্গীর।

রঙ্গী পালাল আবার। ব্রহ্মপুত্র পারাপারের কৌতূহলে ভর করে রঙ্গী পালাল এবার। বাস নয় রিক্সা নয় অটো করে ফ্যান্সিবাজার হয়ে চলে এল মহাবীর পার্কের পেছনে বিস্তীর্ণ নদীতটে। আধকিলোমিটার বালুপথ পেরোতে ভালো লাগছিল না। শহরে দুর্গন্ধের থোকা পেরোতে বিরক্তিকর একা দোক্কায় ভুল হচ্ছিল বারবার। দিঘা-পুরীর সৈকত নয় তবু পেরিয়ে এল কাদাবালির ভেজা তটে। বড় বড় নৌকোর কোনোটায় মাঝি রয়েছে, কোনোটা দুলছে একাকি। একা নৌকোয় ওঠার সাহস না করে মাঝিদের অনুনয় করে। সাড়া দেয় না কেউ। একা রঙ্গী নদীকূলে বিমর্ষ হয়। ধুলো উড়িয়ে ঝড়ের চোখরাঙানিতে ব্যতিব্যস্ত হয়। কোমরের কাপড় রিহা আর মুগার মেখেলার ঝাপটাঝাপটি সামলায়। মামীর মেখেলা চাদর ছাড়া কিছুই পরছে না এ যাত্রা। পিঠের আঁচল টেনে বাঁ কোমরে শক্ত করে গোঁজে। ঝড়ে যাওয়া থেকে উড়ে যাওয়া থেকে নিজেকে বাঁচাতে বাঁচাতে কাঁধের ফিতে কাঁধ থেকে নেমে যায়। ফিতেয় বাঁধা ছাগশিশুকে প্রায় জলসমাধি থেকে বিচিত্র উপায়ে রক্ষা করে বিনন্দ। কাঁধের বিশাল ব্যাগ। উস্কো খুস্কো ধুলো উড়িয়ে বিনন্দ। কামাখ্যা পাহাড়ের ভীতু বিনন্দ। রঙ্গীর তখন রাগ ও আনন্দ যুগপৎ। প্রকাশ প্রথমটিতে হয়।

কী ব্যাপার, গোয়েন্দাগিরি হচ্ছে, না? বিনন্দকে এখন তার প্রয়োজন। একটু তাতিয়ে দেওয়াও দরকার।

আজ যাইনি শরনিয়া, অন্য জায়গায় গিয়েছিলাম, পলাশবাড়ি।

সে কোথায় ?

অনেকদূর, ইউনিভার্সিটি ছাড়িয়ে ।

আমাকে নিয়ে যাবে ? কী করতে গিয়েছিল? তুমি ধুতিও পর?

না, না। হাতের সাদা ফুল আঁকা গামছা কোমরে বাঁধতে বাঁধতে গর্বভরে জানায় ভীতুমানুষ। বিহু উৎসব ছিল পলাশবাড়ির বিহুতলিতে ।

বিহুতলি?

বিহু আমাদের জাতীয় উৎসব । রঙ্গী অবাক হয়ে বিনন্দর কথাবলা মুখের দিকে তাকায় । বিনন্দ বলে, যাবে ওপারে ?

নিয়ে যাবে?

চলো, দেখছি। মাঝি একজনকে ডাকে। এই, হুনা নাও এখন দিবা নাকি। মই বিনন্দ আরু এয়া বলিনদার ভাগিনীয়েক, কিমান লবা? দরদাম কিছু একটা ঠিক করে। বড় নৌকো একখানার কাছি খুলে নেয় কাঁধে। নির্ভয় নিপুণ জলের সঙ্গে সখ্য। আবার বেঁধে দেয় । রঙ্গীকে বলে, উঠে বসো নৌকোয় আমি কিছু খেয়ে আসি। খেয়ে বেরিয়েছ? একটুক্ষণ মাথা নুইয়ে পরমুহূর্তে সপ্রতিভতা ফুটিয়ে মুখ তোলে, ছাগশিশুর চেন খুলে বিজরেলির বোতল বের করে হাসে। বলে—

জলও আছে।

সে তো বুঝলাম । খাবার আছে?

আছে । পাটাতনে ঠিক করে বসে ব্যাগের ভিতর শেখ ব্রাদার্স-এর পলিপ্যাক দেখায়। নৌকোয় উঠে এদিক থেকে ওদিকে ঘুরছিল । নাচছিল নৌকো দুলিয়ে । বিনন্দ সাবধান করে।

পড়ে যাবে।

তাতে কী আছে । স্যুইমিং জানি।

ও স্যুইমিং-এ কিছু হবার নয় লুইতের কাছে। উপর দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই।

উপর দেখে? মানে?

লুইত বড় অভিমানী নদী। মতা নই তো।

লুইত, মতা নই? মানে?

লুইত মানে বুড়া লুইত । আদরের লোহিত । ব্রহ্মপুত্র আমাদের মরমের নদী। আমাদের দুঃখেরও নদী। লোহিত কিনারে দেখনি? মতা মানে পুরুষ। মাইকি মানে তোমরা।

আহারে মতারে। কটাক্ষে বৈঠা ধরে টান দেয় বিনন্দর হাত থেকে। টালমাটাল নৌকোর মাঝের পাটাতনে বসিয়ে দেয় রঙ্গীকে। আর তখনই 'ওয়াক' বমির ভাব হয় রঙ্গীর। আঁশটে মাছের গন্ধ। সামলে নেয়। তবু ভালো। বালির উপরের গন্ধ থেকে ভালো। মাছের গন্ধ বিনন্দকে বিব্রত করে না। এত তীব্র গন্ধ, তবু? মানুষটা কি মৎস্যজীবী? বিনন্দ গলুই-এ পৌঁছে বৈঠা দিয়ে মাটিতে ঠেলা দেয়। নৌকা দেয় ছাড়ি। বৈঠা রেখে রঙ্গীর সামনে হাত পাতে অঞ্জলি ভেঙে।

কী হল, খাবার কোথায়? রঙ্গী অতি সন্তর্পণে দুটো প্যাটিস একটা প্যাস্ট্রি বের করে দেয়।

একা খাব? বিব্রত রঙ্গীতে খিদের দাপট যেমন, দুর্গন্ধের ধমকও তেমন প্রবল। প্যাটিস একটা বের করে। হাতে ধরা, তাতেই ক্ষুধার্ত বিনন্দর ভদ্রতা মাত্রা খুঁজে পায়।

খাবে না? বিব্রত রঙ্গী অনুনয়ে জানায়, ওপারে গিয়ে খাবে। দুপুরের রুটি সারাদিনের খুঁটি হয়ে বিনন্দর বৈঠায় এখন শক্তি আর গতি। ব্রহ্মপুত্রের স্থির জলে ডিঙা ভাসে, ভাসায় দক্ষ নাবিক। মাঝে মাঝে হাত দিয়ে জল তোলে, চোখ মুখ চুলে ছিটোয়। কোমরের গামছা খুলে মোছে হাত মুখ চোখ মাথা। রঙ্গী দেখে মুগ্ধ দৃষ্টিতে, আর মৎস্যগন্ধ থেকে ধীরে ধীরে নিজেকে মুক্ত করে। রঙ্গী ভীতু মানুষকে খোঁচায় আবার।

কোথায় যাচ্ছি আমরা? নৌকো যে নড়ছেই না। বলেছিলে নৌকো করে যেতে যেতে গল্প বলবে, গান গাইবে? বিনন্দ হঠাৎই কাজ পেয়ে যায়। একা একা জল বৈঠা গামছার নীরব সখ্যতা কাটিয়ে উঠে দাঁড়ায়। গেয়ে ওঠে গান, ডিঙা ভাসাও। রঙ্গী গায় গান। প্রতুল মুখুজ্জের গানের এক লাইনই জানে। বিনন্দ বৈঠা ঘুরায় পশ্চিম দিকে।

ঐদিকে তাকাও। রঙ্গী তাকায় বিনন্দর দিকে। এমন উন্নত, এমন সুন্দর দেহশ্রী এদেশে হয় কী করে? রঙও ঈর্ষাজনক গৌর। বিনন্দর ধারাবিবরণী থেকে কিছু অংশ বাদ পড়ে যায়।

কামরূপের রাজা নরকাসুর স্বর্গের সিঁড়ি প্রায় সম্পূর্ণ করে এনেছে। এরপর সে হবে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর। রঙ্গী এবার কথার ভুলে বিরক্ত করে কথককে।

কামরূপে সাগর নেই, পৃথিবী নয় এই ছোট ভূখণ্ড।

আরে বাবা, এইঠো হলো কথার পিঠিত কথা। তার পিছতে কী হলো জানানে?

আবার অসমিয়া? বলেছি না, বুঝি না।

মাতৃভাষা না জানা অপরাধ। বিনন্দর ভেংচিতে রঙ্গীর মনের প্রকাশ মুখে নেমে আসে হঠাৎ। সুন্দরী রঙ্গী গাত্রবর্ণে মামাবাড়ির ব্যতিক্রম। তামাটে, বাপের বাড়ির রঙ। মাকেই পেল না যে মেয়ে, তার মাতৃভাষা! বিনন্দর কথায় লাল রঙের রক্ত ছিটিয়ে পড়ে তার মুখে। রক্তের রঙ বদল হয়, অভিমানে কালো হয়ে যায় মুখশ্রী। বিনন্দকে বলে,

ফেরাও নৌকো। বিনন্দর ধারাভাষ্য তখন অনবরত। রঙ্গীর শ্রুতি থেকে আবার কিছু বাদ পড়ে।

উমানন্দ ভৈরবের আশীর্বাদ নিয়ে শুরু হবে যুদ্ধ। যুবাশিষ্য পার্থের দৃষ্টিতে তখন সহস্র যোগিনী। ক্রুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিপাতে যোগিনীরা নাগিনী হয়ে কর্মনাশায় নিক্ষিপ্ত। ভগবানেরও ভুল হয়, এক করতে গিয়ে হয় আর। কর্মনাশা আড়াল না করলে বিজয় অসম্ভব। চক্রধারী তখন এক অভিনব উপায় স্থির করলেন। বলো তো কী?

কী আবার। মেঘ দিয়ে ঢেকে দিলেন চরাচর। যেমন করেছেন সর্বদা। এই তো দেখ না কিছুই দেখা যাচ্ছে না। না তোমার কর্মনাশা না কামাখ্যা। কামরূপে আসামে মেঘ বৃষ্টির কোনো সময় নেই। আকাশ ঝেঁপে আনন্দ যেমন, দুঃখেরও ধারা হঠাৎ অবিরাম। বৃষ্টির ফোঁটা রঙ্গীর কোমর ছুঁয়ে গেল চকিতে।

না না ম্যাডাম। কোনো ম্যাজিক নয়। হাতপাখা। উত্তর পারে গেলেই দেখবে, নদীর উপর এক বিশাল সাইজের হাত পাখা ফেলে রাখা আছে। বিচনি পাহাড় বলি আমরা। আর দেখবে তীরের পাথরে ক্লান্ত ঘোড়ার ক্ষুরের দাগ। অনেক অনেক ছাপ পাথরে। কী করে হয়? তরণী দুলে ওঠে। চকিতে আকাশের দিকে তাকায় বিনন্দ। কালো মেঘ ছেয়ে আছে একরাশ। ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে রঙ্গীর দিকে তাকায় বিনন্দ।

কাজটা ভালো করনি। এখন বৃষ্টি হলে কী হবে? শরীর আবার উথলে ওঠে। বমির ভাব।

বাবা, কী গন্ধ! মাছের গন্ধ এমন উৎকট হয়!

এ তো মাছেরই নৌকো। মাছের গন্ধ আমাদের কাছে কমলের সুবাস। মাছের ব্যাপারি না আমরা। রুই মৃগেল বোয়াল শোল এমনকী শুশুকও জাপটে ধরি জলে। ঘড়িয়ালের সাথে যুদ্ধ করি। আমার গায়েও খুঁজলে দু চারটে আঁশ, দুর্গন্ধ পেয়ে যাবে। রঙ্গী এবার আঁৎকে ওঠে।

না! ছাগলছানা কোলে তোলে। চেন টানে। আঁধার তরণীতে চোখ চেয়ে না দেখা দৃষ্টিতে হাতড়ায়। অনেক খোঁচাখুঁচিতে এটা ওটা হাতড়ে বের করে সুগন্ধের শিশি একটা লণ্ডন প্যারিস নিউইয়র্ক। নৌকোর এমাথা ওমাথায় ফ্রিশ ছড়িয়ে দেয়। খালি শিশি ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখে। সুগন্ধের সুবাস এবার তাকে পদ্মবনে দাঁড় করিয়ে দেয়। নৌকোর দুলুনি আর দূর গলুই-এ বসা মতামানুষ অস্পষ্ট হয়। অন্ধকারে জগৎ আবৃত হওয়ার আগেই বিনন্দ এসে সামনে বসে। ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে। আনন্দের আবেশে রঙ্গী একবার বিনন্দকে দেখে, একবার আকাশের দিকে হাত ~~লে অতৃপ্ত কপালে নামিয়ে আনে অঞ্জলি। তৃপ্তি বশে বলে,

মতামানুষ, তুমি নাচতে গিয়েছিলে পলাশবাড়ি। নাচবে, নৌকোয়? বিহুনাচ। আমাকে শিখিয়ে দেবে মতামানুষ? বিনন্দর চোখেও কৌতুক। রঙ্গীর বিবশতা দেখেই কি মানুষটার আমোদ। বিনন্দর গানের মজা রঙ্গীকে ক্রুদ্ধ ~ ব আবার।

উই আর ইন দি সেম বোট ম্যাডাম। অধৈর্য হয় রঙ্গী।

ধুৎ, ওসব নয়। বিহু, বিহু গাও। মজা বাড়ে। প্রমোদে মত্ত মতামানুষ গায়।

হাজার টাকার বাগান খাইল পাঁচসিকার ছাগলে।

উফ্। দু-হাত মুঠো করে বিনন্দকে দেখায়। অধৈর্যে নিজের হাঁটুতে মারে। বিনন্দ এবার বৈঠা রাখে। উঠে দাঁড়ায়। ভেজা গামছা কোমরে জড়ায়। পুরুষালি ভঙ্গিতে রঙ্গীর মুখের কাছে এসে চিবুকে হাত রাখে গানের সুরে সুরে।

ও মোর নাচনি। অর্ধসিক্ত চাদরের আঁচল ধরে নৃত্যভঙ্গিতে টান দেয়।

ও মোর দেহি অই। মুগার হাজে, কপো পাহে, তোকে ধুনিয়া লাগে। আবার রঙ্গীর চিবুকে হাত রাখে।

মো লই চাই চাই নে হাহিবি মিচিকাই। নাচ গান চলে অনেক সময় নিয়ে। দণ্ড পল গুনে গুনে তরণীধর মহাসময়ে সমর্পিত হয় নৃত্যের তাল আর গানের সুর। নটরাজ মতামানুষ ফরমায়েশি চক্রের নাচ শেষ করে। চরাচর চমকিত করে মুখে দু-আঙুল ঢুকিয়ে জোড়া শিস দেয় বিনন্দ। রঙ্গীও হতবাক, এত তীক্ষ্ণ শিসেও কেউ চমকিত হয় না। রঙ্গী ছাড়া কেউ নেই, কিছু নেই

জলময় বিশ্বে। মেঘ আর কুয়াশা ঢাকা দিক। দূরের ব্রহ্মপুত্র সেতুর অস্পষ্ট আভাসটুকুও নেই। উমানন্দ, উত্তরপার বা গৌহাটি শহরও কুয়াশার অতলে নিমজ্জিত। রঙ্গীর বিহ্বলতা দেখে মুচকি হাসির কৌতুক আবার খেলা করে বিনন্দর চোখে।

কী হল ময়নাজান? আবার একপাক নাচ দেখাব? সম্বিত পেয়ে রঙ্গী আবার সপ্রতিভ হয়। অলস অথচ স্মার্ট ভঙ্গিতে হাততালি দেয়।

বাঃ। বিনন্দর চোখে তখন বাস্তব চিন্তা হয়তো। বলে,

একটা অনুরোধ করব? রাখবে? রঙ্গী আর তখন রঙ্গীতে নেই। লুপ্ত পৃথিবীতে অবাক পুরুষ বিনন্দকে দেখে।

বলো মতামানুষ। তোমার সব কথা রাখব আজ। রঙ্গী আশা করে আছে মতামানুষের ভিতরেও তার প্রিয় কবিতার তোলপাড় শুরু হয়েছে। মন্ত্রের মতো অসংকোচে বলবে, 'আমি তাকে মনে মনে 'বৃষ্টি বৃষ্টি.......' বলে ডাকি'। বিনন্দর চাওয়া তাকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। ভীতু মানুষ ভয়ে উত্তরপারে যেতে চাইছে না।

চলো আজ ফিরে যাই। মতা নই আরো উত্তাল হলে, বৃষ্টি বাড়লে ফেরার উপায় থাকবে না।

না যাবই ওপারে। নিয়ে যেতে হবে। বিনন্দর উজ্জ্বল মুখে গুপ্তহাসির ঝিলিক। হেলেদুলে নৌকোর গতি বাড়িয়ে দেয়। রঙ্গী দেখে বিনন্দকে। অঝোরঝরা বৃষ্টির টপটপানো ফোঁটা চুল কপোল বেয়ে মুখের উপর সবটা নামে না। চাকুস চাকুস পান করে। বিনন্দকে বলে।

গানের কথাগুলি বুঝেছি অনেক।

বুঝবে না কেন, মাতৃভাষার গান।

আবার! বলবে না প্লিজ। রঙ্গীর মুখের উপর কালো রঙের আভাস বৃষ্টির ধারা হয়ে ধুয়ে যায়।

শিখিয়ে দেবে অসমিয়া ভাষা? মুগার হাজ মানে মুগার সাজ। আমার শাড়ি।

শাড়ি না, মেখেলা।

কপো পাহে মানে কী? নে হাহিবি মিচিকাই মানে মুচকি হাসবি না। লাভসিনেও তোমরা তুই তুকারি কর কেন গো?

ওসব গানের কথা। তোমাকে তুই বলিনি একবারও। মোহন হাসি হাসে মতামানুষ। পাহি মানে পাঁপড়ি; কপো মানে কপো ফুল। সাদা ফুল, তুলো হয়। তোমরা কী বল জানি না বাবা। আবার হাসে বিনন্দ, মিচিকাই।

তরণী গৌহাটির তটবর্তী হয়। নৌকাযাত্রা শুরু হয়েছিল যেখানে। রোষা রঙ্গীর দৃষ্টিতে বিশ্বাসভঙ্গের অসহায়তা। তীরের অনেক দূর থেকেই স্বাভাবিক নিপুণতায় ঝপাং করে নদীতে নামে বিনন্দ। বর্ষণসিক্ত রঙ্গীকে হাত ধরে নামায়। হারিয়ে যাওয়া আকাশ, শহর, রৌদ্র সব ফিরিয়ে দেয় মতামানুষ। কিস্তিমাত করে রঙ্গীর হাত ছেড়ে কোমরের ফুলম গামোছা মাথায় বাঁধে। কোমরে দুহাত দিয়ে নৃত্যভঙ্গিতে এগিয়ে যায় একা। একা গান গেয়ে, 'মুগার হাজে কপো পাহে ধুনিয়া লাগে'।

বৃষ্টিতে ভিজে মতামানুষ বিনন্দর নাচ স্বপ্নের ঘোরে নাচল বারবার বারবার ঘিরেঘিরে ঘিরেঘিরে। বিনন্দ বলেছিল মেয়েদের নাচে উল্টো হাত কোমরে ডানার উচ্ছলতায় আকাশের অসীমকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। রঙ্গীর জ্বর এল কেঁপে। মতামানুষ একদিনও এল না। রঙ্গীর বডিগার্ড ভিতু মানুষটি একবারও এল না। ছোটমামা বলিন একদিন ফিরে এল বাণিজ্যশেষে অন্ধ্রগুজরাট থেকে। অসুস্থ রঙ্গীকে ডেলিভারি দিয়ে গেল উষা আন্টির কাছে।

দুই

তিনদিন প্রায় অবিশ্রান্ত বর্ষণে গামলা যখন উপচে পড়ছে, তখনই ভর সন্ধেবেলা ভূতে মারে ঢেলা। রবীন্দ্রসদনের কাছে অথৈ সাগরে পড়তেই প্রমাদ গুণল ভিকি। এবার ছাড়বে না রঙ্গী, খোঁচাবে। সহজ শিভালরি যে এভাবে ময়দানে ডুবে যাবে, ভাবেনি। রমণী সেবার নাম কুড়োতে মারুতি ঠেলতে হবে ঝপাৎ ঝপাৎ। হরিশ মুখার্জি দিয়ে ঘুরিয়ে আলিপুর সেন্ট্রাল জেল-এর পাশে বেরিয়ে গেল। তাজ বেঙ্গলের ড্রাইভে থার্ড গিয়ারে উঠিয়েই আবার নিউট্রাল করে বেরিয়ে এল। রঙ্গীর এমন উড়নচণ্ডে স্বভাব পছন্দ। ভিকিকে তার আচরণের বিপরীতে যেতে দেখে রঙ্গী খুশি হয়। বলে, ফাইন।

বিদ্যাসাগর সেতুর মুখে এসেই আবার হৈ হৈ করে উঠল দুলালী মেয়ে। শ্যামসাহেব-এর লাগামছাড়া আদর স্নেহ মেয়েকে যখন যা ইচ্ছে করার অধিকারী করেছে শৈশব থেকেই। প্রিয় মানুষটির নির্ভরতাকে সম্মান জানাতে, আতান্তর থেকে উদ্ধার করতেই তার জেদি মেয়েকে নিয়ে বর্ষার সন্ধ্যায় বেরোতে হল ভিকির। সেতুর মুখে এসেও ঠিক করেনি কোথায় যাবে। ভিকি ঠিক করেই বেরিয়েছে রঙ্গীর রাগ কমাতে আজ উল্টো থেরাপি প্রয়োগ করবে। সে যা বলবে তার বিপরীত। ভিকিকে অবাক করে রঙ্গী এত অধৈর্যেও স্বাভাবিক ভঙ্গিতে গাড়ি ফেরাতে বলে চালককে।

ঢের হয়েছে চলো ফিরে যাই, এই বৃষ্টিতে মুড থাকে না বেড়াবার। চলছে তো চলছেই ক'দিন থেকে।

বৃষ্টি তো! থামিয়ে দিতে পারি এক্ষুণি।

সিওর?

হ্যাঁ। যদি বংশের একমাত্র কুমারি কন্যা একটা চুনের কৌটো নিয়ে আসতে পারে।

চুনের কৌটো! ধ্যুত, পুল হচ্ছে? আমিই তো বংশের একমাত্র।

পুল বলে পুল! হুক কাট ড্রাইভ, সব খুলে দৌড়তে হবে।

সখ হয়েছে! দেখবে? শাড়ি পরে এসেছে আলালের ঘরের রঙ্গী। শাড়িতে তার মতিচ্ছন্নতায়ও মাত্রা থাকে। হেডলাইট বঙ্কিমচন্দ্রের পায়ে পড়তেই ঠিক করে নেয়, থামা নয়, ডাইনে ঘোরায়। রঙ্গীকে বলে,

মা এমন অনেক লোকবিশ্বাসের কথা বলে। বৃষ্টি থামানোর আর এক সহজ উপায় কাদামাটিতে আছাড় খাওয়া। খাবে?

না গো ভালো লাগছে না। রঙ্গী মজাটা বুঝল বেশ।

আসামে ন-মাসই বৃষ্টি । একবার বৃদ্ধ পরিচারক মাধব কাই দুটো কোলা ব্যাঙ ধরে তেল সিঁদুর মাখিয়ে বিয়ে দিয়ে দিল । বৃষ্টিও গেল ধরে।

আসামেই রঙ্গীর সব আচ্ছন্নতা । বোধে তালা । ভিকি জানে সবই। রঙ্গীর জীবনের সব দুঃখ মতিচ্ছন্নতার উৎসেও এক মেখেলাপরা মহিলা । নয়না আন্টি । ভিকি শুনেছে । কেউ তো বলে না সরাসরি । মা যেমন জানেই না কিছু। শ্যামসাহেব আভাসে অনেককিছু বলে ফেলেন। এমনি এক বর্ষারাতেই নয়না আন্টি শিশুকন্যা শ্যামসাহেবের কোলে রেখে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিলেন। রঙ্গী দেখেনি শ্যামসাহেবও দেখেননি আর। ভিকি দেখেছে, মা দেখেছে আগুন রূপসী মহিলাকে । নয়না আন্টি আর রঙ্গীতে মিল এত বেশি যে রঙের ফারাকটুকু বিভ্রম থেকে রক্ষা করেছে মাতা পুত্রিকে । একজনের বরণ অলৌকিক দুগ্ধে জ্যোৎস্নায় মাখামাখি । রঙ্গীর মেঘলাবরণ তার মানসে এক অপার্থিব দুর্বোধ্যতা জুড়ে দিয়েছে । বর্ষণহীন মেঘের গুমোট অস্বস্তিতে রঙ্গী তুলনাহীনা। ভারেও বিপুল।

বৃষ্টি পতনের শব্দ নেই আর গাড়ির ছাদে । ভিকি গ্র্যাণ্ডের ভিতর ঢুকিয়ে দিল গাড়ি । বিশাল চেহারার শিখ সর্দার দরজা খুলে অভ্যস্ত সুন্দর হাতের মুদ্রায় রঙ্গীকে বরণ করে। ভূতল পার্কিং-এ গাড়ি রেখে এল ভিকি । স্যুইং করিয়ে ডাইনে তাকিয়ে দেখল বারান্দায়। রঙ্গীই তো! দীর্ঘ দেহী এক পুরুষের সঙ্গে কথা বলছে মৃদু আলোয়। পাঞ্জাবির উপর ফেলে রাখা আলোয়ানখানির কাশ্মিরী কাজ আর ফেলে রাখার বাহারটা যেন বড় পরিচিত । মানুষটির চোখে ঘুম-ঘুম স্বরের পরশ। বাঁ হাতের আঙুলগুলি বুকের উপর স্থির । থেমে যাওয়া বৃষ্টিকে যেন তিরস্কার করার সুযোগের অপেক্ষা করছেন পান্থপাদপ গাছটির পাশে দাঁড়িয়ে। রঙ্গী কেন বুঝছে না, দাঁড়ানো মানবটি আর তার জগতের কাছাকাছি নেই। ভিকি চিনতে পেরেও পাশে দাঁড়ানোর, কথা বলার লোভে কপাট লাগিয়ে তার স্বভাবের বিরুদ্ধে রঙ্গীকে ডাকল-হাই কাম অন । রিসেপশন বলল মোগল রুমে ভরতনাট্যম নাচছেন এক বিখ্যাত মহিলা । রঙ্গী নাচের নামেই নৃত্যপরা হয়ে ওঠে । নয়না আন্টিও এককালের বিখ্যাত নর্তকী। শাস্ত্রীয় নৃত্যাঙ্গনা আবার বিহু নাচেও সমান পারদর্শিনী। ভিকি রঙ্গীকে লোভ দেখায়, -যাবে? না, অনেক আলো, সাজ-পোশাক থাকবে । মিং কোর্টে চাইনিজ নিয়ে বসা যাক চলো । রঙ্গী আজ নিরিবিলি চাইছে।

রঙ্গীর ভার ভিকিকে বইতেই হবে । শ্যামসাহেব যখন চেয়েছেন । ভিকির জীবনে কেরিয়ারের বাইরে কিছুই নেই । মার প্ল্যানিং আর আশীর্বাদ ছাড়া কিছুই হওয়ার নয়। মাকে সন্তুষ্ট করতে তো সেই ছোটবেলা থেকেই শ্যামসাহেবের প্রিয় হয়ে উঠেছে। রঙ্গীকে বিয়ে করার পুরনো প্রস্তাব নিয়ে পুনর্বিবেচনার চুলচেরা ভাবনায় সে যায়নি । পারিবারিক জীবন আর কত সময়ের । মানুষ চরানোর ব্যবসাই তো তার । এত সব বুদ্ধিমান মানুষকে ম্যানেজ করছে । আর একটি ক্ষ্যাপা মেয়েকে নিয়ে ঘর করা এমন কী কাজ ? শ্যামসাহেব ভাবে তার কন্যাটি একটি দুষ্প্রাপ্য অমূল্য রতন । অন্য কবির কবিতায় বেশ কথা বলেন শ্যামসাহেব । মেয়েজামাই করার প্রলোভনে কবিতা বলেন, 'এ পৃথিবী একবার পায় তারে পায় নাকো আর'। এমন দুর্লভ । ভিকি কবিতা বোঝে না, জীবন বোঝে। বোঝে, আকর্ষক পুরুষ দেখলে রঙ্গী প্রেমে পড়ে যায় । গ্র্যাণ্ডের বারান্দায় বিশাল মানুষটির সাথে কী কথা বলল রঙ্গী? শ্যামসাহেবের দুলালীকে স্যুইমিংপুলের কাছে নিয়ে গেল ভিকি ।

বৃষ্টিতে স্যুইমিং পুলও উদাসী শূন্যতায় একাকী ভাসছে। মায়াবী আঁধার আলোর বৃত্ত থেকে দূরত্ব তৈরি করতে পেরেছে। গা এলানোর চেয়ারে দুজনে বসল পাশাপাশি। রঙ্গী ভিকির মোটা জিনসের হাঁটুতে কোমল হাতের পরশ বিছিয়ে বলে,

এখন এই নীল জলের উপর সরোদ হাতে যদি কেউ হংসধ্বনি বাজিয়ে শোনায়। কেমন লাগবে?

আমজাদ আলি খান। না?

তিন

মেঘ বৃষ্টির যে কত কোমল নামাবলী। সব সময়ের সব দেশের কবিরাই সাজিয়েছেন সুন্দরীতমারে। বাদল বরিষণ ধারাপাত। মেঘৈমেদুর অম্বর। অলসমুখর এই সময়ে কত কবির গান কবিতা রচিত হয়েছে। রচিত হয়েছে সুনয়ন সুন্দর বর্ষারাগিনী সারঙ্গী। শ্যামসাহেব মেয়ের নাম রেখেছিলেন সারঙ্গী। ক্ষণমুগ্ধ কন্যা তার কিছুতেই স্থায়ী হতে পারে না। সংস্কৃতসাহিত্যে প্রসিদ্ধ নায়িকা কুরঙ্গী কাহিনী মুগ্ধ করল সারঙ্গীকে। সারঙ্গী যখন কুরঙ্গী হল তখন তার বয়স চৌদ্দ। মাধ্যমিকে সু এবং কু বিসর্জন দিয়ে হয়ে গেল রঙ্গী। এফিডেবিট করতে গিয়ে হেসে ফেলেছিলেন শ্যামসাহেব।

বাপের নাম রাখলি না মেয়ে! মেয়ে ফুঁসে উঠেছিল।

না, ঠিক উল্টো। কুরঙ্গী সারঙ্গী ডাকনি কোনোদিন। রঙ্গীই আমার নাম।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। মেয়ের কাছে সবরকম সাওয়ালড়াই-এ হেরে ভূত হয়ে গেছেন এতকাল। গৌহাটিতে নৌকো চড়ার ভূত যখন কিছুতেই নামছে না, শ্যামসাহেবও দিলেন বেঠিক করে। রঙ্গী জানে সব তবু এক অলীক মানুষের স্বপ্ন দেখে সে সবাইকে কষ্টে রেখেছে। এসব কোনো চক্রান্তও হতে পারে। গৌহাটির মানুষদের কোনো বিশ্বাস নেই। মাছের ব্যাপারিদের চোখও মাছের মতো হয়। ওরা সব পারে রঙ্গীর এই নৌকোমানুষ-মুগ্ধতাও খুব স্বল্পকালীন অধ্যায়। শ্যামসাহেবর ভয় উষারানিকে। রঙ্গীকে সে চেনে। রঙ্গীর শৈশব থেকেই তো ঘিরে আছে উষা। উষার স্নেহ মাতৃত্বের অর্ধেক রঙ্গীকে দিতে কার্পণ্য করেনি। ভিকিকে বঞ্চিত হতেও দেখেছেন শ্যামসাহেব। উষারানি রঙ্গীর মা নয়। মাতৃস্নেহ রঙ্গীর জীবনে অনুপস্থিত। উষা কি তার ভাবী পুত্রবধূর যৌবনোচিত অপচার মেনে নিতে পারবে?

ভিকিকে নিয়ে কোনো ভয় নেই। অজয় চৌধুরীর রাজা ছেলে বিক্রমজিৎ। পাইলট অজয়ের অনেক গুণ আছে তার পুত্রে। নেই শুধু উড়নচণ্ডেপনা। আকাশেও না মনেও না। মায়ের স্বভাব। বাকি থাকল হতভাগ্য পিতা। শ্যামসাহেব জানেন রঙ্গীর এ যুদ্ধ তার সঙ্গেই। রঙ্গী এ টানাপোড়েন জিইয়ে রাখতে চায়। আজকের মতো শ্যামসাহেব সামলে নিয়েছেন। ক্ষণরাগিনী কন্যা আজ ফিরবে আনন্দময়ী সাজেই। বিক্রম সঙ্গে থাকলে শ্যামসাহেব নির্ভর থাকেন। ফিরলে ধরতে হবে মেয়েকে, বলতো কার কবিতা? 'বিষ্টি বিষ্টি অনাছিষ্টি ভিতরে তুলকালাম কান্ড'। আটকে যাবে নির্ঘাত। সে তো জানে শুধু সুনীল শঙ্খ ব্যান্ডমাষ্টার বা বরষাপীড়িত ফুল আনন্দভৈরবী। নীরেন্দ্রনাথ অলোকরঞ্জনও ধুমধাম বলে যায়। চড়াতারে থাকলে চলে যাবে জ্যাজ, জ্যাকসন, বনিএম ভেঞ্চার্সে। মাতৃরূপিনী তার কন্যাটিকে

তখন বুঝতে পারেন। সামলাতে পারেন না। দুখিনী মেয়েটি তখনই হয়তো পিতাকে দূরে রাখতে চায়। সবই তার সুরুচি বিরোধী তখন। সগমক গিটকারীতে শুরু হবে, ওয়ান টুপ্পি ইয়া, মাম্মা মিয়া। কম্পাক্ট ডিস্কের লাল নীল হল্‌দে সবজে ঘুরে ফিরে রঙবাহারি পিট্‌পিটানি। হাঁটু ঢাকা টাইট্‌স তার উপর মসলিন সূক্ষ্ম টপে মেয়ে তার উপায়ে পিতাকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। স্বস্তি দ্বিগুণিত করতে টপের নিচেও কিছু পরে না। শ্যামসাহেব তখন কর্ডলেসে এরিয়েল টানতে টানতে কেষ্টকে ডাকেন উচ্চকণ্ঠে। বাতাস তরঙ্গে ভাসে আর্তনাদ — বিক্রম একবার আসবে? একমাত্র বিক্রম পারে। শ্যামসাহেব জানেন একমাত্র ভিকির কাছেই রঙ্গীর সব উগ্রতা জলের দাগ হয়ে মিলিয়ে যায়। ভিকি ওসব কেয়ার করে না। নিজেকে ভাগ্যবান ভাবেন যখন দেখেন মাল্টিন্যাশনাল তামাক কোম্পানির চূড়ায় থাকা যুবকের কাছে তার কন্যা নারী মহিমায় বিরাজিত থাকে।

শৈশব থেকে কৈশোর পেরনো আত্মজার বিবর্তনের প্রতিটি ধাপেই শ্যামসাহেব ছিলেন অভিনিবিষ্ট পর্যবেক্ষক। আদরে স্নেহে যত্নে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছেন মাতৃস্নেহ বর্জিতা দুলালীকে। আদর্শ পিতৃত্বের কোনো অলীক নিরিখে নয়। শিক্ষা সহবত তালিম আন্তরিকতায়। দুটো অক্ষমতার একটাতেই যে রঙ্গীর সব অভিমান জমে জমে পাথর হয়েছে। শ্যামসাহেব জানতেই পারেননি।

অভিমানই তো? নাকি ঘৃণা? তা কী করে হয়! মেয়ের জীবনজোড়া তার বাপের ছবি। ছবি না খেলনা? ছবি আছে তার লিভিংরুমে। চুরুট হাতে শ্যামসাহেবের ছবি। বোর্ন শেফার্ড থেকে ল্যামিনেশন করে আনিয়েছে লাইফসাইজের। শ্যামসাহেব আবার রঙ্গীর স্টাফড ডল। নিউমার্কেটে নতুন এলে যেমন কিনে আনে। পিতাকে সে বিভিন্ন রকম চায়।

বাপি কেন তার কবি হল না। অন্যের কবিতা মুখস্থ করে আর আবৃত্তি করে জীবন কাটিয়ে দিল! বাপি তুমি ওরকম দু-পকেটে হাত ঢুকিয়ে হাঁটবে না। লোকে ভাববে আনস্মার্ট, যেন হাত রাখার জায়গা পাচ্ছ না। না, না ঠিকই আছে, ইউ লুক ...। বাপি, তুমি যে কীরকম না, ভেরি বিউটিফুল। চায়ের কাপে সুড়ুৎ শব্দ ভীষণ অপছন্দ। এমন রাগল মেয়ে চায়ের কাপই উঠিয়ে নিয়ে গেল। তোমার চা খেতে হবে না। চায়ের দেশের মেয়ে ছিল রঙ্গীর মা। সুড়ুৎ শব্দ অপছন্দ ছিল তারও। নয়না তো কথা রাখার অবকাশও দিল না। মেয়ের কথা তাই রাখতে পারেন না। মেয়েকে কথা দিলে ব্যভিচারিণীকে মান্য করা হয়।

মেয়ে ছাড়া কাউকে মান্য করার দায় নেই শ্যামসাহেবের। মেয়ে ছাড়া কোন মেয়েই বা আছে অনুবর্তনযোগ্য? ঊষা কি কেউ নয়? ঊষার প্রতি কর্তব্য করে গেলেন। বন্ধুপত্নী শুধু। ভিকির মা। নিজের মায়ের কথা মনেও পড়ে না। পরিণত বয়সের দুই রমণীর একজনকে ঘৃণা অন্যজনকে কর্তব্যস্নেহের নির্লিপ্তিতে রেখে জীবন তো কাটিয়েই দিলেন।

অর্থোপার্জনের পরিশ্রমে দিন কেটে যায়। সূর্য ডুবে গেলে পর শ্যামসাহেব মদ্যপান করেন। রঙ্গী অপছন্দ করে। ড্রিংকস নয়, ব্র্যান্ড অপছন্দ। অপছন্দের বিষয়গুলি সব পিতাপুত্রীর স্নেহমমতার টানাপোড়েনেই বিদ্যমান। তার পিতা কেন কড়াগন্ধের নিকৃষ্ট পানীয়

রাম খেয়ে ভক্ ভক্ ঢেকুর তুলবে। বিশিষ্ট কোনো পানীয়ে আকর্ষণ নেই শ্যামসাহেবের। আর্মির ডাক্তার। সেনা ব্যারাকের অফিসার জওয়ান সবার প্রিয় তিন এক্স মার্ক। কালো লেবেলের পানীয়। তারও প্রিয়। আদুরে প্রশ্নে মেয়ের জানার পরিধি যাচাই করে স্নেহময় পিতা।

পানীয়ের গন্ধ, না তোর বাপকেই অপছন্দরে মেয়ে?

ধেৎ, রামফাম খেলে বাপকেও ভালো লাগবে না, বলে দিচ্ছি।

বাঃ, তাহলে কী খেলে তোর পিতৃশ্রদ্ধা ফিরে আসবে?

কেন, স্কচ খেতে পার।

নাম জানিস?

হুঁ, চিভাস রিগ্যাল, জনিওয়াকার, টিচার্স। আরো জানি বাপি। 'ওমেগা পয়েন্ট' তো ওয়াইন শপই।

কী বললি চিভাস রিগ্যাল? সিভাস রিগ্যাল না শিবাশৃগাল?

কেমন হল? ইন্টারেস্টিং তো? কে বলে?

এক যে ছিল বাঙাল। ওরকম বলত। ভিকির পিতাকে নিয়ে শ্যামসাহেবের রসিকতায় রঙ্গীও সমুৎসুক।

শ্যামসাহেব জানেন এসব নয়। অন্য কোথাও, অন্য কোনোখানে জট পাকিয়ে আছে তার হরিণী কন্যার মন, মানস। মেয়েটার মনকে পরিমাপ করার দুটোই মাত্র বৃহতের সন্ধান জানেন শ্যামসাহেব। আকাশ আর সমুদ্র। বড় যেমন, গভীরতায়ও মেয়ে তার সাগরিকা। তবু জট খোলে না। বিক্রমজিৎ ছাড়া কেউ জানে না এ টানাপোড়েন। সবটা কি তৃতীয় যুবকও জানে? বাপকন্যা কেউ কি জানেন? শ্যামসাহেব অনুভব করেন। রক্ত চলাচল দ্রুত হয় ধমনীতে। নিজেকে সামলানোর সহজ প্রতিরোধ হয় গৃহভৃত্য কেষ্টকে চিৎকার করে ডাকা। কেষ্টও সংকেত পালনে তৎপর। ঝিন্‌চাক শব্দ ছাপিয়ে ট্রেতে আইস কিউব, গ্লাস আর পুরনো ব্র্যাণ্ডের ওল্ড মন্‌ক বা কনটেসার নতুন বোতল। সোডামেকার ইলেকট্রিক পয়েন্টে অন করে দুই হাত কচলে নীরবে নিস্ক্রান্ত হওয়ার মুখে শ্যামসাহেব আবার ডাকেন। অ্যাই। এ ডাকে কোনো সংকেত নেই। সংকেত তার হাতের কর্ডলেস-এ থ্রি ফোর থ্রি নাইন এইট ফাইভ। এরিয়েল টেনে বের করেন। কথা শেষ হলে কেষ্টকে জানিয়ে দেন। আমি বেরব।

নীরব বর্ষণ মায়াময় লতাগাছ বেয়ে টুপটাপ মৃদু কলতানের মল্লারকে দীপ্ত করে শ্যামসাহেবের কুড়ি বৎসরের পুরনো পদ্মিনীর রোষা গোঙানি।

চার

উষারানি রিসিভার নামিয়ে রাখেন সন্তর্পণে। পুরনো দিনের নিকষ কালো টেলিফোনের ভারি রিসিভার। শব্দবাহী যন্ত্রটার উপর হাত রাখেন মুগ্ধতায়। কাউন্টারে বসা আজিজকে বলেন,

জানতাম বাড়িতে আজ অতিথি আসবে।

কে দিদি। শ্যামসাহেব?

ফকিরকে কিছু টাকা পাঠাও তো। নিয়ে আসুক চারজনের মতো ফুড। বর্ষারাতের ভাজাভুজি। বৃষ্টি হলে তোমরা খিচুড়ি খাও আজিজ ?

আজিজ কাউন্টারের লোহার আঙুরলতা, পাতার নিচে চৌকো খোপে চোখ রেখে কালো পাথরে মসৃণতাকে ছরাত শব্দে আরো মিহিন করে চলে যাওয়া দেখে। খিচুড়ি প্রশ্নে মনের কথাটা দিদিকে জানানোর প্রস্তুতি নেয়। এমন সময় ঝপঝপাৎ শব্দে একটা মারুতি থেকে গাট্টাগোট্টা জিনস ওয়্যারহাউস ড্রেস-এ চার যুবক মাথা উঁচু করে আজিজের সামনে এসে দাঁড়ায়। দামী ব্র্যান্ডের হুইস্কি চাই। আটটা বেজে গেছে। দিদির মুখের দিকে চাইল আজিজ। সময়ের বাইরে এক মিনিটও সেল খোলা রাখতে রাজি নন উষারানি।

সরি। অনুনয় বা মন খারাপ না করে বেরিয়ে গেল চার ইয়ার। এখানে নেই তো অনেক ঠাঁই আছে কমলালয় মহানগরে।

দিয়ে দিলেই হত, কী বলো? পুরনো কর্মচারি আজিজ বোঝে দিদির মজা। দিদির জীবন নিয়ম আর কঠোর সিদ্ধান্ত দিয়ে গড়া। আজিজ, ফকির এরা অনেক দিনের কর্মচারি। তারা জানে তাদের স্বচ্ছল জীবনের ভিত এই শুভ্র বসনা মহিলার দৃঢ় চরিত্র সঙ্কল্প আর স্নেহের ইট সিমেন্ট অ্যাক্রিলিক ইমালসন দিয়ে তৈরি। রমজানের মা যে স্বচ্ছলতার ভিতটা হঠাৎ এমন নড়বড়ে করে তুলবে কে জানত। দিদিকে বলবে কী করে? টাকা ক-টা তো চাই। দিদি অন্য কথা বলেন।

আজিজ তোমার ছেলে এখন সুস্থ আছে তো?

রমজান, দিদি?

উপোস দিচ্ছে না? ফলসার রস খাচ্ছে?

খাচ্চে দিদি। দিদি..........

এখন আর পালসেটিলা দেবে না। এক ড্রাম নাক্স ভোমিকা রেখে দিও। দিদির মুস্কা আর হোমিপাথিতে কাজ হয় ঠিকই কিন্তু আজিজের এখন অন্য চিন্তা। টাকা চাই। অ্যাডভান্স। তিনশ টাকা পেতে কম করেও তিনবার জানাতে হবে আর্জি। দিদির মর্জিতে সায় দেয়।

ঠিক আছে দিদি। ঠিক যে কিছুই নেই জানায় কী করে। চার বিয়ানি রমজানের মার পঞ্চম সন্তানের জন্য ধাই এর খর্চা, মামুলি ঔষধপত্রে কম করেও পাঁচশ টাকা চলে যাবে। শ-তিনেক অ্যাডভান্স না হলেই নয়।

এই আজিজ। বৃষ্টি যে থামছেই না। তোমরা বৃষ্টি থামানোর টোটকামোটকা জান না?

না দিদি। বৃষ্টি হয় আল্লার দোয়ায়। থামিয়ে কী হবে। বৃষ্টি না হলে ওঝা আসে। গান গায়। আল্লা মেঘ দে পানি দে।

ওঝা কী করবে, ওঝা তো ভূত তাড়ায়।

না দিদি। আমাদের গ্রামে ওঝারা সব করে।

সব করে। ভূতও তাড়ায়? অপদেবতার ভর থাকলে?

পারে দিদি।

কাউকে না জানিয়ে পারবে?

তাবিজ নিতে হবে

না, না তাবিজ নিতে পারবে না। পরবে না।

কে দিদি? ভিকি দাদা?

ধুর বেটা। ছোট সেফ-এ টাকা গুনে রেখে চাবি হাতব্যাগে ঢুকিয়ে বলেন।

চলো। ফকির এল না এখনও। ভিকিও এল না। ট্যাক্সি ডাকো একটা। বিশাল বিল্ডিং-এর আর্কেডে তাকিয়ে মুচকি হাসে আজিজ। হাসিতে লেগে থাকে একটু দুঃখের রেশ। হল না, টাকাটা আজও পাওয়া হল না। বাকিতে সন্তান বিয়োবে রমজানের মা। উষারানি এবার নিজেই উঠে এলেন আজিজের হাসি লক্ষ করে। ও তোমরা। এত ভিজলে কোথায়? ভিজে চুপচুপে ভিকি রঙ্গীকে দেখায়।

আবার ঝগড়া তুমুল। শ্যামসাহেব বলছেন পৃথিবীর যেখানে ইচ্ছে যাও গৌহাটি নয়। দুলালী মেয়ে যাবেই।

ভিকি! উষারানির একেবারেই অপছন্দ অকারণ খোঁচাখুঁচি। অকারণ উত্তেজনা।

আচ্ছা মাম্ কী হয় যেতে দিলে? শ্যামসাহেব ভয় পেয়েছেন রঙ্গীর স্টোরিম্যানকে। বিনন্দ হাজরিকা। বোগাস। মায়ের সামনে আবার উত্তেজিত হয় ভিকি। ফকির এসে তিনজনের মাঝখানে খাবারের বাক্স নিয়ে দাঁড়ায়। ভিকির ধমক খেয়ে গাড়িতে রেখে আসে। ওমেগা পয়েন্ট ওয়াইন শপ বন্ধ হয় রাত সাড়ে আটটায়। বাঁশের ছাতা টাঙিয়ে ব্যর্থ মনোরথ আজিজুল হক শিয়ালদহগামী বাস ধরতে দ্রুত পার্ক স্ট্রিট ছেড়ে বের হয়।

ভিকি স্টিয়ারিং-এ থাকলে রঙ্গীকে পাশে নিয়ে বসেন উষারানি। আজ একটু অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিলেন। ভিকির পাশে বসল তাঁর ভাবী পুত্রবধূ।

মারুতি আটশ'র পেছনে ছড়িয়ে আর কতটুকু বসা যায়। মেঘলা কাঁচের ভিতর বৃষ্টি-ভেজা আলোর বলগুলোর ছরাত ছরাত বেরিয়ে যাওয়া দেখে সামনে বসা দু-টি বালক বালিকাকে দেখেন। এক জটিলতার আবর্তে হারিয়ে যান উষারানি। নয়নার প্রতি অপরাধবোধ কীসের তাঁর! তবু নয়নাকে কথা দিয়েছেন। পুত্রবধূ করবেন তার কন্যাকে। মহিলা এত নিষ্ঠুর হয় কী করে? মেয়েকে দেখার একবারও ইচ্ছে হয় না? আর শ্যামসাহেব। শ্যামসাহেবের ইচ্ছার বাইরে কিছুই নেই উষারানির। সামনে বসা নওল মানব-মানবীকে দেখে মন চলে যায় শৈশবে। মেঘলাগ্রামের নবীনা ফ্রক-পরা দুই বেণীতে বেগুনি ফিতে দুলিয়ে আম আর আমড়া কুড়ানোর নাচ। আয় বৃষ্টি ঝেঁপে চাল দেব মেপে। অবিশ্রান্ত বর্ষণ সময়ে শ্যামসাহেবের কাছ থেকে শুনেছে নতুন কথা। মাগো গিরিশৃঙ্গ উড়াইল বুঝি। আজিজ শোনাল ওঝার গান 'আল্লা মেঘ দে পানি দে'। ওঝার তাবিজ নিয়ে এত উৎসাহী হয়ে ওঠা ঠিক হল না। আজিজ বলতে পারল অমন কথা! কবচ তাবিজ করার জন্য কি সব খুইয়েও বেঁচে থাকলেন এতদিন?

স্টিয়ারিং ধরা ভিকি পিছন ফিরে অন্ধকারে মার হাত খুঁজে বেড়ায় । পায় । মৃদু চাপ দেয় । উষারানিও ছেলের দুঃখিত মুখটা দেখে কাতর হয়েপড়েন । ছেলে বলে, সরি মাম্। মা বোঝেন, ভিকি সমর্পণ শেষে মুক্ত । অকারণ গিয়ার পাল্টায়। গতি দ্রুত হয়। আবার কমায় । তৃতীয় প্রাণীটি নির্বিকার বসে থাকে।

গাড়ি ধায় । কবিতা করার সময় কোথায় উষারানির। কবিতার ভান্ডার সব তো শ্যামসাহেবের। শ্যামসাহেব বলেন কবিতার ক-ও ছিল না তার বন্ধুর জীবনে। আবার কবিতার চোরা নিয়মে বাঁধা ছিল তার উড়ে চলার জীবন। এসব কবিত্বের কথা। ফাঁকি অনেক । বন্ধুত্বকে প্রতিষ্ঠা করার আবেগ।

বন্ধু ওরা, সহপাঠী নয়। পুরুলিয়ার সৈনিক আর আর. জি. করের ডাক্তার। উষার সঙ্গে ঘটকালির পরই বন্ধুত্ব গাঢ় হয়। এয়ার ফোর্সের পাইলট অজয় মহান্তি বন্ধুকে ঘটক বিদায় দিয়েছিল খুব মজার । ফরাসি শ্যাম্পেন আর সিভাস রিগ্যাল এর বোতল দুটোর মাঝখানে এয়ার ফোর্সের ফ্রিরাম এক বোতল থ্রি এক্স। সুদৃশ্য মোড়কে সাজিয়ে দিয়েছিল। - খুলবি না এখন। প্রথমটা নয়নার, দ্বিতীয়টায় তোর খ্যাপা জীবনস্মৃতি আর তৃতীয়টায়.........। বলেই মুখে আঙুল ঢুকিয়ে ছিপি খোলার শব্দ করেছিল । - নতুন জীবনের শুভেচ্ছা।

সুন্দর কথা বলত হাসত খেলত উড়ত মানুষটা। উষারানিকে জীবনের উচ্ছল ঝলকানি ছাড়া কিছুই দেখাল না। বন্ধুকেও মোড়ক খোলার অবকাশ দিল না। রাউড়িয়া পোস্টেড। যুদ্ধ নয়, কিছু নয়, মহড়ায় বিমান ভেঙে বৈমানিকের মৃত্যু।

সন্তানকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন ছিল তার । ছেলের মুখও দেখল না মানুষটা। অনেক উঁচুতে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন ছিল । ভিকি তার রাজা ছেলে । উঁচুতে উঠিয়েছেন ছেলেকে উষারানি। শ্যামসাহেব । তার বাপের বন্ধু না থাকলে কি পারতেন একা। ভিকিকে বলেছেন কৃতজ্ঞতা শুধু নয় দায়িত্ব নিয়ে সব জমিয়ে রাখতে । রঙ্গীর সব কথা জানে ভিকি। নয়নাকেও দেখেছে । নেই মানুষ নিয়ে রঙ্গীর বাড়াবাড়িতে শ্যামসাহেব বিব্রত। ভিকি জানে শ্যামসাহেবের দুঃখের অনেকখানি। তবু অভিযোগ করল । উষারানি ব্যথিত হয়েছিলেন। একমাত্র সন্তানের জীবনটাকে কী অকারণ জটিলতায় ভরিয়ে তুলছেন? আজিজের ওঝাকে একদিন ডাকিয়ে আনা যায় না? তাবিজ ছাড়াও তো অনেক কিছু আছে । ঝাড়ফুঁকেও তো অনেক জটিলতা কেটে যায়।

শ্যামসাহেবের জীবনে এত জটিলতা তবু এত নির্ভার মানুষটা । আবার জীবনকে টেনে নিয়ে যাওয়ার মতো করেও নিলেন না । রামের সন্ধ্যা কিছুক্ষণ আর কবিতা সর্বক্ষণই নয় শ্যামসাহেবের জীবন । কন্যাকে সারঙ্গী কুরঙ্গী রঙ্গী নামের খেলায় মাতিয়ে রাখার স্নেহ দিয়েছেন অফুরন্ত । শিক্ষায় সঙ্গতে সাধারণ হতে দেননি । বন্ধুপত্নী আর তার পুত্রের প্রতিষ্ঠা একা কাঁধে তুলে নিয়েছেন । কবিতায় সব দুঃখকে আনন্দিত করার ম্যাজিক জানেন শ্যামসাহেব। বরষাদিনে হয়ে যান একেবারে অন্য মানুষ। দুর্লভ কণ্ঠের অধিকারী মানুষটি কবিতা দিয়ে মেঘ থেকে বৃষ্টি নামান। বারিধারা থামিয়ে গেয়ে ওঠেন গান। তাহাতে এ জগতে ক্ষতি কার / নামাতে পারি যদি মনোভার'।

উষারানিরও কিছু কচুপাতা কলাপাতা হাঁসের শরীর নয় । কবিতা তেমন ভাবে না

লাগলেও অন্য সব এসে লেগেছিল। বন্ধুর মৃত্যুর পর থেকেই কি মদ্যপানের মাত্রা বাড়িয়ে দিলেন শ্যামসাহেব? লোককথার ফিস্‌ফিসানিকে তুড়ি মারতে? বন্ধুপত্নীর প্রতিষ্ঠার জন্য ছেড়ে দিলেন মেজরের চাকরি। ডাক্তার মেজর। নয়নার সঙ্গে বিয়েও পিছিয়ে গেল সাতমাস। কেউই সহজ ভাবে নেয়নি। উষারানিরও কিছু হাঁসের শরীর নয়। লেগেছিল এসে। বিশাল মনের মানুষটি একদিন মাত্র তাকে অবাক করে এক আস্বাভাবিক কথা বলেছিলেন। তখন যদি বুঝতেন উষারানি শ্যামসাহেবের মনের ক্ষরণ ধরতে ধরতেই বয়ে গেল বেলা। ধস্ যখন নেমেছিল তখনও বন্ধু হয়ে উঠতে পারেননি।

আজও পারেননি শ্যামসাহেব। দিয়ে যাওয়ার দোকানি তার কাছে শ্যামসাহেব। নেননি কিছুই। পার্কস্ট্রিটের মহিলা পরিচালিত একমাত্র ওয়াইন শপ 'ওমেগা পয়েন্ট' থেকে কখনও এক ফোঁটা রাম নেননি। কিনেও না। সব আসে ফোর্ট উইলিয়ামের ডিউটি ফ্রি শপ থেকে।

নয়নার সঙ্গে বিয়ের পর একটা পরিবর্তন হয়েছিল শ্যামসাহেবের। শিলং গেলেন, শ্রীনগর গেলেন, পুরীও গেলেন। নিয়ম করে উষারানি ভিকির খোঁজ খবর নিতেন দুজনেই আসতেন। উষারানির কিছু কচুপাতা শরীর নয়। অসামান্যা রূপসী স্ত্রীর পাশে শ্যামসাহেবকে খুব গর্বিত মনে হত তার।

কালো কাঁচের পেছন খোপে কৃষ্ণা রজনীর হঠাৎ আলো উষারানির মুখখানি ঔজ্জ্বল্যে চমকে দেয়। যুবতি তিনিও ছিলেন। শরীরে এবং মনে। কোনো কলাপাতার শরীরও নয় তার। তার মনে অন্যায় ছিল। পাপটাপ কি? নয়না তার রূপ নিয়ে উষারানিকে অবজ্ঞা করত। এখন তো সে তারই অনুগ্রহপ্রার্থী। কেউ জানে না তাদের গুপ্ত সম্পর্কের কথা। সম্পর্ক না ঢঙ! লুকিয়ে দেখা করে। যে স্বামীকে অবজ্ঞা করে উপেক্ষা করল। দু বৎসরের মাথায়-যে কন্যাকে পর্যন্ত অবলম্বন মানল না-সেই মানুষ অচেনা কন্যা আর অনেক দূরের পুরুষের মুখ চেয়ে কাছে প্রার্থী আজ।

কালো রাজপথের হঠাৎ আলো থেকে মুখ লুকিয়ে নিলেন উষারানি। কেন যে এমন হল! শ্যামসাহেব একা আসতে শুরু করলেন। সহজ কথা থেকে সরে গেলেন। কবিতার কথা শুরু হল। উড়ে চলে গেছে বুলবুল/ শূন্যময় স্বর্ণপিঞ্জর। শ্যামসাহেব, অসামান্য মানুষটি সাধারণের মতো হয়ে গেলেন। প্রার্থী হয়ে এলেন কাছে। রামের নেশায় শ্যামসাহেবের মনের অতল কেঁপে কেঁপে ভাঙছিল। অগ্ন্যুৎপাতের ভয়ে উষারানি তাঁর আত্মীয়তার সূত্রটুকু ধরিয়ে দিয়েছিলেন। আর কখনও শ্যামসাহেব তাকে নামও ধরেননি, তুমিও বলেননি। উষারানিরও যৌবনে কপাট পড়ল।

পাঁচ

স্বাভাবিক কারণেই বিক্রমের জীবনে কবিতার আলাদা কোনো মাত্রা নেই। বর্ষারাতের বিচ্ছিরি দিকটাও তার কাছে বিরক্তিকর। শ্যামসাহেবের বর্ণময় ব্যক্তিত্বের কাছে হার মানে সব অবিশ্বাস। তাই ব্যতিক্রমে ভর করে ধেয়ে আসে শ্যামসাহেবের কবিতা। পার্কসার্কাস কানেক্টরের মসৃণ পিচ্ছিল পথ বেয়ে। 'জটিল বৃষ্টির আলো দুঃখকেই অমোঘ করেছে'। দুঃখটুঃখ নেই তার। তবু ধেয়ে এল।

প্রিয়জনদের দুঃখে তার মন খারাপ হয়ে যায় । রঙ্গীর জেদ আর শ্যামসাহেবের অসহায়তা তাকে দুঃখিত করেছে সত্য । ভিকি বিশ্বাস করতে পারে না তার প্রিয় মানুষেরা কোনো অন্যায় সিদ্ধান্ত নিতে পারে । তাই অস্বস্তি কাটিয়ে রঙ্গীর ওপর রাগ হয় তার । রঙ্গী যত দুর্বোধ্য হোক ভিকির সামনে তার কোনো জেদ নেই, অবাধ্যতা নেই । ভিকির অধিক্ষেত্র রঙ্গী ।

মা আর শ্যামসাহেব রঙ্গীকে ভিকিকে এক রহস্যময় সম্পর্কে যুক্ত রেখেছেন শৈশব থেকে । গল্পের মতো সিনেমার মতো । শ্যামসাহেব আর তার বাবা তাদের অজাত পুত্রকন্যার সম্পর্ক স্থির করে তাকে তার মাকেও জড়িয়ে রাখলেন অজানা শপথে । জড়ানো যায় যেখানে ছাড়ালে ব্যথা । ভিখি জানে মায়ের জন্য জীবন । মায়ের জীবনে তার পিতা অতীত হয়েও সর্বক্ষণের নিত্যদিনের সঙ্গী । মা শিখিয়েছেন বলে শ্যামসাহেবকে পিতৃসম ভাবার দূরত্বে রাখেনি ।

মাতা পুত্রের সংসারে শ্যামসাহেব-রহস্যকে মায়ের অসহজ অংশ জেনে মেনে নিয়েছে । বাস্তবতা ছাড়াও তো জীবনের একটা দিক আছে। অনালোকিত অংশে বাতিস্তম্ভ বসানোর কৌতূহলী হতে রাজি নয় ভিকি । মায়ের জীবনে তাই বর্ষারজনী বাস্তবতা হারিয়ে তাৎপর্য পায় খিচুড়ি রান্নায় । শ্যামসাহেবের পছন্দ ।

দুঃখবিলাসকে লালন করার কৌতূহল নেই ভিকির । তেমন হলে যৌবনবতী রঙ্গীর বদলে যাওয়া তাকে ভাবিয়ে তুলত নতুন করে । রঙ্গীকে সে নতুন দেখে না । শৈশবে যেমন, কৈশোরে যেমন এই যৌবনেও সে তার সব চাওয়া নিয়ে পাওয়ার অধিকারে ঘিরে রেখেছে রঙ্গীকে। রঙ্গীর বিষাদ, রঙ্গীর জেদ, রঙ্গীর খেয়াল তার ভাবনাকে খুশি করে । খুশি করে তার ব্যক্তিত্বকে । বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের চূড়ায় থাকা যুবকের সিদ্ধান্তই যখন রঙ্গীর সব দৃঢ়তাকে শিথিল করে দেয় । শ্যামসাহেবের মতো ব্যক্তিত্বও ভিকির পরামর্শ ভিকির দায়িত্ব পেতে উতলা হয় ।

দীর্ঘাঙ্গ পুরুষের মুখশ্রীতে দুর্বলতা ধরে ফেলা সহজ নয় । শ্যামসাহেবকে দুঃখ দেওয়ায় ভিকির রাগ হয়েছিল রঙ্গীর উপর । বলেছিল হাসিমুখেই, মেনে নাও, যেও না গৌহাটি। হয়তো তার কণ্ঠস্বরের অসহায়তা ধরে ফেলেছিল রঙ্গী । প্রত্যাখ্যান নয়, নীরব থেকেছিল । লক্ষণ কী অসম্মতির? অধিকার হারানোর ভয়েই রেগে গেল । ভিকির রাগ হয় না সহজে । শরীর ডুবে থাকা সোফা থেকে লাফিয়ে ওঠা সম্ভব নয় । বসে বসেই লাফানোর চেষ্টা করে চেঁচিয়ে উঠেছিল ।--অসম্ভব, কোয়াইট ইম্পসিবল! কীসের অসম্ভব? অন্যসময় অপছন্দের কথায় ইংরেজিটাই প্রথম আসে ।

পছন্দের মানুষকে বাবা-বাছা করার স্বভাব শ্যামসাহেবের । এপ্রিল মাসে রঙ্গী গৌহাটি থেকে ফেরার পর ভিকিকে বলেছিলেন । মাই বয় । রসিকতার সুরেই বলেছিলেন হাসতে হাসতে । --বাপু হে! তোমাকেও নাচাচ্ছে না তো । রঙ্গীব কথা বলেছিলেন । রঙ্গী যেখানেই যায় একটা ঘটনা ঘটিয়ে আসবে । ছেলে নাচানোর কেস সব । ভিকি ওসব কেয়ার করে না জেনে খুব নিশ্চিন্ত শ্যামসাহেব ।

ভিকির আত্মবিশ্বাস ভাঙছিল। রঙ্গী যত জড়িয়ে যাচ্ছিল । একটা অসম্ভব মানুষকে নিয়ে গল্প গড়ায় যত নিপুণ হচ্ছিল রঙ্গী । দুর্বলতা ঢাকছিল ভিকির প্রায় ছ'ফুটের চূড়ায় থাকা মুখশ্রী

বিনন্দ হাজরিকাকে নিয়ে রঙ্গী হঠাৎ এমন মাতোয়ারা হল কেন? রঙ্গী কারো প্রতি প্রতিশোধে বদ্ধপরিকর? মতামানুষ, অসম্ভব মানুষ তৈরি করে কাকে শাস্তি দিতে চায়? ভিকিকে? কেন? রঙ্গীকে তো ভিকি তার নিজের মানুষ বলেই জানে। কাউকে না জানাক ভিকি জানে তার শৈশব থেকে কৈশোর এবং এই যৌবনেও রঙ্গী পাশে রয়েছে বলেই তার সফল জীবন এমন মসৃণ। মাময় তার সংসারের ক্ষণিক মনখারাপও স্থায়িত্ব পায়নি রঙ্গী নামের এক হরিণীর সৌন্দর্যে, রঙ্গী নামের এক তরঙ্গিনীর তরঙ্গ ভঙ্গে। ভিকির ব্যক্তিত্ব নামক দুর্জয় সম্পদের উৎসেও তো রঙ্গী নামের এক জীবনময়ী উদাসিনীর মাধুর্য।

শাস্তি দিতে চায় মাকে। কার মা? ভিকির মা না নয়না আন্টি? এ বড় দুর্বোধ্য হিসাব। ভিকি নিজেই পরিমাপ করতে পারে না তার মার স্নেহ। মা কি এখন নিঃসঙ্গ হতে চাইছে? মুখ লুকোতে চাইছে? বর্ষারাতে মাকে বিষাদ গ্রাস করে। রঙ্গীও সব বুঝতে পারে। রঙ্গী তবু মার কাছে আসবে। কিছু চায় না, তবু আসে।

নয়না আন্টিকে দেখতে চায় না রঙ্গী। ভিকি জানে যাকে রঙ্গী চায় তার কাছেও আসে না। শ্যামসাহেবকে ঘিরেই রঙ্গীর জীবন, তাই নয়না আন্টির নাম নিতেও মানা। শ্যামসাহেব বলেছেন বলেই মাতৃহীনার অভিশপ্ত জীবনযাপন করছে। মতামানুষের ডাক শুনিয়ে কি শ্যামসাহেবকে ভয় দেখায় সে। কখনও গৌহাটি থেকে ডাকে কখনও লেকগার্ডেন্সের ছাদের ঘরে। কখনও প্রিন্সেপ ঘাটের নৌকোয়। ভিকির গাড়ি আটকেও দাঁড়াচ্ছে ইদানীং।

ভিকি কেয়ার করে না। তাকে দুর্বল করা সহজ নয়। আসলে শ্যামসাহেবকে দুর্বল হতে দেখলে ভিকি দোটানায় পড়ে যায়। কীসের ভয় শ্যামসাহেবের? মেয়ে না মেয়ের মামাবাড়ি? নয়না আন্টিকে ভয় কী? ভুলতে পারেন না। ভুলে যাওয়া মানুষকে মনে করা তো সহজ। সর্বক্ষণ বয়ে বেড়ান বলেই কুলুপ এঁটে থাকেন। মেয়ে বড় হচ্ছে বলেই কি রাজখোয়াদের কাজ থেকে দূরে রাখতে চান?

ঝমঝমিয়ে আজ যখন বর্ষা নামল তার আগের ঝড় ছিল শ্যামসাহেবের এস-ও-এস এ। টেলিফোনে ডেকেছিলেন। রঙ্গীকে সামলাও। সারা ভারত চষে বেড়াক মেয়ে। প্লেনে যাও ট্রেনে বাসেও যেতে পার। আগে থেকে সব ঠিকঠাক থাকবে। চেনাজানা আত্মীয় স্বজনেরা এসে নিয়ে যাবে'। কেতকী আন্টি থাকেন জব্বলপুরে। রঙ্গীর পিসি। মাদ্রাজে আছেন নটরাজন, আত্মীয় থেকে বড়। খোদ দিল্লিতে শ্যামসাহেবের মামাতো ভাই আছেন এম পি। বড় বাংলো আছে রাইসিনা রোডে। কাকার কাছে যাবে না। বোম্বে ওর পছন্দ না। উত্তেজনায় কাঁপছিলেন শ্যামসাহেব। রঙ্গী তো কম দেশ ঘোরে না। দিঘা, বকখালি, বেতলা, তোশালি, জনপুট যখন তখন। মেয়ের আব্দারে দু-বার গেছেন কাঠমাণ্ডু। এখন বাকি রাউন্ড দি ওয়ার্লড। ওটা আর মেয়েকে নিয়ে হবে না। হাসতে হাসতে বলেছেন ভিকিকে। মেয়েকে বিয়ের যৌতুক দেবেন বিশ্ব ভ্রমণের টিকিট।

ভিকিকে এত পছন্দ হওয়ার কারণও বলেন শ্যামসাহেব। ছেলে ভালো, পাগলিমেয়ের খেয়াল রাখে, সব দোষ মাপ করে দেয়। কেরিয়ার বোঝে। এই বয়সেই তামাক কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার। ভিকি হেসেছিল, এই বয়স বলতে কী বোঝেন শ্যামসাহেব। সাতাশ

বৎসর ইজ টু মাচ। চেয়ারম্যান হয়ে যাওয়ার বয়স। সে তো পঁচিশ বৎসরের পাইলটের ছেলে, উঁচুতে উঠাই যার একমাত্র লক্ষ্য ছিল।

যত উঁচুতেই উঠুক ভিকি, তার ফেরার জায়গা সে চেনে। সে জানে উঁচুতে ওঠার প্রেরণা যেমন, স্বভূমিতে স্থিত হওয়ার নির্দেশও তার মার কাছ থেকে পাওয়া। শ্যামসাহেব কাছের মানুষ হয়েও দূরের। আশ্চর্য এক দুর্বোধ্যতায় শৈশব থেকেই শ্যামসাহেব তাকে টানছেন নয়না আন্টির কতটুকুই বা সে চেনে। মার সঙ্গে সখ্য যেমন ঈর্ষাও প্রবল। মা আর শ্যামসাহেবের সম্পর্কের হিসাবও তার অজানা। এটুকু বোঝে নয়না আন্টি চলে যাওয়ার পর মাকে অবলম্বন করতে চেয়েছেন শ্যামসাহেব। মার দিকের হিসাবটা সে বুঝতে চায় না।

নয়না আন্টি শ্যামসাহেব অঙ্কে রঙ্গীর হিসের পাকা। রঙ্গীকে কিছু বলেন না শ্যামসাহেব। এই একটা জায়গায় রঙ্গী শ্যামসাহেবকে অবজ্ঞা করে। বারবার তাই বাপের অবাধ্য হয়ে গৌহাটি যায়। রঙ্গীর ঘরোয়া সাজের উগ্রতা দেখেই সে বুঝেছিল। বাপকে আজ চতুর্দিক ঘিরে অ্যাটাক করবে। এত উগ্র সাজ। ভিকি জানে, পৃথিবীর কাছে যত উগ্রই হোক রঙ্গীর সাজ সে কাছে থাকলে রঙ্গীতে নারী তার রূপ নিয়েই আসে। ভিকির বিশ্বাস এত সত্য! অধিক্ষেত্র এত দৃঢ়!

বিশ্বাসকে নড়বড়ে হতে দেখে ভিকি হারিয়ে ফেলেছিল নিজেকে। চিৎকার করে উঠেছিল। অসম্ভব, কোয়াইট ইম্পসিবল। বলেছিল, --সরি রঙ্গী সরি শ্যামসাহেব। শি উইল নট গো। বৃষ্টিতে বেরিয়ে পড়েছিল রঙ্গীকে নিয়ে। বৃষ্টির বর্ষার আলাদা কোনো তাৎপর্য নেই ভিকির কাছে। প্রয়োজন তাকে হাঁটু জলে নামিয়ে ছাড়ল।

ছয়

রঙ্গীকে নিয়ে সবার সামাল সামাল। ভিকি ব্রেক কষল সায়েন্স সিটির মোড়ে আর ধমক দিল রঙ্গীকে। --কী হচ্চে কী?

কিছুই করেনি রঙ্গী। ভিকি আজ দুবার রেগে গেল। এমন হয় না। রঙ্গী জানে কোন ভূত সে দেখিল। আন্টিও পিছন থেকে কিছু বুঝতে পারবে না। ভাববে সে একটা কিছু করেছে। আসলে ভিকি বিনন্দকে সহ্য করতে পারছে না। যেখানে সেখানে বিনন্দ তার পথ আগলে দাঁড়াচ্ছে। মতামানুষ তার তেমন ছেলে নয়। ওরা সবাই ভিতুমানুষকে নিয়ে আতঙ্কিত। এমনকি আন্টিও।

আন্টি আজকাল রঙ্গীকে খুব যতন ভরে নাড়াচাড়া করেন। যেন তুসোর পুতুল। গলে যাবে। বেণীদোলানো দিনগুলোতে ভিকির সমকক্ষই ভাবতেন। রাগ ঝগড়াও হত। এখন কেমন বউ বউ মমতায় ঘিরে রাখেন। মমতা না কৃতজ্ঞতা। শ্যামসাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা। বোকা রঙ্গী ভাবে স্নেহ। মায়ের মুখটা মনে করতে পারে না। শ্যামসাহেবের অহংকার সামলাতে নয়না ত্রিপাঠিকে অ্যাভয়েড করে গেল। শ্যামসাহেবকেও টেন্সড রাখল। মহিলা আজ কাছেও বসতে দিলেন না। রাগে দূরে সরিয়ে রাখলেন। ছেলে ভাবল রঙ্গী বিনন্দর কথা ভাবছে। ভাবনা ভেঙে দিতে নাটক করল।

রঙ্গী কিছুই দেখেনি। ফাঁকা বৃষ্টিভেজা পথে কেউ ছিল না। কিছু ছিল না। তবু ভিকি বলল, ছেলেটিকে দেখে রঙ্গী চেঁচিয়ে উঠল। রঙ্গী মুখ ঢাকে হতাশায়। রঙ্গী কিছুই দেখেনি,

চেঁচায়ওনি। ভিকি আবার বলল, সেই ছেলেটি। রঙ্গী দুহাতে মুখ চেপে থাকে। মাতাপুত্রের কাছে প্রতিবাদ মিথ্যে।

আন্টি পিছন থেকে ভিকিকে ডাকেন। আয়, পিছনে চলে আয়। বাকিটা আমি চালাচ্ছি। ভিকি নির্বিকার গাড়ি চালায়। মাতাপুত্র কেউই বোঝে না, শোনে না রঙ্গীর কান্না। রঙ্গী বড় সাহসী মেয়ে, শব্দ করে কাঁদে না। মাতাপুত্রের অবজ্ঞা অপমান নীরবে সহ্য করে।

বিনন্দকে রঙ্গী দেখেছিল। দেখেছিল প্রিন্সেপঘাটে। সে এসেছিল প্রতিমাকুঞ্জে। তার ছাদের অর্কিড ঘরে। বর্ষাসন্ধ্যায় সে এসেছিল। সে এসেছিল নৌকো চালিয়ে গঙ্গার ঘাটে।

রেললাইন পাশে বলেই হয়তো তাদের বাড়ির চৌহদ্দির দুই মানুষ সমান উচ্চতা। শ্যামসাহেব যখন বাড়ি করলেন তখন এমন পাঁচতলা ছ-তলার জঙ্গল হয়ে ওঠেনি লেকগার্ডেন্স। চুরি ছিনতাই নিরাপত্তা অভাব থেকেই দেয়াল। দেয়াল ঘেরা বলে নিচের তলায় আলোর অভাব। পরিসরও কম। তিনতলার ছাদের পরিত্যক্ত অর্কিড ঘর নবীন সাজে রঙ্গীর নিভৃত অবজারভেটরির রূপ নিয়েছে। অর্কিডের সখ্য ছাড়াও বার বার ঘুরেফিরে আসা বেহায়া লোকাল ট্রেন থামিয়ে দেয় তার প্যানট্যাক্সের জুমলেন্স। কখনও দুরন্ত লেন্স কুঝিক কুঝিক দুলুনিতে ভেন্ডার কামরায় হাঁফ ছাড়ে। বিশাল সাইজের ক্যানিং কাঁকড়ার ঝুড়ি, কাঁকড়া ধরার সাঁড়াশি আর জ্বলন্ত বিড়ির ফুকফুক ফুরিয়ে যাওয়া দেখে।

দূরে লেকক্লাবের আলালী বালক-বালিকার অবগাহন। পাড়ে পাড়ে গাছে গাছে ন্যাকাবোকা প্রেম প্যান করে বিরক্ত হওয়া। বিরক্তি কাটিয়ে নিচে কেষ্টাকে ডাকবে রঙ্গী। ফিসফিসিয়ে, এই কেষ্টদা। তারপরই চেঁচিয়ে, —কেষ্টদা। কেষ্টদা ছাড়া কেউ জানে না তার এই ঠেক।

রঙ্গীর খুব ইচ্ছে হয় বাজে কথা বলার। মন্দ ভাষায় কথা বলার একটা লোক তো চাই। ভিকিটার প্রেমেও কেমন এক্সিকিউটিভ টাইপ। দাদা দাদা। অর্কিড ঘরে তাই নিয়ে আসে না। এলেই জ্ঞান দেবে। ব্যাড টেস্ট। লেন্স লাগিয়ে দেখা আর চুরি করা একই। আবার দূর গাড়ির ছবি দেখে বলেছিল, দারুণ। কেষ্টদা দারুণ প্ল্যানার। ঝিচাকার-দায়োয়ানের দেখাশোনা থেকে রঙ্গীর সর্বক্ষণের সঙ্গী এই মানুষটা। না চাইলে কেষ্টদাকে ধারে কাছেও পাওয়া যাবে না। নয়না ত্রিপাঠিকে দেখেছে রঙ্গীর প্রদীপ দৈত্য। আসাম থেকে অর্কিড আনিয়েছে। শ্যামসাহেবের যৌবননিকুঞ্জ। কাঁচের ঘরে বসে তারা তিনজন। শ্যামসাহেব নয়না ত্রিপাঠি আর রঙ্গী। সুখের সংসারে সব সমঝোতায় আসে। শ্যামসাহেব একতলার ওপর উঠতেই পারেন না। রঙ্গী মনের টানে অসাধ্য সাধন করে। গঠিত হয় অলৌকিক মহাজোট। মাতাপুত্রী পিতা। পিতার কণ্ঠ মুখর হয় কবিতায়। 'বৃষ্টিপতনের শব্দে / তাদের একাকী রাত পার হয়ে যায়, ভেসে যায়/ জলীয়তা, অনিবার্য তাপ / কিছু জেনে কিছু বুঝে চোখের আড়ালে'।

আসে বিনন্দ। হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে ধুতি সার্টে কোমরে বাঁধা ফুলম গামোছা পরা ঝড়ের শরীর মানুষটি। গামোছা কি কোমরে না মাথায় চূড়া করে বাঁধা ছিল? রঙ্গীর মুখোমুখি বসেছিল মতামানুষ। বৃষ্টির ছাট থেকে কাঁচের দরজা বন্ধ করে প্রশ্ন করেছিল রঙ্গী।

আরে মতামানুষ। তুমি? কখন এলে?

কখন !

কখন মানে ?

তুমি যখন চলে এলে।

পুলিন মামা পাঠিয়েছে ?

না।

কাজ পেয়েছ কলকাতায় ? তুমি যে মামাদের কী আমি কিছুই জানি না।

কাজ কেন ? আমার কোন কাজ নেই । নাচ দেখবে ? বিহু ?

হুঁ।

মতামানুষ বিনন্দ সেদিন অনেকক্ষণ নাচল । এমন নাচ সে দেখেনি কখনও । বিবশ করে দিয়ে তাকে কখন যে চলে গেল ভিতু মানুষ!

মায়ের মতো মানুষটি গাড়ির পিছনে বসে কি ভাবছেন জানে রঙ্গী । ভাবছেন ছেলের কীসে সুখ হয় । ভাবছেন কন্যাসমা এই মেয়েটি এত ছেলেমানুষ কেন? পুত্রবধূ করা নিয়ে সংশয় । সংশয়ের কিছু নেই আন্টি, তোমার পুত্রবধূ আমি হব ।তোমার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই না হয় রঙ্গী তোমার পুত্রবধূ হল । নয়না ত্রিপাঠি আর রঙ্গীকে তোমরা বড় হেলাফেলা করলে ঊষা আন্টি । তোমার ছেলেটি কিন্তু স্বামী হিসাবেও দারুণ হতে পারত। কিন্তু তুমি যে রয়েছ পথ রুধি । তোমার ছেলেটি বড় নাগরিক। পিছন ফিরে একবার তাকানোর ইচ্ছেও হল না, রঙ্গীর পাশে বসা নাগরিক যুবককেও রঙ্গী তার সমকক্ষ ভাবছে না এখন ।

নাগরিক ভীতি কাজ করে ভিকির চলনে । রঙ্গী জানে এই ভীতিকে ওরা সামাজিক সুরক্ষা, সৌজন্য বলে ভাবে । টালিগঞ্জ ক্লাবের ঘটনাটা রঙ্গী ইচ্ছে করেই করেছিল । ভিকিকে সহনীয় করে তোলার অনেক চেষ্টা করে রঙ্গী । শ্যামসাহেব ভালোবাসার কবিতা শুনিয়ে রঙ্গীকে আঘাত করেন। 'মেঘলা দিনে দুপুরবেলা যেই পড়েছে মনে/ চিরকালীন ভালোবাসার বাঘ বেরুল বনে'। ফার প্যাভেলিয়ানে অমিতা মজুমদারের নাচ দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল ভিকি। বলরুমে ঢুকতেই মধ্য বয়সী হ্যান্ডসাম বিদেশি মানুষটিকে দেখে খুব ভালো লেগে গেল রঙ্গীর । সে জানে পার্কিং-এর জায়গা, তাও জিগ্যেস করল । ভিকি পাশে দাঁড়িয়ে কিছু ইশারা করছিল । বেরিয়ে আসতেই বলল,

বাবা! বাঘের মুখ থেকে বেরিয়ে এলে । ভদ্রলোক সেক্রেটারি । দারুণ কড়া । ডিসিপ্লিন্ড।

তাতে কী হয়েছে।

না বললাম।

কী নাম বলতো ভদ্রলোকের ?

হতে পারে ডিসুজা, ডিকোস্টা বা এনরিকো।

আর তখনই রঙ্গীর সাধ হল বাঘের হালুম শোনার । দিল লাগিয়ে রলিক হাটের গায়ে গাড়ি । কিছুই হল না । নাগরিক যুবক লজ্জায় লাল হয়ে ক্ষমাটমা চেয়ে নাচ ডিনার বয়কট

করে চলে এল। শ্যামসাহেবকে অনুযোগ জানাল। ভিকির মিথ্যে অভিযোগের সে প্রতিবাদ করল না। রঙ্গী প্রতিবাদ শব্দ দিয়ে করে না।

সেদিন মেঘবৃষ্টির কোনো গল্পই ছিল না আকাশে। ভিকি বলল, চলো যাই। বিকেল চারটের নৌকোয় উঠল। এক ঘন্টা ঘুরব কিন্তু। মাঝি বলল, হবে না। জোয়ারের আগে ফিরতে হবে। রঙ্গীর জেদ আবার কার্যকর হয়। না, একঘন্টা, নইলে নামিয়ে দাও। মাঝি মুচকি হেসে নৌকার দড়ি খুলে দেয়। মাঝির মুখে তাকায়। সেই হাসি। মাথায় বাঁধা গামছা। আকাশ ঝেঁপে ঝমঝমিয়ে শুরু হয় হঠাৎ বরিষণ। নিচে জলের ছলছলাৎ।

মতামানুষ তুমি এখানে?

—কী হচ্ছে? চলো। ভিকি রঙ্গীকে সাবধান করে। ছই-এ ডাকে রঙ্গীকে। এমন সঙ্কটে পড়েনি রঙ্গী। ত্বরিত সিদ্ধান্তে নেমে পড়ে জলে। অনেক জল। হতভম্ব মাঝিও ঝাঁপ দেয়। রঙ্গী ধরা দেয় না। উঠে আসে পারে। পার থেকে দৌড়ে গাড়িতে। ভিকিকে বলে,

জলেই তো পড়েছি, সাঁতারও জানি। ভিকি রঙ্গীকে ভালোবাসল। বিনন্দকে হিংসা করবে তাই।

ভিকি গাড়ির ওয়াইপার বন্ধ করে দেয়। চালিয়ে কোনো লাভ নেই। রাস্তায় তখন 'ছড়িয়ে পড়ল ফুল'। গাড়ি চালানো সম্ভব নয়। 'টগবগিয়ে ঘোড়ার ক্ষুরের মতো বাজল'। মাথায় উপর মারুতির টিনশেড। শ্যামসাহেব মোক্ষম কবিতা খুঁজে পেতেন। এমন শিলাবৃষ্টি দেখেনি কলকাতায় রঙ্গী। শ্যামসাহেব তো বর্ষারাতের অভিসারে এখন সল্টলেকের বিডি ব্লকে। গাড়ির ভিতর মানুষ দুটোও এত ভান জানে। উষা আন্টি রেডিমেড খাবার নিয়ে যাচ্ছে তবু শ্যামসাহেবকে খিচুড়ি করে খাওয়াবে। এ কেমন সম্পর্ক। শ্যামসাহেব ভান করেন না। সরাসরি না বললেও রঙ্গী তো জেনেছে তার পিতার মন। উষা আন্টির ছেলেটি তো আরো এককাঠি। নয়না ত্রিপাঠির সঙ্গে যোগাযোগ করে। রঙ্গীকে করুণা করে। বলে না। শ্যামসাহেবকে এক্সপ্লয়েট করে। শ্যামসাহেবের সঙ্গে রঙ্গীর বিরোধ এখানেই। ভুল নির্বাচন। ভুল মানুষকে বেছেছেন। শ্যামসাহেবকে সন্তুষ্ট করতে যাকে জীবনে মা বলে ডাকতে পারল না তাকেও কি ভুল বর্জন করেনি রঙ্গী! অনুতাপ করে না রঙ্গী। শ্যামসাহেবকে সুখী হতে দিল না কেউ। রঙ্গী চেয়েছিল, পারল না। এই দু-জন মানুষ থেকে তার পিতাকে সে আলাদা করতে চেয়েছিল বলেই না মতামানুষ বিনন্দ। রঙ্গী ভাবতেই পারেনি শ্যামসাহেব মতামানুষকে নিয়ে এমন মেতে উঠবেন। ভয় পেয়ে যাবেন। আবার আসামদেশের ইতিহাসকে পুনরাবৃত্ত হতে দেখে সর্বশক্তি নিয়ে প্রতিরোধে নেমে পড়বেন। মরিয়া প্রতিরোধে শ্যামসাহেব স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তিও হারিয়ে ফেললেন। তবে সে বেশিক্ষণ নয়। রঙ্গীর চাতুরি ধরতে পেরেছেন। মেয়ের সঙ্গে অলীক যুদ্ধে বদ্ধপরিকর শ্যামসাহেব মতামানুষ বিনন্দকে ধরতে পেরেও অধরা রেখে দিলেন। অন্ধকারের ঝলসিত ধারাভঙ্গ আলোয় রঙ্গী টিনশেডের ভিতর মানুষ দু-টিকে দেখে। শ্যামসাহেব তোমাদেরও টেক্কা দিয়ে দিয়েছেন মশায়রা! একা রঙ্গী হঠাৎ তার পাশে শ্যামসাহেবের কণ্ঠস্বর শুনতে পায়- মাই চাইল্ড! টেক দ্য চান্স। বিনন্দ ডাকছে তোমাকে, বেরিয়ে এসো। হারিয়ে যাও। গেয়ে ওঠো গান। 'কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা--'

রঙ্গীর দৃষ্টিতে সরোবরের চিকচিকে আলোকিত বৃষ্টির জল। জলভরা ঝাঁকিতে কাচের বাইরে তাকায়। দৃষ্টিতে নিয়ে আসে মুগ্ধতা। কাঁচ নামায়। দরজা খোলে খুট করে। —মতামানুষ তুমি এখানে? মাতা পুত্রকে অবাক করে ছড়িয়ে পড়া ফুল সয়ে নির্বিকার হেঁটে যায় সাঁতার সরোবরের দিকে। শিলাবৃষ্টি ছাড়া কোনো পার্থিব শব্দ রঙ্গীকে অনুসরণ করে না। রঙ্গীও ভীতুমানুষ তার মতামানুষের হাত দৃঢ় বলে জড়িয়ে ধরে।

প্রমা, ১৯৯৫